তন্ত্রতপস্যা

অরুণানন্দ ব্রহ্মচারী

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ

১লা বৈশাখ ১৩৬৮

প্রকাশক

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

১৮এ, টেমার লেন

কলকাতা ৯

মুদ্রাকর

যামিনীভূষণ উকিল

দি মুকুল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২০৯এ, বিধান সরণি

কলকাতা ৬

প্রচ্ছদশিল্পী

খালেদ চৌধুরী

শ্রীদ্বারকাপ্রসাদ অংগরওয়ালা
পরম স্নেহভাজনেষু

ঘন অন্ধকারে এক একটা চোখ জ্বলে-জ্বলে আসছে এগিয়ে। পরপর সার বেঁধে। চোখ ঝুলছে কোন অদৃশ্য মানুষের একটা হাতের মুঠোয়। একটা করে হাতই দেখা যাচ্ছে স্রেফ। আলোর আভায়। বাকি দেহটা অন্ধকারে ঢাকা। নারী কি পুরুষ কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। হাতে চৌকোনা লণ্ঠন ঝুলিয়ে চলেছে ওরা শ্মশানের দিকে।

বাবলাতলায় কে একজন নড়ে চড়ে উঠছে। কেমন বর্ণ দেখা যাচ্ছে না। একটা মালসায় আগুন নিয়ে সামনে এনে বসিয়ে দিল কেউ। পাটকাঠির আগুন জ্বলছে দাউ-দাউ করে। গুগগুল-ধুপের গন্ধ বাতাসে ছড়াচ্ছে। লোকটি গুগগুল-ধুপে আহুতি দিচ্ছে। কর্কশ গলায় মন্ত্র উচ্চারণ করছে। নিঝুম রাতে বড্ড বেশী কানে বাজছে। ওঁ বাং তুং···শরীর মম কুরু কুরু স্বাহা···।

যে আগুনের মালসা নিয়ে এলো, বসে আছে চুপচাপ। খানিক পরে লোকটি উঠে দাঁড়ালো। হোমক্রিয়া সেরে। এপাশের লোকটিও উঠেছে। আগুনের আলোয় দেখা যাচ্ছে, খুব ক্ষীণজীবী। রোগা লিকলিকে। ন্যাড়ামাথা। তেল চকচকে গা। সারা অঙ্গে জবজবে করে তেল মেখেছে।

অন্যজন একেবারে বিপরীত।

বেশ মোটাসোটা। রঙ দুজনেরই প্রায় এক, মিশমিশে কালোর মাথা ছুঁই ছুঁই। মোটা লোকটি নেংটিপরা লোকটিকে নিজের লালরঙের ঝোলা থেকে লাল আলখাল্লা বার করে পরিয়ে দিল। তারপর বলল, ওঁ নমঃ চণ্ডালিনী মহাপিশাচিনী দেবী ভয়েতরে এদ ভ্রমন্তি হ্রীং ক্রণ পচ্ছাকায়ে স্বাহা। লোকটির মাথা থেকে পা অবধি হাত বুলিয়ে দিল। না, দিচ্ছে। ওপর থেকে নিচে। এক দুই তিন···পাঁচ ছয় সাত।

লোকটি কেমন হয়ে যাচ্ছে।

মন্ত্র উচ্চারণ থেকে শেষ করা অবধি হাত বুলনো চলছে। মন্ত্রের

সঙ্গে সঙ্গে হাতও নামছে। আবার নতুন করে মাথা ছোঁয়া আবার নামা।

চামড়ায় গাঁথা মাটির মালা গলায় পরিয়ে দিল। বুনো-শুয়োরের দাঁত বার করে লোকটির কপালে কি লিখে দিচ্ছে। বোধ হয় মুখে যা উচ্চারণ করছে, হবে বা তাই। ওঁ হুস্ত্রী পরদেশ পরলোক ঠঃ হ্রীং স্বাহা। শুয়োরের দাঁত সুদ্ধু সব আঙুল মুড়ে রেখে মাঝের আঙুল দিয়েও লিখছে। সিঁদুর আলতা বা কালিতে নয়, এমনি এমনি।

ডানদিকে জলভরা মাটির ঘড়া। মুখে সরা নয়, মড়ার মাথার খুলি চাপা। খুলিটা তুলে নিয়ে ওর ডানহাতে ধরে রাখতে বলল। ঝোলা থেকে কারণের বোতল বার করে ঢক ঢক করে ঢেলে দিল খুলিতে। কি উগ্র গন্ধ!

আদেশের সুরে বেশ জোরেই বলে উঠল, খেয়ে নাও। মনে মনে ভাবো তুমি প্রেতলোকের সাক্ষাৎ প্রেত। আমার সমস্ত আদেশ শুনতে বাধ্য হবে। বাধ্য হবে, বাধ্য হবে।

লোকটি ভূতগ্রস্ত মানুষের মতো টলছে। সামনে ঝুঁকে পড়ছে থেকে থেকে। আগের মতো অত রোগা আর দেখাচ্ছে না। দেহটা ফুলে ফুলে উঠছে। ডানহাতে মড়ার খুলি ধরাই রয়েছে। বাঁ হাতের মুঠোয় গুঁজে দিল মশাল।

মশালের আলোয় স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে দুজনকে। একজন নিরাময় সাধু। অন্যজন রোগা মানুষটি—পরমেশ।

লম্বা লম্বা পা ফেলে নিরাময় সাধু এগিয়ে আসছে শ্মশানের দিকে। দীর্ঘদেহে দীর্ঘজটা। মন্দিরের মতো চুড়ো করে মাথার ওপর বাঁধা। পরনে লালরঙা ধুতি দুপাট করা। খালি গা খালি পা। কপালে নিচুমুখো তিনকোনা সিঁদুর রেখার তিলক। টকটকে লাল। দূর থেকে মনে হয় ত্রিনয়ন আঁকা! মাঝখানে গোল চন্দনের টিপ।

ক্ষমতাবান পুরুষের সব লক্ষণই বর্তমান সাধুর মধ্যে। লাল কাঁকরমাটির পথ মাড়িয়ে পিষে চলেছে সদর্পে। চলার দাপটে বুক নাচছে। নিশ্বাসও নেচে পড়ছে ঘন ঘন।

জীবন-মরণের যুদ্ধে জয়ী হবার দৃঢ়-সংকল্প নিয়ে, বিশ্বাস নিয়ে

সাধু চলেছে বুঝি। উদ্দেশ্যে চিড় ধরেনি, লক্ষ্যে বিভ্রম আসে নি কোন।

আচ্ছন্নের মতো পরমেশও পেছু পেছু আসছে। ওর চলার ধরনটা খুব স্বাভাবিক নয়। দৃষ্টিও স্বচ্ছ নয়। চাউনি কেমন কেমন। কোন অজানা রাজ্যের সীমানার মধ্যে মন যেন ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। একটা বন্ধনের গন্ডীর আওতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না।

পারছে না-ই বা বলা যায় কি করে! ওর ইচ্ছেয় তো আর এখন কিচ্ছু হচ্ছে না। ওর ইচ্ছে ঘুমিয়ে পড়েছে ওর মনে। ওর ভেতর নিরাময় সাধুর ইচ্ছে স্বাধীন সত্তা নিয়ে নেচে কুঁদে বেড়াচ্ছে স্বচ্ছন্দে।

বাঁশবন এড়িয়ে শাল-সোঁদাল পেরিয়ে, শিশুগাছের গুঁড়ি ছুঁয়ে পাত্রসায়রের শ্মশানের কাছাকাছি এসে পড়েছে ওরা।

এবড়োখেবড়ো উঁচু-নীচু রাস্তার শেষে শ্মশান।

কালীপুজো-অমাবস্যা রাতের শ্মশান যেন গিলতে আসছে। ধারে কাছে জনপ্রাণী নেই। থুড়ি! প্রাণী নেই বললে ভুল বলা হবে। প্রাণী আছে। কটা শেয়াল। একটা আধপোড়া মড়াকে নিয়ে ছেঁড়া-ছিঁড়ি করছে। উদরপূরণের কি নৃশংস রূপ! ফসফরাসের আগুন দপদপ করে জ্বলে উঠছে শেয়ালদের চোখে।

এরা এসেছে. কোন ভ্রূক্ষেপ নেই তাতে পশুমনে। কাদের মড়া কে জানে! আশেপাশে লোক দেখতে পাওয়া গেল না। মরণের পর যার দেহ ছেঁড়াছিঁড়ি. জ্যান্তে তার কি না কি হয়েছে। সব অদৃষ্টের লিখন।

এখানে যে ভাবেই হোক দেহের মুক্তি। এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই। মোহেরও মুক্তি—কিছু সময়ের জন্য হলেও—যাকে বলে শ্মশান বৈরাগ্য। কিন্তু এখানের কোন ক্রিয়াকলাপে কারও কঠিন রোগমুক্তি কি সম্ভব?

নিরাময় সাধু বলে, হ্যাঁ সম্ভব। ক্রিয়ার মতো ক্রিয়া জানলে, করতে পারলে অসাধ্যসাধন করতে পারা যায়।

সেটা কিরকম?

দেখতে পাবে, জানতে পারবে। মুখে আঙুল দিয়ে একদম চুপ-

চাপ বসে থাক শ্মশানে। মনের কোণে যেন অবিশ্বাস-সংশয়ের দানা না বাঁধে একটুও।

এটা কি ব্যর্থ হওয়ার আগে একটা যুক্তির অজুহাত খাড়া করে রাখা নয়! নিজে সাফ হয়ে কেটে বেরোবার পথ পরিষ্কার করে রাখার ছলনা নয়।

না। মনের রোগে সবার মন সুস্থ স্থির না রাখতে পারলে, রুগীর সুস্থ হতে বাধা পড়ে। মানুষের মনই মনকে টানে। আবার মনই মনকে দূরে সরিয়ে দেয়, দূরে সরিয়ে রাখে। নিজের মনে নিজে ফিরে গেলে—এটা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। এ জায়গাটা কোন ফাঁকফাঁকি দিয়ে ঢাকা নয়।

বেশ চুপ করে বসে থাকা হবে। কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব না রেখে। নীরব-নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়ে বসে থাকতে হবে। নীলামোতির ভাগ্য বিধাতা কোন উজান বইয়ে দেয়—দেখা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই কোন।

স্ত্রীর ব্যাপারে আকুতির উত্তরে বলেছে হৃদয়নাথকে নিরাময় সাধু।

শ্মশানের এককোণে জোড়হাত করে বসে আছে হৃদয়নাথ।

নিরাময় সাধু বাইরে-বাইরেই ঘুরে বেড়ায় বছরের বেশীরভাগ সময়। বয়েস নাকি অনেক। প্রায় নব্বুইয়ের কোঠায়। তবে মুখে দেহে—কোন জায়গার চামড়া তেমন কোঁচকায়নি। খাওয়া-দাওয়ায় কোন বাধানিষেধ নেই। ভোজনবিলাসী মানুষ। খেতে পারে যেমন হজমও করতে পারে তেমন।

জঙ্গলে-পাহাড়ে অনেক সাধুসন্তের সঙ্গে বাস করে, সেবা করে, মানুষের রোগ-শোক-দুঃখে নিরাময়ে অকাট্য গুপ্ত ক্রিয়াকলাপ আয়ত্ত করেছে নিরাময় সাধু। গুণ-কর্মের জন্যই এই নাম। লোকেরাই দিয়েছে।

বাঁকুড়ার এই অজ পাড়াগাঁয়ে মাঝে মধ্যে আচমকা এসে পড়ে। অনেকে বলে, এ গাঁয়ের সঙ্গে ওর নাড়ীর যোগ যে। মায়ের মামার বাড়ী ছিল নাকি এককালে। তার তো কোন হদিস মেলে না। আর তাছাড়া কে-ই বা কার আদ্যিকালের খবর রাখে! নিজের নিয়েই মানুষ

ব্যতিব্যস্ত। কে কাকে দ্যাখে! সমস্যার ওপর সমস্যা। তার ওপর আবার প্রধান হচ্ছে—অন্নচিন্তা চমৎকারা।

নিরাময় সাধু বলে, তান্ত্রিকের কাছে তন্ত্রক্রিয়া শিখেছে। পাহাড়ের গুহায় লুকোনো কাপালিকের কাছে কাপালিকক্রিয়া, আর নানান গাঁয়ের গুণীনদের কাছ থেকে গুণীনক্রিয়া রপ্ত করেছে বেশ পরিশ্রম আর ধৈর্য-সহ্যের মাশুল দিয়ে। পরোপকারব্রতের জন্য যখন, তখন এসব তো তুচ্ছ ব্যাপার।

পরের সুখশান্তিতেই তার সুখশান্তি।

নিরাময় সাধু গাঁওয়ে এলে, গাঁও নতুন জীবন ফিরে পায়। সকলের ধারণা, স্বর্গের দেবদূত নেমে আসে গণ্ডগ্রামে মহাকরুণার রূপ ধরে—নিরাময় সাধুর মধ্যে দিয়ে।

নিরাময় সাধু বলে, তোরা দেখিস, আমার মধ্যে দেবদূত দেবতা। আমি কিন্তু আমার ক্ষমতায় দেবতাকে টেনে নিয়ে আসতে পারি। আবার তোদের মধ্যে দিয়ে অজান্তেই অনেক কাজ করিয়ে নিতে পারি। ভূতপ্রেতকে নিয়ে এসেও অনেক দুরূহ কাজ করিয়ে নিতে পারি।

আজ সেই কাজ।

ঠিক দেবতাও নয়, আর ভূতপ্রেতও নয়। মৃতের আত্মাকে নিয়ে কাজ। যে মরেছে, তার আত্মাকে অন্যের দেহে প্রবেশ করিয়ে কাজ করানো। এতে নাকি হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়।

এ সাধনার নাম পরকায়াপ্রবেশ সাধনা। শংকরাচার্য করেছিলেন। তবে তিনি মৃতরাজার দেহে প্রবেশ করেছিলেন। টেহেরী গাড়োয়ালের এক সাধুর কাছে এ সাধনা শিখেছে নিরাময় সাধু। পরকায়াপ্রবেশ সাধনাতে নিজের অন্য সাধনার কিছু ক্রিয়াকলাপের মিশেল দিয়ে কাজ করে দেখেছে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে। আশার অতিরিক্ত ফল। আর খুব তাড়াতাড়ি।

এতে জ্যান্তমানুষের দেহেই অন্য আত্মার প্রভাব আনা যায়।

প্রভাব আনায় মানুষের আবার সাধনা থাকা চাই। মনের জমি তৈরি থাকা চাই। তা না হলে কিছু হবে না, শত চেষ্টাতেও না।

সেই মানুষ তৈরি করেছে নিরাময় সাধু অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা যাকে বলে। পরবেশকে।

মা-বাবা-হারা পরবেশের মা-বাবা নিরাময় সাধুর সাধন পথের সঙ্গী। তীর্থভ্রমণের সঙ্গী। আর আত্মা আনানোর বসতবাড়ি বললেও ছোট করে বলা হয়। আদেশ শুনে শুনে এমন অনুগত হয়ে গেছে ও, যে, আদেশ করার সঙ্গে সঙ্গে ওর নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলে। নিরাময় সাধুর উপদেশ মতো সম্পূর্ণ ডুবে যায় সেই দুনিয়ায়। সম্মোহনের ছোঁয়া লাগানো মন বুঝি। নিজের অগোচরে কাজ করে যায় নিরাময় সাধুর আদেশ মতো।

কটা ঝাঁকড়ামাথার কালো কুচকুচে গাছের গলাগলি শ্মশানের ওপাশটায়। ওখানেই হৃদয়নাথকে বসিয়ে রেখেছে সাধু। ও যেন যমদূতদের মধ্যিখানে শুকনো মুখে বসে।

ভয়ে চমকে উঠেই নিজেকে সামলে নিয়েছে একটু। কি ভয়ংকরই না দেখাচ্ছে পরবেশকে। হাতের জ্বলন্ত মশালটা শ্মশানের মাটিতে পুঁতে দিল। নিশ্বাসে সিংহের গর্জন।

মড়ার খুলিতে কারণবারি চালছে নিরাময় সাধু। পরবেশ গিলছে ঘন ঘন। হাঁটু মুড়ে বসেছে। নিচু হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকাচ্ছে একবার আবার তুলছে।

নিরাময় সাধু মড়ার খুলিটা ওর হাত থেকে নিয়ে নিজেই গিলতে শুরু করেছে। মাঝে মাছে আড়চোখে তাকাচ্ছে। মুখে চোখে কোন কথা নয়, মনে মনেই বোধ হয় আদেশ করছে কিছু।

আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল পরবেশ। সটান চিৎ হয়ে।

বুনো-শুয়োরের দাঁত তিনটে ঝোলা থেকে বার করেছে নিরাময় সাধু এখানেও। পরবেশের কপাল বুক আর নাইয়ের ওপর—তিন জায়গায় তিনটে রাখল। এক এক জায়গায় হাত রাখছে আর বলছে, ওঁ আং আগচ্ছ, আগচ্ছ।

দাঁত তিনটে তুলে নিয়ে ঝোলায় পুরলে আবার। সামনে তাকিয়ে বুক কাঁপানো ভয় ধরানো হাসি হেসে উঠেজে জোরে। অট্টহাসি।

চারজন মালমুগুর গড়নের জোয়ান এসে হাজির হয়েছে। হাতে কোদাল-শাবল। কালো রঙের কাপড় চাপা দেওয়া চুপড়ি।

কেন এত দেরী হল বোঝা যাচ্ছে না। সেই চোখের আলোর লণ্ঠনধারীরা এসে পৌঁছুল। এদের সবাই পুরুষ। স্ত্রীলোক নেই কেউ।

নিরাময় সাধুকে বেশ তফাৎ রেখে গোল হয়ে বসল ওরা। অবিশ্যি সাধুকে কেন্দ্র করে মধ্যমণি রেখে। প্রত্যেকে হাঁটুমুড়ে বসেছে। সামনে টিমটিমে লণ্ঠন।

এরা নিরাময় সাধুরই চেলাচামুণ্ডা। সাধুর মতোই বেশবাস। শ্মশানক্রিয়ায় সাধকের দেহরক্ষী দেহবন্ধনের প্রয়োজন। কোন্ দিক থেকে কি বিপদ এসে যায়, কে বলতে পারে! সাবধানের মার নেই।

পরবেশের কাছ থেকে সরে এসেছে সাধু। একটা অনুষ্ঠানের শেষ। এবার চোখের ইশারায় সাধু আদেশ করল মন্ত্রপাঠ করতে। যারা বসে রয়েছে, তাদের।

গুনতিতে ওরা জনা আষ্টেক হবে। সকলে সমবেত কণ্ঠে আদেশ পালন করছে সাধুর।—ওঁ বসাকরে মাসসে খপর ভরে কালভৈরো কালীজটা চৌহাটা কালভৈরো কঙ্কাল মেরা বৈরী তেরা ভক্ষ দোহাই কালভৈরবী।

যারা শাবল-কোদাল চুপড়ি ভর্তি জিনিস এনেছে, তারা চুপড়ির ঢাকা সরিয়ে বার করল ছাগলের কলজে, মাংস আর বোতল-বোতল কারণবারি। আর কটা মড়ার খুলি।

সমস্ত ধরে দিয়েছে সাধুর চরণে। এক ঘড়া জল-দুধ ঘি-ও। সাধু ওদের মধ্যে থেকে দুজনকে বসা লোকের পাশ দিয়ে ভেতরে আসতে ইঙ্গিত করল।

খড়ির দাগ কেটে জায়গাটা দেখিয়ে দিল। খুঁড়তে হবে। ভেতরে এসে খুঁড়ছে ওরা। মাটি খুঁড়ছে, মাটি উঠছে পাশে জমা হচ্ছে ঝুড়ি ঝুড়ি। চলছে শাবল চলছে কোদাল।

হৃদয়নাথ গাছতলায় বসে বসে ভাবছে। এ সমাধি তারই। এর মধ্যে না তাকে পুরে মাটি চাপা দেওয়া হয়!

শিউরে উঠছে ভরে হৃদয়নাথ।

একটা তরুণের মরাদেহ তুলেছে ওরা। ধরাধরি করে সাধুর সামনে এনে শুইয়ে দিয়েছে।

মহা উল্লাসে আবার সাধু হেসে উঠেছে আগের মতো। আলো-আঁধারিতে মুখখানা কি বীভৎস হয়ে উঠেছে। বাগ্দি পাড়ার তরুণের মৃতদেহটা কেনা হয়েছে একদিন আগে। বিকৃত হয় নি তেমন।

মৃতদেহ পেয়ে নিরাময় সাধু হৃদয়নাথকে বলেছে, তোমার নীলা-মোতির ভাগ্য খুব ভালো গো, ভালো। সচরাচর এরকম একটা হয়ে ওঠে না—ঠিক সময়ে ঠিক জিনিস পেয়ে যাওয়া। কল্পতরু মা আমার, দয়া হলে দেয় ভাণ্ডার।

চ্যাংদোলা করে মৃতদেহকে নিয়ে এসে শুইয়ে দেওরা হল বেহুঁশ পরবেশের কাছে। একটু ফাঁক রেখে। এখন কে মড়া কে জ্যান্ত—কিছুই বোঝা যাচ্ছে না দূর থেকে। দুটোই যেন এক রকমের।

ঘড়ার জলে মৃতদেহ চান করাল সাধু।

কালো কাপড়ে মুছিয়ে কালো কাপড় ঢেকে দিয়েছে সর্বাঙ্গ। মুখটুকু বেরিয়ে আছে কেবল। শেয়াল ডেকে উঠেছে ওপাশ থেকে। প্রহর শুরু হয়ে গেছে। রাতের প্রথম প্রহর। ঝড়ের মতো নিশ্বাস ফেলার আওয়াজ উঠেছে চতুর্দিক থেকে। সকলের নিশ্বাসে পেঁচার নিশ্বাসও কি মেশানো রয়েছে! শকুনের দীর্ঘশ্বাস?

হ্যাঁ, ওরা বাচ্চা। মানুষের বাচ্চার মতো কঁকিয়ে ওঠা কান্না কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। মগডালে উঠে গাছের মাথা নাড়া দিচ্ছে কারা? গাছটা ভেঙে মাথায় না পড়ে হৃদয়নাথের। বুকের ভেতর ধড়ফড় করছে বড্ড।

আগের মন্ত্র উচ্চারণ ভেসে বেড়াচ্ছে না আর বাতাসে। স্তব্ধ হয়ে গেছে। সকলে রুদ্ধশ্বাসে বসে। যারা দাঁড়িয়েছিল, যারা খুঁড়ছিল—তারাও।

মুহূর্তে-মুহূর্তে শ্মশানের চেহারা পাল্টে যাচ্ছে। ভীষণ থেকে আরো ভীষণ হয়ে উঠেছে।

মাঝখানে বসে, দু'হাত দুজনের বুকে রেখে. ডান পরবেশের বাঁ মৃতদেহের—বিড়বিড় করে কি যেন কি বলল নিরাময়সাধু। কি যেন কি বলছে। কিছু শোনা যাচ্ছে না। ভয়ে মানুষ তো অনেক কিছুই দেখে। কল্পনার কত ছবি ঘুরে বেড়ায় আশেপাশে—জীবন্ত হয়ে। এক্ষেত্রেও কি তাই?

মৃতদেহের বুক থেকে একটা মেঘের রেখা উঠছে। ধোঁয়া-ধোঁয়া। সাধুর বাঁ হাত বেয়ে বুক পেরিয়ে, ডান বাহুর ওপর দিয়ে নিচে নেমেছে মাঝের আঙুলে যে আঙুলটা ঠেকে রয়েছে পরবেশের বুকে—হৃৎপিণ্ডের ওপর। রেখা মিলিয়ে গেল।

ভয়ধরা চোখে ভুল দেখা নয় তো।

পরবেশ বেশ নড়েচড়ে উঠছে। পুনর্জীবন পেল বুঝি। আস্তে আস্তে উঠতে চেষ্টা করছে দু'হাতে ভর দিয়ে। মাথা তুলছে, আবার নেতিয়ে পড়ছে। আবার তুলছে, আবার পড়ছে। আবার আবার···

নিরাময় সাধু হাসছে মিটিমিটি।

পরবেশের মুখ ফাঁক করে কারণবারি ঢালছে ধীরে ধীরে। কাঁচা-মাংসের টুকরো, ছাগলের কলেজের টুকরো পুরে দিচ্ছে হাঁয়ের ভেতর।

কচকচ করে চিবোচ্ছে পরবেশ।

এবার পরবেশের কানের মুখ রেখে, পরকায়াপ্রবেশের মন্ত্র শুনিয়ে চলেছে সাধু একটানা। চলল কিছুক্ষণ···নিশায়াং নিদ্রায়াং নিশিচর্ ভাগে চ···চিত্রমিহকিম্।

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-উত্তেজনা সকলের।

কে জানে কি দেখবে, কে জানে কি শুনবে, কে জানে কি ঘটবে!

মুঠোয় ভর দিয়ে উঠে বসেছে পরবেশ।

মালসার আগুনে ঢালছে সাধু কারণবারি। আহুতি দিচ্ছে ছাগলের মাংস আর কলেজে। ওঁ কালভৈরবায় স্বাহা···।

আগুনে দুধের ছিটে দিয়ে সেই দুধ এনে পরবেশের মাথায় ঢেলে দিচ্ছে নিরাম. সাধু—হিমানী হতেবং হিমগিরি নিবা কবুতরঃ···

উঠে দাঁড়ালো পরবেশ।

শরীরে আসুরিক শক্তি। এতটুকু টলাটলি নেই, এতটুকু দুর্বলতা নেই। অন্যদেহের অন্যজীবন। চলন অন্যরকম হয়ে গেছে। আশ্চর্য!

সামনে না এগিয়ে, পেছু হটতে হটতে চলেছে। সমস্ত লোক ঘিরে ঘিরে নিয়ে যাচ্ছে। যেন অন্য কোন দিকে ছিটকে চলে যায়। যাচ্ছে—যাচ্ছে—যাচ্ছে।

শ্মশান ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে এসেছে। এসেছে সানিপুকুরের ধারে।

শ্মশানে মড়া স্পর্শ করে মনে মনে জপ করছে নিরাময় সাধু।

জলে নেমে পরবেশ মধ্যিখানে যেতে চাইছে খালি। সকলে গোল

করে আগলে রেখেছে। পরবেশ ডুব দিচ্ছে, এরাও ডুবছে। পরবেশ উঠছে, এরাও উঠছে।

কি দমবন্ধ করা পরিবেশ। কি হয়, কি হয়। ওরা কেবল চিৎকার করে উঠছে মাঝে মাঝে। রক্ষ মাং রক্ষ মাং···।

মরণ বাঁচনের এই প্রাণঘাতী জলখেলা চলল বেশ খানিক সময়। এ খেলায় কি তবে শেষ? না, তীরে উঠেও মুক্তি পেতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। দানবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কি চলা সম্ভব মানুষের!

পুকুরের জলে ঘড়া ভরে মাথায় বসিয়ে দিতেই, আরো চতুর্গুণ শক্তি মাথা চড়ো দিয়ে উঠেছে পরবেশের দৈত্য শরীরের অঙ্গে অঙ্গে

পেছনে পা ফেলে হাটার ঝোঁকটা আরো বেশী বেড়ে উঠেছে। এগোন দূরের কথা, পেছিয়ে চলেছে বাতাসের বেগে সানিপুকুরের দিকে। গোলাকার হাতের বাঁধনে এবার বুঝি আটকানো যাবে না আর। ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার করছে সকলে আকাশ ফাটিয়ে। রক্ষ রক্ষ রক্ষ···। যাতে নিরাময় সাধু শুনতে পায়। এ দৈত্যকে আকর্ষণ করে টেনে নিয়ে যায় তার ক্রিয়াকর্মের শক্তিতে। এ সৃষ্টি তো তারই।

সাধু শুনতে পেয়েছে কিনা কেমন করে জানা যাবে। শুনলে, ক্রিয়াকর্ম করছে কিনা, তাই বা বোঝা যাবে কেমন করে! তবে পথের হদিস না পেলেও, এটা প্রত্যক্ষ যে, পরবেশ একটু শান্ত। দাপাদাপি লাফালাফি দৌড়াদৌড়ির দাপটটা কমেছে।

এখন পেছু হটছে না আর।

বাতাসে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চলেছে যেন। শ্মশানমুখো। অন্য কোনধারে ভ্রূক্ষেপ নেই। ডাইনে বাঁয়ে কোনধারেই নয়। একটা অদৃশ্য রশি কোমরে শক্ত বাঁধনে বেঁধে ওকে বুঝি টেনে নিয়ে চলেছে। ওর কোন ক্ষমতা নেই এ বাঁধন ছাড়িয়ে পালাবার।

সবাই নির্ভয় নিশ্চিন্ত।

পায়ে পায়ে এসেছে সকলে শ্মশানে ওর সঙ্গে। মৃতদেহের পাশে এসে দাঁড়াতেই তাড়াতাড়ি মাথা থেকে কলসী নামিয়ে নিল একজন।

একটা লক্ষ্য করার বিষয়, এতখানি পথ এসেছ কলসী মাথায় নিয়ে, কত কাণ্ডই না হয়ে গেছে, কিন্তু পড়ে যায় নি। সকলে হাত

উঁচিয়ে রেখেছিল পাছে পড়ে যায়। ধরে ফেলবে। তা হয়নি। অদ্ভুত ব্যাপার।

নিরাময় সাধুর ইশারায় পরবেশকে ধরাধরি করে বসিয়ে দিয়েছে ওরা। শুধু বসিয়ে নয়, শুইয়েও দিয়েছে।

আবার আগের মতো বেহুঁশ হয়ে পড়েছে পরবেশ।

মৃতদেহের ওপর থেকে কালোরঙের কাপড়টা আস্তে আস্তে তুলে নিয়েছে সাধু। এক এক করে সাতপাট করেছে। তারপর কাপড়ের খুঁটের দিকটা মৃতদেহের মাথার একটু ওপর থেকে দেহস্পর্শ না করিয়ে ধীরে ধীরে পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর অবধি নিয়ে গেছে। এইভাবে ওপর থেকে নিচে—বার সাতেক করল।

এবার ওই কাপড় নিয়ে একই নিয়মে পরবেশেরও মাথার ওপর থেকে পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর অবধি নামিয়ে এনে, আবার ওপর থেকে। পরপর সাত বার।

উঠে বসেছে পরবেশ।

ওই কালো কাপড়টাই পরিয়ে দিল ওকে সাধু।

পরবেশের দুচোখ অপলক। ঠেলে বেরিয়ে এসেছে।

উঠে দাঁড়ালো।

কানের কাছে মুখ এনে বলছে নিরাময় সাধু, যা আদেশ করবো, তুমি শুনবে। নিশ্চয় শুনবে। হুকুম তামিল করতে বাধ্য। আমি হুকুমদার তুমি তালিমদার। তালিমদার। তোমার আত্মা আর মৃতের আত্মা এক হয়ে গেছে। মৃতের আত্মার প্রভাব তোমার মধ্যে প্রবল শক্তি এনে দেবে। অসাধ্য সাধন করবে আমার ইচ্ছেয়।

খোঁড়া গর্তে মৃতদেহ শুইয়ে দিল সবাই মিলে। মাটি ভরাট করে দিয়ে চলেছে ওরা। বেরিয়ে যাবে শ্মশান থেকে। কিন্তু পরবেশ কি করবে?

এই তো সবে কাজ শুরু তার।

পরবেশের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সানিপুকুরের জলে ভরা মাটির কলসী। নিরাময় সাধুর মন্ত্রপূত।

শ্মশানের শেয়ালরা ডেকে উঠেছে সরবে। রাতের তৃতীয় প্রহর শুরু।

লণ্ঠনের লোকেরাও অন্ধকারে প্রেতের চোখ জ্বালিয়ে, অন্ধকারে

গা ঢেকে অদৃশ্য হয়ে হয়ে ফিরে চলেছে ঘরে। কখনো কখনো অদৃশ্য দেহের একহাত আর মুঠো দৃশ্য হচ্ছে লণ্ঠনে। আপাতত ওদের কর্তব্যকর্মের শেষ। তাই ছুটি বোধ হয়।

ছুটি কি নিরাময় সাধুর ?

তা কখনো হয় !

কত কাজ বাকি এখনো। কত চিন্তার জট মাথায় পাকাচ্ছে। নীলামোতির প্রাণভোমরা এখন যে তারই হাতের মুঠোয়। খুলে ছেড়ে দিতেও পারে। আবার নাও পারে। খুলে দেওয়া না দেওয়া নির্ভর করছে হৃদয়নাথের ওপর।

হৃদয়নাথ কি শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস রাখতে পারবে তার ওপর ?

হৃদয়নাথের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সাধু।

হৃদয়নাথ রকমসকম দেখে, জড়পদার্থ হয়ে বসে আছে। বোবা কালা অন্ধ মানুষ যেন।

ডেকে সাড়া পাচ্ছে না নিরাময় সাধু।

রেগেমেগে চুলের মুঠি ধরে তুলল।

সচেতন হয়ে উঠেছে হৃদয়নাথ। চিৎকার করে উঠেছে, রক্ষ রক্ষ রক্ষ···।

মলো যা ! আরে ভূতপ্রেত দানাদৈত্য নয়। আমি। আমি নিরাময় সাধু।

সাধুকে জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কেঁদে উঠেছে হৃদয়নাথ। বাঁচান, আমাদের বাঁচান।

হ্যাঁ, তাই হবে। পরবেশের পেছু পেছু চল।

দুরু দুরু করছে হৃদয়নাথের বুক। অজানা আশংকা। মনে হচ্ছে একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে ! রেহাই নেই বুঝি। সাধুর 'হ্যাঁ, তাই হবে' কথাটা—এভাবে কানে বাজছে কেন ? না, তা হবে না। কেন ?

কাঁপছে হৃদয়নাথ।

খপ করে ডানহাতটা চেপে ধরেছে নিরাময় সাধু।—অবিশ্বাস ! মুখে এক, মনে এক।

হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলেছে সাধু হৃদয়নাথকে।

বলির পশুর মতো ওষ্ঠাগত প্রাণ নিয়ে চলেছে হৃদয়নাথ।

আর পরবেশ ?

এগিয়ে চলেছে অস্বাভাবিক ভাবে পা ফেলে ফেলে। চলেছে চলেছে চলেছে। শূন্যে দুলতে দুলতে চলেছে ধরাছোঁয়ার বাইরের মানুষ পরবেশ।

এখানেও শ্মশানের পরিবেশ।

মানুষজন যে একদম নেই, তা নয়। রয়েছে কজন। তবু মনে হচ্ছে, বুঝি বা নেই কেউ।

এখানেও আকাশে বাতাসে আতংকের রেশ ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। মাটির বুক কেঁপে উঠছে থেকে থেকে। কতক্ষণের দমবন্ধ করা নিশ্বাস সজোরে আছড়ে পড়ছে বলে হয়তো।

চতুর্দিকে মানুষপ্রমাণ বেড়ার জাফরি। ওপরে খড়ের চাল। বাঁশের খুঁটির ওপর। পঞ্চাশ ষাটজন বসার মতো বেশ লম্বাচওড়া মণ্ডপ একটা। উত্তর দক্ষিণে চেরাবাঁশের দরজা দুটো।

একটা লাল রঙের মাটির বেদী ঘিরে মাটির প্রদীপ জ্বলছে। চারকোণে চারটে মাটির পিলসুজের ওপরও প্রদীপ। ভেতরে আছে আরো কিছু। বেদীর ওপর বীভৎস মূর্তি। চামুণ্ডার। ক্ষীণকায়া, পেটে-পিঠে এক। ভয়ংকর চোখ। ভয়ের কোন অতল গহবর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে যেন। বেরিয়ে আসছে জ্বলন্ত আগুন। কোপ দৃষ্টিতে কাকে কি করে বসে কে জানে!

ভেতরেই বেদীর সামনে হাড়িকাঠ। লাল সিঁদুর মাখানো। হাড়িকাঠ থেকে দশহাত দূরে একটা সুড়ঙ্গের মুখ। থাকে থাকে সিঁড়ি নেমে গেছে নিচের দিকে। মাটি কেটে কেটে, মাটি দিয়েই তৈরি করা সুড়ঙ্গ। দেয়াসিনী-দেবীর পূজারিণীর গোপন সাধনা আর ক্রিয়াকলাপের জায়গা ওটা।

দিনের আলোয় বাইরে কেউ কোনদিন দেখতে পায়নি দেয়াসিনী নিতুমাকে। রাতের অন্ধকারেই সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এসে ক্রিয়াকলাপ সেরে আবার ভেতরে চলে যায়। কালীপুজোর অন্ধকার রাত্তিরের শেষ প্রহরে ওর বিশেষ পুজো।

এ পুজো দেখতে বড় একটা আসে না কেউ। যারা আসে, নেহাত প্রাণের দায়েই আসে। পুজোর সময় নাকি নিতুমার চেহারা পাল্টেযায়। হয়ে ওঠে বীভৎসদর্শন। অনেকের চোখ নাকি সহ্য করতে পারে না।

সহ্য করতে না পারলে আবার মহা বিপদ। সাংঘাতিক অমঙ্গলের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া মুশকিল। ওর চেলাচামুণ্ডারা অনেক সময় চোখ বুজে বসে থাকে ভয়ে।

রাতের শেষ প্রহর শুরু হয়েছে সবে।

আকাশের কালোয় ফিকের টান ধরেনি এতটুকু। মিশমিশে কালো অন্তহীন সমুদ্র একটা থম থম করছে শুধু। না আছে চঞ্চল ঢেউ, না আছে প্রাণের সাড়া। আছে বুঝি প্রলয়ের ইশারা। পৃথিবীর সব নিশ্বাসটুকু শুষে নেবার অনন্ত বাসনা।

শেয়ালের ডাকে ভয়ধরানো স্বর ভেসে আসছে চতুর্দিক থেকে। দক্ষিণ উত্তর পূর্ব পশ্চিম। জন্তুদের কণ্ঠে যেন মানুষের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদের আর্তস্বর ফুটে উঠছে।

কালো কুচকুচে বাচ্চা ছাগল মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। একটা দুটো নয়, পরপর নটা। গলার দড়ি খুঁটিতে বাঁধা। ওদের আজ মুক্তির দিন। চামুণ্ডার চরণে। মানুষের আধিব্যাধি, রোগশোক শত্রুর প্রতিনিধি হয়ে উঠবে আজ।

ঠাণ্ডা বাতাসে কেমন একটা তাপের আঁচ। কোথা থেকে তিনটে কালো কুকুর জিভ বার করে হাঁপাতে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়াল দক্ষিণের দরজায়। তারপর মাথা দিয়ে আস্তে আস্তে বাঁশের দরজা ঠেলে ঠেলে এক এক করে প্রবেশ করল।

দেবীর দুপাশে দুটো আর সামনে একটা বসেছে। বসে আছে এমন ভাবে যেন ওদেরই পুজোপাঠ শুরু হবে এখুনি।

মণ্ডপ জীবন্ত হয়ে উঠেছে এবার। ভেতরের মানুষরা নড়েচড়ে উঠছে।

ওদের মধ্যে রোগা লিকলিকে মানুষটা উঠে দাঁড়িয়েছে। হাতে এক হাত পরিমাণ ন'টা ত্রিশূল। প্রদীপের মিটমিটে আলোতেও বেশ চক চক করে উঠছে। ধারালো যে, বেশ বোঝা যাচ্ছে নিজের বুকের মাঝখানে একবার করে ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে দেবীর চরণের কাছে রাখল।

যে আটজন বসে আছে এখনো, এবার উঠে দাঁড়াল। সকলেই সুড়ঙ্গের মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে জোড়হাত করে।

সুড়ঙ্গের মুখ থেকে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল নিতুমা। মাথার পাটকিলে রঙের জটা খুব বড় নয়। পিঠের মাঝামাঝি। লালরঙা থান পরনে। হাঁটু থেকে বুক অবধি চাপা। বয়সে আন্দাজ চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। রং-কালো নয়। তামাটে। কপালে ছোট্ট সিঁদুরের ত্রিশূল। ওপর হাতে নিচে হাতে রুদ্রাক্ষের তাগা-বালা। গলায় তিননলি রুদ্রাক্ষের মালা ঝুলছে। বুক পেট হাঁটু অবধি।

ভাসা-ভাসা চোখের চাউনি কোন সুদূরের কে জানে! চিন্তাভাবনা আর বিষাদের ছায়ায় গম্ভীর মুখও ঠিক গম্ভীর মনে হচ্ছে না। একটা কেমন কেমন। মানুষের না দেবীর ঠিক ঠাহর করতে পারা যাচ্ছে না। চেহারায় চলনে—সব মিলিয়ে এ জগতের নয় বুঝি নিতুমা। অন্য কোন অজানা জগতের হবে বা।

পায়ে পায়ে বেদীর সামনে এসে মেষের ছালের আসনে দাঁড়িয়েছে। বেদীর নিচে বালির ওপর পঞ্চগুঁড়ি দিয়ে আঁকা অষ্টকোণ মাতৃকা-যন্ত্রের দিকে তাকিয়ে দেখল খানিক। হলুদ সবুজ নীল লাল শাদায় ফুটেছে ভাল।

নামানো দৃষ্টি ধীরে ধীরে ওপর উঠছে এবার। যতটা সম্ভব থেমে থেমে। দৃষ্টি এসে থমকেছে দেবীর মুখে চোখে। মনে হচ্ছে নিজের চোখমুখ দেবীর চোখে বসাচ্ছে বুঝি। কিংবা দেবীর মুখ-চোখ নিজের মুখচোখে।

মাটির মূর্তিকে আর নিতুমাকে তফাৎ দেখাচ্ছে না। কোনটা মাটির, কোনটা জ্যান্ত বোঝা ভার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। একি নিজেকে মূর্তিতে আর মূর্তিকে নিজের মধ্যে ভেবে নেয়ার দরুন? না অন্য কিছু?

যাই হোক, চাক্ষুষে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে নিতুমার আশ্চর্য রকমের তন্ময় ভাব। সচরাচর নজরে পড়ে না এমন। ওর সারা শরীরে শিহরন-কম্পন ওঠানামা করছে। পা থেকে মাথা, মাথা থেকে পা পর্যন্ত। চলল খানিকক্ষণ।

নিতুমা বসেছে। ডান পায়ের পাতা বাঁ পায়ের উরুতে, বাঁ পায়ের পাতা ডান পায়ের উরুতে রাখা। কোলের ওপর ডানহাতের

তেলোর উল্টো পিঠ বাঁ হাতের তেলোর ওপর। পদ্মাসনে বসে ধ্যান করছে দুচোখ বুজে নিতুমা।

গম্ভীর বিষাদ-প্রতিমার ঠোঁটে মৃদুহাসির আভাস।

পাশে রাখা খয়ের কাঠ সাজিয়ে দিচ্ছে খুব সন্তর্পণে মাতৃকাযন্ত্রের ওপর বিজয়বালা, নিতুমার ডানহাত বললেই চলে। নিতুমার ক্রিয়া-কলাপে কখন কি দরকার সমস্ত ওর একার নখদর্পণে।

বিজয়বালার পাশে নীলামোতি।

পুজোর উপাচার এগিয়ে-এগিয়ে দিচ্ছে ওরই আকার-ইঙ্গিতে। প্রথমে হোম, তারপর বলি। তারপর আরতি।

চোখ খুলে হোমের আগুন জেবলছে নিতুমা।

আহুতি দিচ্ছে। ঘিয়ে ডুবিয়ে নিচ্ছে জাতিফুল, শুকনো পলাশ। আগুনের মধ্যিখান লক্ষ্য করে আহুতি দিচ্ছে।—ওঁ চং চামুণ্ডে···বশ মানায় স্বাহা। নমো জয়তি কামাখ্যায়ৈ নমো···ওঁ চং···।

একশো আটবার হোমের পর খড়ে ফুল-জল দিয়ে পুজো করেছে নিতুমা।

নীরব রাতে বলির ছাগলের কাতর চিৎকার।

বিজয়বালা দড়ি খুলে খুলে নিয়ে আসছে এক একটাকে টানতে টানতে। হাড়িকাঠে মাথা গলিয়ে দিচ্ছে।

ছাগলের মাথায় হাত রেখে মন্ত্রপাঠ করছে নিতুমা।—অয়ং স বৈরী···আং হুং ফট। নিজের হাতেই খাঁড়া তুলে বলি দিচ্ছে। বিজয়বালা মাথাটা সরায় বসিয়ে মাথার ওপর প্রদীপ জেবলে দিচ্ছে।

নির্বিঘ্নে বলি দেয়া সাঙ্গ হল নটা ছাগলেরই।

ওদের মুক্তি মানুষের শত্রুর হাত থেকে, রোগশোকের হাত থেকে নাকি মোক্ষম মুক্তি।

আজকের এ পুজো সকলের জানার কথা নয়। এটা গুরুবংশের সাধনাসিদ্ধির পুজো। পুজোর নিয়মকানুন বিচিত্র ধরনের। নিতুমা তার সাধক গুরুদেবের কাছ থেকে অশেষ কৃপালাভ করেছে। তার সাধনার ফল অনেক অসাধ্য সাধন করেছে অনেকের জীবনে।

এ প্রচার এক গ্রাম থেকে-আর এক গ্রামে, এক শহর থেকে অন্য

এক শহরে ছড়িয়েছে। একদিন আধদিনে নয়, দীর্ঘদিনের সাধনার ফসল এটা।

আজকের বিশেষ পুজো কিন্তু নীলামোতিকে ঘিরে। আনন্দ সুখের পসরা মাথায় নিয়ে জন্মেছে নীলামোতি। সৌন্দর্যের ডালি নিয়ে। কিন্তু—

আজ সর্বহারা মানুষের মতো সব খুইয়ে জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে—অবিশ্যি নীলামোতি তাই মনে করে, ভবিতব্যের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে চলেছে। কূলকিনারা পায়নি কোন।

বাড়ির লোক বন্ধুবান্ধব ঘনিষ্ঠ মহল ভেসে যাওয়া মানুষটাকে আটকাতে চেষ্টা করেছে কত না উপায়ে। দ্বারস্থ হয়েছে চিকিৎসকের দ্বারে। ধন্না দিয়েছে দেবস্থানে। আশ্রয় নিয়েছে সাধুসন্তের। কিছুতেই কিছু না!

যত করা হয়েছে, তত নীলামোতি মনের দিক দিয়ে দেহের দিক দিয়ে একটা ঘন অন্ধকার রাজ্যের অতলে ডুবতে বসেছে

ডোবা মানুষটাকে কে তুলবে, কে বাঁচাবে! কোন আশা আর নেই বুঝি? আশা না থাকলেও মন কি মেনে নিতে পারে বিফল কাজের রায়? পারে না। পারলে, দুঃখ-অশান্তি বলে কথা দুটো জগতের বুক থেকে মুছে যেত চিরকালের জন্যে। মানুষের মন থেকেও।

এখানে নিতুমার কাছে এসেছে নীলামোতি সেই মন নিয়েই।

অবিশ্বাসের পাথর বুক চেপে চেপে পাহাড় গড়ে উঠেছে। কাজে কাজেই সংশয় নিশ্চিহ্ন হবার নয়। নিচে-ওপর করে করে বেড়াচ্ছে অনায়াসে। পাহাড়ে উতরাই-চড়াই যাকে বলে। কখনো দারুণ, কখনো ঢিমে তেতালা।

চুপচাপ বসে নীলামোতি।

পুজো দেখছে। একমনে ভক্তিবিশ্বাস নিয়ে নয় কিন্তু। দ্বিধাদ্বন্দ্বের দোলায় দুলছে। সব লোক দেখানো, সব বুজরুকি।

না, না। সব বুজরুকি সব লোক দেখানো নয়। নয়।

নিতুমার গলা দিয়ে অন্য কার কণ্ঠস্বর শুনছে নীলামোতি। কি ভারী। পুরুষের গলার আওয়াজের মতো। আগের মন্ত্র-উচ্চারণের সুরেলা গলা নয় এ।

নীলামোতি মনের কথা কানে শুনে চমকে উঠেছে।

সচেতন হয়ে একদৃষ্টে দেখছে পুজো।

নিতুমা বুকের কাপড়টা একটু টেনে নিচের দিকে নামিয়ে দিয়েছে। ধারালো ত্রিশূলের ছুঁচলো মুখ তিনটের আঁচড়ে বুকের রক্ত তুলে দেবীর বুকে এঁকে দিয়েছে। নীলামোতির কপালে ছুঁইয়েছে।

নীলামোতির সারা দেহে একটা বিদ্যুতের শিহরন বয়ে গেল আচমকা। একি বীভৎস ক্রিয়াকলাপের প্রতিক্রিয়া, না অন্য কিছু ?

নিজেকে কিরকম কিরকম ঠেকছে নীলামোতির। চিন্তাভাবনা মাথা থেকে মিলোতে শুরু করেছে। সমস্ত স্নায়ু কেমন অবসন্ন-ক্লান্ত হয়ে আসছে। শেষে না নিজের অস্তিত্ববোধটা হারিয়ে ফেলে।

না, হারাবে না।

সেই সর্বাঙ্গ অবশ করা গলার আওয়াজ আবার। এখানে উপস্থিত কোন পুরুষমানুষের গলা, না নিতুমার ?

নিতুমার নিতুমার নিতুমার।

অন্য কোন পুরুষমানুষের নয়। নয় নয়।

এ যেন পাহাড়ে ধাক্কা লেগে লেগে উত্তরের প্রতিধ্বনি নীলামোতির কানে জোরে জোরে বাজছে। বাজছে ধ্বনির প্রতিধ্বনি।

সত্যিই ভেতরের বুকচাপা ভাবনার কথা জানবার উপযুক্ত লোক কোথায় এখানে নিতুমা ছাড়া। সে প্রমাণ আগেই পেয়ে গেছে।

প্রথম দর্শনে নিজেরা বড়দরের সাধক-সাধিকা সাজতে গিয়ে নিতুমার চেলা-চামুণ্ডারা নাজেহাল পরেশান করে ছেড়েছে নীলা-মোতিকে। নিজেদের ধারণার কথা কত না শুনিয়ে শুনিয়ে ঝালা-পালা করেছে। নীলামোতির জীবনের সঙ্গে একবর্ণও মেলে নি কারো।

বিরক্তের পর বিরক্ত। কাঁহাতক সহ্য করা যায়! রাগে গরগর করতে করতে বেরিয়ে যাচ্ছিল, সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কমলার শান্ত মূর্তি ধরে নিতুমা।

ডানহাতে হাত রাখতে শিরশির করে উঠেছে। ঠাণ্ডা স্পর্শ। রাগের উত্তাপ, উত্তাপের জ্বালা জুড়িয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

হাত ধরে সুড়ঙ্গের মধ্যে নিয়ে গিয়ে একটা হরিণছালের আসনের ওপর নিজে বসেছে। বসিয়েছে নীলামোতিকে। নির্জন গুহার

জায়গায় বসিয়েও কানে কানে ফিস ফিস করে বলেছে সান্ত্বনার সুরে—জানি তোমার ব্যাধি, তোমার ব্যথা কোনখানে। প্রতিকার হবে। হবে কেন, নিশ্চয়ই হবে। আমিই তোমার প্রতিকার জানবে।

এত মনের দুর্যোগ তবু বিদ্রুপের হাসিটা চাপা ঠোঁট ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। ফিক করে হেসে ফেলেছে নীলামোতি।

বড় বড় চোখ করে বলেছে নীলামোতি, আন্দাজে এরকম অনেকেই বলে। ওসব ছেঁদো কথা। মানুষের জীবনের সব ঘটনাই ওই দুটো কথা থেকে টেনে বার করা যায়। খুব সহজেই। দুর্বল মানুষের মর্মস্থানের মর্মকথা ও দুটো। শোনার পর নিজের অজান্তেই বলে ফেলে সব। কারো হাতে দুঃখকষ্টের বোঝার ভার তুলে দিয়ে মানুষ নিজেকে হালকা করে ফেলতে চায়। এটাই স্বাভাবিক মানুষের স্বাভাবিক স্বভাব।

হেসেছে নিতুমা।

কানের কাছে মুখ এনে চাপাগলায় বলেছে। বলেছে, নীলামোতির ব্যাধি, ব্যাধির কারণ। ব্যথার জায়গাটা কোথায় তার।

আশ্চর্য হয়ে গেছে নীলামোতি।

আর কিছু জানুক না জানুক, কিছু করতে পারুক না পারুক, অন্তত অপরের মনে নিজের মনকে পাঠিয়ে দিয়ে ঘটনাটা জেনে আসার ক্ষমতাটা আছে। শেষমেষ কি হয় দেখতে কি দোষ! হলেই বা অনেক দেখা অনেক শোনা অভিজ্ঞতাটাও তো কম লাভের নয়। জীবনের সব আশা সার্থক হয়ে উঠবে, সব ইচ্ছে পূর্ণ হয়ে উঠবে এমন কোন কথা নেই।

গীতার কর্মফলের আশা না রেখে কর্ম করে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা সম্পূর্ণ মনেপ্রাণে মেনে নিয়েছে নীলামোতি উপস্থিত পরিস্থিতিতে।

বিফল হয়ে হয়ে কোন ফলের আশা না রেখেই এখন যেতে আরম্ভ করেছে সবার কাছে। যেখানে যখন যার খবর পায়। এটা স্রেফ কৌতূহলের বশে। তাই পদে পদে ব্যর্থ হলেও জমা ক্ষোভ দুঃখ অভিমানের ওপর নতুন করে নতুন কোন ক্ষোভ দুঃখ অভিমানের বোঝা আর বাড়ে না।

এখানে রয়ে গেছে তাই।

শুধু দেখার সাধেই আসা, আর দেখার সাধেই বসে বসে দেখা।

দেখেছে নীলামোতি।

আসনের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে নিতুমা আরতি করছে। নতুন ধরনের। কত জায়গা ঘুরেছে, এমনতর আরতি দেখেনি কোথাও।

বলির ছাগলের মাথা নিয়ে আরতি।

সরায় রাখা মাথায় প্রদীপ জ্বলছে। দুহাতে সরা ধরে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে বরণ করার মতো করে আরতি করছে আপন মনে নিতুমা।

চরণ নাভি বুক মাথা।

বাজনা নেই বাদ্যি নেই। তবু মনে হচ্ছে ঢাক ঢোল কাঁসর ঘণ্টা ঝাঁঝর বাঁশি নূপুর শাঁখ বেজে চলেছে আরতির তালে তালে এক সঙ্গে। এ এক আশ্চর্য অনুভূতি।

আরতি করতে করতে চামরের মতো দুলছে নিতুমা। নিতুমার দেহটা বুঝি চামর হয়ে গেছে। একটা মাথার আরতির শেষে শুরু হচ্ছে আর একটার। অপরূপ অপূর্ব।

দেবীও কি সত্যি সত্যিই দুলছে? ডাইনে বাঁয়ে। মাঝে মাঝে ঝুঁকে পড়ছে সামনে। আবার হেলে পড়ছে পেছনে নিতুমার মতো।

কে জানে: নিতুমার আরতি করাটা চোখে এত বড় হয়ে ধরা পড়ছে দুলছে যে দেবীর দোলাটা সত্যি না হলেও দৃষ্টি বিভ্রম হওয়া কিছু বিচিত্র নয়।

আরতির পর প্রণাম শেষে, মুখ ফেরাতেই নিশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম। কি ভীষণ কি ভয়ংকর।

দুচোখে হাত চাপা দিয়েছে নীলামোতি।

শান্তসুন্দর মুখে অমন গালের হাড় উঁচু কুৎসিত হয়ে উঠল কেমন করে! অমন টানা চোখ কেমন করে কোটরের মধ্যে চলে গেল! কেমন করে স্নেহঝরা ছলছলে তারা দুটো থেকে আগুনের ফুলকির ফুলঝুরি ঝরে পড়ল

নিতুমাকে এমন দেখল কেন নীলামোতি?

এতক্ষণে একবারও তো ভয়ংকরী চামুণ্ডার মুখের দিকে তাকায়নি সে। একভাবে তাকিয়ে থাকলে না ওই মুখের ছবি নিতুমার মুখে ভেসে উঠতে দেখবে।

শোনা কথা 'নিতুমার এমন হয়' এটাই কি মনের গোপনে এঁকে

গেছল নিজের অগোচরে। সময়ক্ষণ বুঝে বাইরে বেরিয়ে এসে ভয় ধরিয়েছে।

তাই বা হয় কেমন করে!

শোনা কথার এতটুকু আঁচড় তো বিশ্বাসের জমিতে কোনখানে একটুও দাগ কাটেনি। তবে? সত্যি সাধনা? দেবীর ভাবে পূজারিণীর নিজেকে ডুবিয়ে দেয়া। না কোন গোপন রহস্য। যাদুকরীর যাদুর মায়াজাল বা নিজের ভাবে অপরকে ভাবানো—সম্মোহন।

জানার অনেক জগতের অনেক ধারা নীলামোতির মাথার মধ্যে গিসগিস করছে বলে, কোন ব্যাপারেরই বিচারবিশ্লেষণে কোন থৈ পায় না।

নীলামোতির বুদ্ধির মাপকাঠি আর এগোতে পারছে না। এগোতে চাইছেও না। সব গুলিয়ে যাচ্ছে। যন্ত্রণা বাড়ছে বড্ড। মাথাটা ছিঁড়ে পড়ে বুঝি ঘাড় থেকে। বসে থাকতে পারছে না আর নীলামোতি। শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। অবসন্ন হয়ে আসছে সারা দেহ।

আলতো হাতে নীলামোতির হাত সরিয়ে দিচ্ছে কে চোখের চাপা থেকে?

আমি। আমি নিতু দেয়াসিনী। নিতুমা। কোন ভয় নেই তোমার। আমি আগের আমিই আছি। চাও। চেয়ে দেখ। চেয়ে দেখ।

চোখ খুলেছে নীলামোতি। খুব ভয়েময়ে, একটু একটু করে। সেই প্রাণ জুড়ানো মন কাড়া মুখ। সেই অভয়ার শান্তিজল ছিটনো ঘুমপাড়ানি চাউনি।

হাসছে নিতুমা।

মাঝের আঙুলের কাজল বুলিয়ে দিচ্ছে নীলামোতির চোখের কিনারায়। তর্জনীর সিঁদুর পরিয়ে দিচ্ছে কপালের টিপে। টেনে দিচ্ছে লম্বা করে মাথার সিঁথিতে।

বিজয়বালা নীলামোতির পাশে এসে কামরূপ কামাখ্যাদেবীর মন্ত্র শোনাচ্ছে জোরে জোরে। বশীকরণ মন্ত্র। ওঁ আদেশ গুরুকো অক্ষাং ভুং বাটাং হূং ফট।

মনপ্রাণ ভরে উঠেছে নীলামোতির।

ভেতর বার সুন্দর হয়ে উঠছে। শুধু সুন্দর নয়, সুন্দরতর সুন্দরতম।

কোন কাজই কি শান্তিতে সুশৃংখলায় হবার নয় নীলামোতির জীবনে!

একটা অজানা ত্রাসের ছায়া এগিয়ে আসছে মণ্ডপের ভেতর। একটা বিষধর সাপের হিসহিস গর্জন। হৃৎপিণ্ডের রক্ত জমে যাবারই কথা।

মাথায় সাপের ঝাঁপি। ডানহাতে মড়ার খুলির ভেতর প্রদীপ জ্বলছে। নিভতে না দেয়ার জন্যে বাতাস আগলাচ্ছে বাঁহাতে মঙ্গলা বাগদিনী।

মঙ্গলা নাম দিয়েছে কে, কে জানে! পেত্নীর চেহারায় অমঙ্গুলে মূর্তি একটা। ঠোঁট সরু করে মুখে নিশ্বাস টানছে ছাড়ছে। ওর নিশ্বাস টানা ছাড়ার মধ্যেও সাপের হিসহিস গর্জন গর্জে উঠছে।

সাক্ষাৎ কালনাগিনী এসে দাঁড়িয়েছে যেন নিতুমার সামনে।

এ দৃশ্য দেখতে পারছে না আর নীলামোতি। এ আওয়াজ শুনতে পারছে না আর। কি করবে কোথায় যাবে? সুড়ঙ্গের ভেতরে গিয়ে কি লুকিয়ে পড়বে? উঠতেও পারছে না যে। পা দুটো ধরে গেছে!

ত্রাস আর ত্রাস।

এর বুঝি শেষ নেই। যা চাওয়া যায়, তা পাওয়া যেমন দুরূহ ব্যাপার, পেলেও তো ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু না চাইতেই আসে বিভীষিকা আসে বিপর্যয়। এদের সরানো যায় না সহজে। বিপজ্জনক অবস্থা করে তোলে মুহূর্তে মুহূর্তে।

খানিক আগে নিতুমাকে ভীষণ দেখার পর এই চোখেই দেখেছে কত মোলায়েম কত শান্ত কত সুন্দর। ভেতর যার চায় শান্তি আর সুশ্রী সুরুচি, তার পক্ষে যথার্থ চাওয়াই তো এইটা। তা-ও সইলো কই নীলামোতির ভাগ্যদোষে! নিজের ভাগ্যকে নিজেই ধিক্কার দিচ্ছে নীলামোতি বার বার। তার বরাতে পূর্ণিমার মাঝ রাতের চাঁদের

মধ্যেও গ্রীষ্মের ভরদুপুরের সূর্য এসে উপস্থিত হয় হঠাৎ করে। ভরা জোছনায় খর রোদের দাপাদাপি।

নিজের জীবনের ছবি নিজে দেখছে, আর বসে বসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে নীলামোতি। তবুও ভেতরে চেপে বসা ব্যথার জগদ্দল পাথরটা কি নড়ছে এতটুকু? মনে তো হয় না। নড়ুক না নড়ুক, আতঙ্কে আতঙ্কে না প্রাণটুকু খোয়া যায় শেষমেষ। মঙ্গলা বাগদিনীর এখানে পদার্পণের পর থেকে ক্ষণে ক্ষণে যেরকম পরিবেশের পরিবর্তন হচ্ছে তা খুবই আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠছে।

মঙ্গলা বাগদিনীর এখনো মাথায় সাপের ঝাঁপি। মুখে সাপের গর্জন। হাতে মড়ার খুলিতে প্রদীপ জ্বলছে, এখনো মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিতুমার। কেন এসেছে, কি উদ্দেশ্যে এসেছে, কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না। এখানের সাধনার ক্রিয়াকলাপ পণ্ড করার জন্যে কি? কোন ব্যাপারের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যে কি?

নিতুমার কিন্তু ভাবান্তর দেখা যাচ্ছে না। না ভয় না বিদ্বেষ না রোষ—কোন কিছুরই ছাপ ভেসে উঠছে না মুখেচোখে। কেবল বড্ড বেশী গম্ভীর-গম্ভীর দেখাচ্ছে মুখখানা। চোখের চাউনি কোন্ অজানা লোকের অজানা আঙিনায় ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। সামনে কে দাঁড়িয়ে না দাঁড়িয়ে লক্ষ্য পড়ছে না।

সমুদ্রে শিশিরকণার মত এ আতঙ্কের রাজ্যে এই আনমনা অপার্থিব ভাবটা পলকের হলেও স্বস্তির কৃপাবিন্দুই বলে মনে হয় নীলামোতির কাছে। মনটা হালকা হয়ে ওঠে। ভুল হোক ঠিক হোক, আগের ভারবোঝা অনেক—অনেক লাঘব হয়ে যায়। তখন এটাই বড় হয়ে দাঁড়ায়। সেই বা কতক্ষণ। ওৎ পেতে বসে থাকে নির্দয় নিয়তি। ঝাঁপিয়ে পড়ে নিষ্ঠুর পরিহাসে তছনছ করে দেয় তার ধ্যানধারণা।

আবার রুদ্ধশ্বাসে দেখার পালা—একটা ভয়ঙ্করের আগমনের উপক্রম হচ্ছে বুঝি। হচ্ছে কেন হতে চলেছে। মঙ্গলা বাগদিনী কি সত্যিসত্যিই নাগিনী হয়ে উঠছে! সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে।

হাতের ইশারায় বিজয়বালা ওকে নিতুমার সামনে থেকে সরে যেতে

বলেছে। সঙ্গে সঙ্গে ও পেছু হটেছে। একেবারে চামুণ্ডার বেদীর কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বসেছে খুব আস্তে আস্তে। অতি সাবধানে। পাছে মাথার ঝাঁপিটা পড়ে যায়। নিজের কাছ থেকে বেশ খানিক তফাতে ঝাঁপিটা এগিয়ে রাখল। নিজের সামনে মড়ার খুলি রেখে, ভেতরের প্রদীপের সলতেটা একটু উসকে দিল।

হাঁটু মুড়ে চোখ বুজে বসে বসে দুলছে। একবার পেছনে, একবার সামনে। সামনে লাল কাঁকর মাটিতে মাথা ঠেকছে। আবার ধনুকের মত বেঁকে গিয়ে পেছনের মাটিতে। মুখের বাতাসে কিন্তু গর্জন এতটুকু কমে নি। বরং ক্রমে ক্রমে বেড়েই উঠছে।

মণ্ডপের মধ্যে যারা বসে আছে, তারা বসেই আছে। নিথর-নিস্পন্দ পাথরের মত। বিপদ ঘটার আগে আত্মরক্ষার প্রস্তুতির তাগিদ কারো দিক থেকেই একটু উঁকিঝুঁকি মারার লক্ষণও লক্ষ্য পড়ছে না। যেন প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে বসে আছে সব। নির্বিকার নির্লিপ্ত নির্ভয়।

নীলামোতি ওদের মত অমন হতে পারবে না। তার প্রাণের মায়া যাই-যাই করেও যায় নি। চেতনা যখন মরিয়া হয়ে ওঠে, তখন মরণকে আলিঙ্গন করে মরণজয়ী হয়ে উঠতে ইচ্ছে করে। সেও কিছু সময়ের জন্যে। আবার ক্ষেপে ওঠে বাঁচার ইচ্ছেটা প্রবলভাবে। ভীতুর মত লোকের আপদের শান্তি হয়ে মরতে যাবে কেন? মরণে নিজের পরাজয়কেই মেনে নেয়া হবে না কি? হবে, বেশি করেই হবে।

বসে বসেই এগোচ্ছে একটু একটু করে মঙ্গলা। একবার করে মাথা নোয়াচ্ছে। আর ডানহাতটা মাথার বাইরে অবধি বাড়িয়ে দিচ্ছে। বুড়ো আঙুলে মাটির ওপর তিনটে আঁক কাটছে পর পর। তারপর উঠে পড়ছে। বসছে একটু। খানিক অপলকে চেয়ে থাকছে ঝাঁপির দিকে। বেদিনীর গানের সুরে সুর করে বলছে, 'ষোড়শ ডাকিনী লয়্যা দেবী ওঠেন রড়, আম্মাকার অষ্টাঙ্গ জুড়্যা পড়ল্য বহর গড়...।'

গাঁয়ের মানুষ গাঁয়ের কথায় দেবীস্তুতি করছে আর দেবীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করছে। তার সারা শরীর লোহার গড় ঘিরে থাকুক। বিষফণীর দংশনে যেন কালো বিষ না প্রবেশ করতে পারে দেহের কোন রোমকূপ দিয়েও।

গানের কথায় বেশ বোঝা যাচ্ছে, একটা কিছু মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে যেতে পারে এখানে। তারই আভাস মঙ্গলার দেহরক্ষার মন্ত্রগানে।

মুঠিখোলা দুহাত এগিয়ে দিচ্ছে মঙ্গলা ঝাঁপি লক্ষ্য করে। আবার মুঠো করে বুকে চেপে ধরছে নিজের হাত নিজে। প্রদীপের আলোয় মুখমানা হয়ে উঠছে হিংস্রকুটিল। ফুটে উঠছে ঠোঁটের কোণে পিশাচের প্রাণঘাতী হাসি।

নিতুমা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। নড়াচড়ার নাম নেই।

একদৃষ্টে দেখল বিজয়বালা।

মাটিতে শুয়ে পড়ে—সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল পায়ের বুড়ো আঙুলে হাতের ছোঁয়া রাখে।

নিতুমা একটু নড়ে উঠল। পলক পড়ছে চোখের ঘন ঘন। চারিদিকে তাকিয়ে নতুন কিছু দেখছে বুঝি। অন্য দুনিয়ায় মন চলে গেলে, ফেরার পর প্রথমটা অন্তত এমনই হয় বোধ হয়।

এখানে মানুষমনের বিজয়বালার স্পর্শে এখানকার মানুষ হয়ে উঠেছে আবার নিতুমা।

নিতুমার চোখে চোখ পড়েছে মঙ্গলার মুখের হাসি মিলিয়েছে মুখে। ঝাঁপি খোলার সাহসে টান ধরেছে। হাত গুটিয়ে বসে আছে, হাতের নিশপিশ ভাবটা থমকেছে।

আজকের বিধিলিপি কি বোঝা যাচ্ছে না। নেপথ্যে বসে সুতোয় বাঁধা মানুষ-পুতুলদের নাচাচ্ছে হাসাচ্ছে কাঁদাচ্ছে। নিজে যে কি না কি আনন্দ পাচ্ছে এতে—নিজেই জানে। এই মণ্ডপের ভেতর ভয়ানকের এত আনাগোনা করিয়ে ভয়ংকরের খেলা দেখানোর কি-ই বা প্রয়োজন এত বিধাতাপুরুষের?

উত্তরের বেড়ার দরজা ঠেলে, এক এক করে ঢুকছে ক'জন মেয়ে। বয়েসে মঙ্গলার প্রার ধারে কাছে। বাইশ-তেইশ। একজন দু'জন নয়, পর পর আটজন। সকলের মাথায় সাপের ঝাঁপি, হাতে মড়ার খুলিতে প্রদীপ জ্বলছে। মাটির। মুখে সাপের হিসহিস শব্দ। চেহারায় প্রকৃতিতে এরা সকলেই প্রায় মঙ্গলা বাগদিনীর সমগোত্রের।

কান পাতা যাচ্ছে না আর।

হিংস্র সাপের হিস হিস শব্দ এদের মুখে মুখে।

প্রত্যেকের রুখু এলোচুলের তলা দিয়ে পিঠ থেকে অর্থাৎ ঘাড় ছুঁয়ে বুকের মাঝখানে এসে দুলছে একহারা কুঁচের মালা। ছোট হলেও লালফলে কালো টিপ চোখ পড়ার মতো। লাল পাড় কোরা শাড়ি হাঁটুর ওপর থেকে উঠে কোমর পেঁচিয়ে, আরো ওপরে বুক ঢেকে পেছনে গিঁট বাঁধা। বাগদিদের ঘরের মেয়ে এরাও।

মধ্যিখানে মঙ্গলাকে রেখে ওরা বসেছে ভাগাভাগি করে। বাঁদিকে চারজন ডানদিকে চারজন। চোখে চোখে হাসি খেলে যাচ্ছে এদের। বসার মতো সাপের ঝাঁপিও রেখেছে মঙ্গলার ঝাঁপির দুধারে। মড়ার খুলিও তাই।

মঙ্গলাকে নিয়ে ন'জনের ঝাঁপিতেই বিষধর সাপ। যে ক'জন আছে, তাদের মরণের কোলে তুলে দিতে যথেষ্ট। সময়ও নেবে না বেশীক্ষণ।

মানুষের কাল নিয়ে যারা বসে, তারা সকলে একদলের। কোন একটা মারাত্মক ষড়যন্ত্র করে এলে, পেরে ওঠা অসম্ভব। নিতুমার গুণের কদর হয়তো বা বোঝে না এরা। বোঝে প্রতিপত্তির প্রভাব। বোধ হয় প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলে জ্বলে খাক হয়ে যাচ্ছে ওরা সেই কারণে। তাই নিতুমাকে হেনস্থা-অপদস্থ করার চেষ্টা লোকচক্ষে। কাজ ব্যর্থ করার চেষ্টা—তিথিক্ষণে সাধনায় সিদ্ধিলাভের মোক্ষম বাধা হিসেবে।

নীলামোতির বিচারশক্তির আদালতে এই রায়ই বেরোচ্ছে এদের ভাবগতিক দেখে। অনেক সময় অনেক গোপন রহস্যের দরজা খুলে গেলে দেখা গেছে সব রায় উল্টে যেত। শতজন্মের ভাবনাচিন্তায় যে জিনিস চাক্ষুষ করা যেত না, তাও সম্ভব হয়েছে। দেখা গেছে, জানা গেছে, আশ্চর্য হয়ে। আশ্চর্য ভাবে।

অসহায় নিরুপায় নীলামোতি। কি ঘটবে, আঁচ করেই আঁতকে উঠছে।

মঙ্গলার দলের মেয়েরা গলায়-গলা মিলিয়ে দেহ-বন্ধনের মন্ত্রগান গাইছে—'ষোড়শ ডাকিনী লয়্যা দেবী ওঠেন রড়, আম্মাকার অষ্টাঙ্গ জুড়্যা পড়ল ল্বহর গড়···।'

নিতুমা দাঁড়িয়েই আছে।

একটু আগে প্রণামের স্পর্শে বিজয়বালা সচেতন করে তুলেছে।

আনমনা ভাবটা কেটেছে সম্পূর্ণ। মেয়েদের গুরুত্বই দিচ্ছে না মোটে। দেখে মনে হয় তাই। ওদের দেখছে আর মিটি মিটি হাসছে। যেন এরা কিচ্ছু নয় নিতুমার কাছে। নিতুমা নিতুমাই।

নিতুমা দেয়াসিনী।

দেবতার পূজারিণী। দেবতার চরণে উৎসর্গগত প্রাণ। নিতুমার আপনজন একমাত্র তার ইষ্টদেবতা। দ্বিতীয় কেউ তার আপন। পৃথিবীর আত্মীয়-স্বজনও আপন নয়। নিতুমা তবে কার? নিজের ইষ্টদেবতার। নিজের ইষ্টদেবতাই পিতা মাতা স্বামী পুত্রকন্যা—এককথায় সর্বস্ব। জীবনের জীবন।

নিতুমা নিজের ভাবে নিজে তন্ময়। অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী। মনে যা করে, কাজেও তাই করে হাতেনাতে ফলাফলের প্রমাণ দেখিয়ে দেয়। তার রাজ্যে হবে না, পারবো না বলে কোন কথা নেই। হ্যাঁ হবে, নিশ্চয় পারবো—নিতুমা বলে, সব মন্ত্রের সার মন্ত্র এই দুটি কথা। এতে অসাধ্য সাধন করা যায়। তার মনের জোর আর দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে। বাধাবিপত্তি তো সঙ্গীসাথী। এদের দাপটে ভেঙে পড়লে চলবে না। তবেই না! এমনি কি আর দেয়াসিনী হব বললে হওয়া যায়। না, হয়ে বজায় রাখতে পারা যায় মৃত্যু অবধি!

নিতুমার গুণের কথা শুনেই তো নীলামোতির আসা এখানে। যদিও এখানে এসে কত লোকের মুখে আবার অপপ্রচারের কথাও শুনেছে। যেমন, নিতুমা ভয়ংকরী, ওকে চেনা দায়, বোঝা ভার। আরো কত কি।

নীলামোতি ভেবেছে, ভালো গাছের পাশে আগাছা তো থাকে। এতে কি এসে যায়। কিন্তু ভেতরে এসে নীলামোতির দুটো মনই কাজ করে যাচ্ছে পাশাপাশি। একটা ভালো, একটা মন্দ।

যেমন ভালো লাগছে সময়-সময়। তেমনি অবিশ্বাস সন্দেহ ভয় যে না আসছে তা নয়। আসছে। একটু-আধটু নয়, পরিপূর্ণ।

নিতুমার মুখের হাসিটা এবার কেমন-কেমন ঠেকছে। অদৃশ্য রহস্যের ছোঁয়া মাখানো। রহস্যপুরীর গোপন আগল বন্ধ করে দেয়ার, না খুলের দেয়ার—বোধগম্য হচ্ছে না কিছু।

গুটনো মোষের চামড়াটা এনে বিছিয়ে দিল বিজয়বালা নিতুমার সামনে। শিশুর মত ফিক করে হেসে পিঠে চাপড়েছে বিজয়বালার নিতুমা।

বসেছে চামড়ার আসনে মঙ্গলাদের ওপর ঘোরাফেরা করছে দু'চোখের তীক্ষ্ম অন্তর ভেদ করা নজর।

বুকের তলায় প্রচণ্ড কাঁপন ধরছে নীল্যেমোতির

নানা জায়গায় যাতায়াত করে করে এ জ্ঞানটুকু সঞ্চয় করেছে নিশ্চিত-ভাবে—কোন ক্রিয়াকলাপের কোন আসনের বিশেষ প্রয়োজন। ক্রিয়া-অভিজ্ঞ সাধুসন্ন্যাসীরাই তার প্রশ্নের উত্তরে বিশদ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছে।

নিতুমা কি মারণ-ক্রিয়ায় নামছে ?

কেন ? কি কারণে, কাকে ? এটা তো ভালো লোকেরা করে না জানে নীলামোতি ! দুষ্টু লোকেরও মনে শুভবুদ্ধি আনার চেষ্টা করে। তার ব্যাপারে কাউকে তো মারণ করার দরকার নেই। তবে কি মঙ্গলাদের ওপর ! না, না। এটা ঠিক হবে না নিতুমার। অন্যভাবে তাড়িয়ে দিক না এদের। করলে সাধনাভ্রষ্ট, হবে। মহাত্মারা তাই বলে থাকেন।

বিজয়বালার চুল ওপর দিকে টেনে তোলা। মাথার মাঝখানে ঝুঁটি করে বাঁধা। ওরও লালপাড় কোরা শাড়ি। আঁচল জড়ানো কোমরে। ঝাঁপির এলাকা থেকে নিজেকে একটু তফাৎ রেখে দাঁড়িয়ে। ভালো করে আপাদমস্তক দেখছে প্রত্যেকের। এক দুই তিন···সাত আট নয়। আবার ফিরে আসছে দৃষ্টি। প্রথম থেকে বার সাতেক চলল এই দৃষ্টির আনাগোনা।

তর্জনীর ইঙ্গিতে ঝাঁপির ঢাকা খুলতে বলেছে বিজয়বালা। বলেছে মঙ্গলাকেই। প্রথমে ও খুলবে। তারপর অন্যেরা। খুব বেশী দেরী হয়ে না যায় যেন। একের পর খুলে যেতে হবে। একটু তাড়াতাড়ি।

সর্বনেশে কাণ্ড। বিজয়বালার মাথাটা কি বিগড়েছে ! যতই সাধনা করে থাকুক, প্রায় একসঙ্গে নটা মৃত্যুদূতকে ঝাঁপিমুক্ত করা কি ঠিক হচ্ছে ! বিষের জ্বালায় ছটফট করে মরতে হবে সকলকে। পাগলামো আর কাকে বলে ! এমন আহম্মকও থাকে মানুষ !

পা দুটো আগে থেকেই ধরে গেছে নীলামোতির। বলতে গেলে, মঙ্গলা আসার পর থেকেই। এখন তো পঙ্গু একদম। কোন সাড় নেই। ওঠা পালানোর কথাই ওঠে না। প্রবাদ বলে, 'বাঘের দেখা, সাপের লেখা।' আগের প্রবাদবাক্য কি আর এখন খাটে! খাটুক না খাটুক, বিজয়বালার বাহাদুরি দেখানোর দৌলতে সাপের কামড়ে প্রাণ যাবে এবার নীলামোতির। কোন ভুল নেই।

মঙ্গলাদের মুখের হিসহিসে সাপের গর্জন থেমে গেছে একদম। ওরা অতি সন্তর্পণে ঝাঁপির বাঁধন খুলছে। চোখের পলক পড়ছে না ওদের। তারা নড়ছে না সবার যেন পাথুরে চোখ। একমাত্র ঝাঁপিই ওদের প্রধান লক্ষ্য। অন্য কিছুতে লক্ষ্য নেই কোন।

নিতুমা প্রতিমার মত চুপচাপ বসে। হুঁশিব্যবুদ্ধি হারিয়ে ফেলা মানুষ যেন। একটু পরে একটা সংঘাতিক ঘটনা ঘটে যেতে পারে যে, কোন খেয়াল নেই। হয়তো নিতুমা গড়ে উঠেছে বিষকন্যার নিয়মে। যে মানুষ করেছে, ছোট থেকে পরিমাণ বাড়িয়ে বাড়িয়ে একেবারে বিষকন্যা বানিয়ে দিয়ে গেছে। বিষ খেয়ে খেয়ে নিতুমা বিষহরি।

নিতুমার প্রধান চেলা বিজয়বালা বলতে গেলে বুকের এক-দিকের পাঁজরা। ওকেও তৈরি করেছে নিতুমা নিজের মত। তাই বিজয়বালার এত সাহস। বিষধরের সঙ্গে মখোমুখি হয়ে লড়তে প্রস্তুত। রণং দেহি মূর্তিতে দাঁড়িয়ে।

সাপের দংশনে নিতুমা-বিজয়বালা না হয় মরবে না, সাপ নিজেই মারা পড়বে এদের বিষে। কিন্তু অন্যেরা? সেটা ভাবাও কি উচিত নয় এদের দুজনের? নিজে বাঁচার চেয়ে আশ্রিতদের বাঁচানোই তো প্রধান ধর্ম। মহাজনদের এ অমরবাণী তো সর্বজন বিদিত। সে বোধের লেশমাত্র আছে কিনা এদের মধ্যে—সংশয়ের অবকাশ রাখে না।

নেই, নেই। থাকলে, মৃত্যুকে এভাবে আহবান জানাত না এরা। অন্তত অন্যদের মুখ চেয়েও।

দুশ্চিন্তায় ছেদ পড়ল নীলামোতির।

ভীষণ গর্জে উঠেছে জঙ্গলের বিষধয়রা।

প্রতিটি ঝাঁপির মুখ খোলা। বিষধরেরা ফণা দোলাচ্ছে। তাক

খুঁজছে দংশনের। সাপের চোখে চোখ রেখে অপলকে তাকিয়ে মঙ্গলারা। ওদের মুখ কঠিন। আরো কঠিন হয়ে উঠছে। দাঁতে দাঁত চেপে রয়েছে শক্ত ক'রে।

নীলামোতির মনে হচ্ছে, এসব কি সত্যি সত্যি, না জাদুর মায়া খেলা। না দুঃস্বপ্ন! এরকম কাণ্ডকারখানা তার পক্ষে সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে দেখা কি সম্ভব। বরাবরই শুনেছে, সে নাকি অতি-ভাবুক। লাগাম ছাড়া কল্পনার ঘোড়ায় চেপে মন শূন্যে নানান ভেলকির রঙ-বেরঙের খেলা দেখে বেড়াচ্ছে না তো।

মণ্ডপের ভেতর একটা ঘূর্ণি ঝড় এসে আছড়ে পড়ল বুঝি। বাতাসের কি গর্জন! অজগরের শতগুণ। চমকে উঠেছে নীলামোতি। চোখ রগড়ে নিয়ে, হাতচাপা দিয়েছে কানে। পরদা ফেটে যাবে যে!

নীলামোতির চিন্তার স্বপ্নঘোর কেটেছে। ফটিকস্বচ্ছ হয়ে উঠেছে সংবিতের আয়না। দেখছে। স্পষ্ট দেখছে, প্রত্যেকটি মৃত্যুদূত লুটিয়ে পড়েছে। প্রবল ঝড়ের দাপটে আঘাতে ওরা বিধ্বস্ত। মুমূর্ষু। মৃতপ্রায়—নির্জীব।

কেমন করে সম্ভব হল এটা! কোন অলৌকিক ব্যাপার, না কোন মন্ত্রগুণে!

মনে হচ্ছে একটা সাপ—মঙ্গলার, ফণা তুলতে চেষ্টা করছে। নিমেষে বিজয়বালার শরীরটা একটু কেঁপে উঠল ফণাতোলা সাপেরই মত। তারপর আগের সেই অজগর গর্জনে তোলপাড় করে তুলল মণ্ডপ। সাপটা নিস্তেজ হয়ে পড়েছে আবার।

চোখে যা দেখল নীলামোতি, অবিশ্বাস্য। গর্জন যা শুনল, তাও অবিশ্বাস্য। এ কেমন করে হতে পারে? মানুষের নিশ্বাসে এ গর্জন আসে কোত্থেকে? বিজয়বালার নিশ্বাসে-নিশ্বাসে! একি অভ্যেসের গুণে, না সাধনা সিদ্ধির ফলে। কোন সঠিক ব্যাখ্যাতে এসেই পৌঁছতে পারছে না ঝিমঝিমে মগজ।

বিষধরেরা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চেষ্টা করছে। মঙ্গলা গলা টিপে ধরে হাঁ করিয়ে বিষধরের কালো বিষ বার করে নিল মাটির খুরিতে। এরপর নিস্তেজ হয়ে পড়েছে ক্রূর জীবটা। ঝাঁপিতে পুরে ঢাকা এঁটে দিয়েছে।

মঙ্গলার দেখাদেখি অন্যেরাও একই ব্যাপার করেছে।

ন' নটা খুরি এসে জমা হল নিতুমার কাছে। অর্ধচন্দ্রের মত খুরি সাজিয়েছে এক এক করে বিজয়বালা। প্রত্যেকটার পেছনে মড়ার খুলিতে প্রদীপ জ্বলছে। খুলির পেছনে মেয়েরা বসেছে হাঁটুমুড়ে। মঙ্গলাকে মধ্যমণি রেখে, ডাইনে-বাঁয়ে বসেছে মেয়েরা।

অর্ধচন্দ্রের ঠিক মধ্যিখানে কাকের বাসার কাঠ সাজিয়েছে বিজয়-বালা। প্রথমে চারকোণা, তার ওপর গোলাকার, তার ওপর তেকোণা। মাঝের ফাঁকে কর্পূরের ডেলা ফেলে দিল। নিমের শুকনো ডালে ঘি আর তুলো জড়িয়ে প্রদীপের আগুনে জ্বালিয়ে নিয়েছে। নিয়ে এসে নিতুমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছে।

নিতুমা হোমের সাজানো কাঠের ওপর দিয়ে বার তিনেক ঘুরিয়েছে জ্বলন্ত নিমডাল। এবার সাজানো কাঠের ফাঁকে ডালের আগুনে জ্বালিয়েছে কর্পূর।

নিতুমা ধুতরোবীজ মেশানো কোশা ভরতি ঘিয়ে আহুতি দিচ্ছে হোমের আগুনে—ওঁ ভগীং শ্রীং হ্লীং হ্লীং ত্রিতাপবিষ নাশয় নাশয় স্বাহা···।

নিতুমার মুখের মন্ত্র উচ্চারণ করছে মেয়েরা প্রত্যেকে। আর সেই সঙ্গে হোমে আহুতি দিচ্ছে ঘিয়ের বদলে খুরির কালো বিষ।

একি কালজয়ের সাধনা? না ত্রিতাপ-জ্বালার বিষ নিবারণের? না নিজেদের প্রবৃত্তিবিষে হাবুডুবু খাওয়া থেকে মুক্তির? নীলামোতির মাথার ভেতর জটিল জট পাকাচ্ছে।

এদিকে হোমপর্ব শেষ।

হাতে বেলপাতা আর জবা নিরে মোষচামড়ার আসনের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে নিতুমা। পায়ে পায়ে মঙ্গলাদের সামনে এসে উপস্থিত।

ওরা প্রদীপ জ্বালা মড়ার খুলি তুলে ধরেছে দুহাতে। বরণের ভঙ্গিতে বরণ করেছে নিতুমাকে। পা নাভি বুক কপাল। আবার কপাল বুক নাভি পা। তিনবার করে। বরণ শেষ।

ওরা হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছে নিতুমার কাছে। সকলে সমস্বরে।—মুক্তিং দেহি মুক্তিং দেহি মুক্তিং দেহি।

'স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি' বলার সঙ্গে সঙ্গে ওদের মাথায় বেলপাতা জবা দিয়ে পুজো করছে নিতুমা।

পুজো সেরে বলির হাড়িকাঠের কাছে এসে দাঁড়াল নিতুমা। লাল-কাপড়ের আভায়, না এমনি—মোট কথা, নিতুমার মুখখানায় তামাটে রঙে একটা অপূর্ব লালের জেল্লা ঠিকরে ঠিকরে বেরোচ্ছে।

বলির ছাগলের মত হাড়িকাঠের সামনে নিয়ে এলো বিজয়বালা মঙ্গলাদের। বিজয়বালা লালকাপড়ের টুকরো দিয়ে বেঁধে দিল মঙ্গলার চোখ। সকলেরই বেঁধে দিয়েছে পর পর।

মনে হয় নিজের অস্তিত্ববোধ হারিয়ে ফেলেছে একেবারে। ওরা কি সম্মোহিত, ওরা কি মন্ত্রমুগ্ধ? যত রাজ্যের ভয় আবার এসে ঘিরে ধরেছে নীলামোতিকে।

একি দেখছে সে!

হাড়িকাঠে মাথা ছুঁইয়েছে নিচু হয়ে মঙ্গলা বাগদিনী, আগের পাঁঠাবলির খাঁড়া নতুন করে আবার পুজো করেছে নিতুমা। দুহাতে উঁচিয়ে ধরেছে খাঁড়া মঙ্গলার ঠিক ঘাড়ের খানিক ওপরে। মন্ত্রপাঠের শেষে সঙ্গে সঙ্গে ওই জহ্লাদ খাঁড়াটা নেমে এসে সজোরে আঘাত হানবে মঙ্গলার নরম ঘাড়ের ওপর।—ওঁ ঐং হোং জীবশিব··· মুক্তপথে গময় গময়···। জীব শিব হয়ে মুক্তপথে গময়···। জীব শিব হয়ে মুক্তপথে গমন করুক · গমন করুক গমন করুক।

আর শুনতে পারছে না নীলামোতি।

নীলামোতির ভেতর ভূমিকল্প। বসার জায়গায়ও ভুমিকম্প শুরু হয়ে গেছে। এ যে নরবলি, না নরবলি নয়—নারীবলি!

এর আগে কখনো নরবলি বা নারীবলি দেখে নি নীলামোতি। বলি না দেখলেও নরমুণ্ড নিয়ে উন্মত্ত কাপালিকের মত ভয়ঙ্কর তাণ্ডব-নৃত্য করতে দেখেছে মানুষকে। সেটা স্বপ্নে দেখা নয় বাস্তবে। এই দুনিয়ার মানুষের ধমনীতে শিরা-উপশিরার রক্তের নাচুনিতে নেচে ওঠে তিথি-সময় ক্ষণ বিশেষে। কেন নাচে—হদিশ খুঁজতে গেলে পাওয়া যায় 'নানা মুনির নানা মত' থরে থরে সাজানো। যার যেটা মনে লাগে, নিজের করে নাও!

নিজের করে নিলেও, নিজের হয়ে থাকে কই! ধারণা ধরে রাখা বড় কষ্টকর। ঢেউয়ের মত অনবরত ওঠে-নামে, মিলিয়ে যায়। নিত্য নতুনের সন্ধানে মন বারে বারে ধায়। হয়ে পড়ে ক্লান্ত, হয়ে পড়ে বিভ্রান্ত দিশেহারা পাগলপারা।

এই রকমই মনের অবস্থা হয়েছে নীলামোতির কুড়মুন গাঁয়ে। বর্ধমানের কুড়মুনে।

চোখের দেখাটাকে সত্যি ভেবে নিতে মন চায় নি কোনপ্রকারে। কেবলি দুঃস্বপ্ন ভাবতে ইচ্ছে করেছে। ইচ্ছে করলেই কি আর ভেতর মেনে নেয় সব কিছু বিনা প্রতিবাদে! নেয় না বিভীষিকার এক একটা জলজ্যান্ত দৃশ্য স্মৃতির পাতায় সত্যির আঁচড়ে—ছবি নয়, জীবন্ত হয়ে, বেঁচে থাকে। সময় বুঝে দুরন্ত দাপাদাপি করে ওঠে। হৃৎপিণ্ড মাড়িয়ে-পিষে দিয়ে।

এখানকার নারীবলির সঙ্গে কুড়মুনের চৈত-সংক্রান্তি গাজনে নরমুণ্ড নৃত্যের যেন একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায় কোনখানে। তখনকার সেই ভয়াবহ পরিবেশ বুকের ওপর এমন চেপে বসেছে যে, বুকের ধুকধুকুনি শব্দটা বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম।

'অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরম ভেল'—

অমৃত সাগরে চান করতে নেমে একি হাল হল? অমৃতের বদলে গরলেই ভরে উঠল যে! কবি জ্ঞানদাসের এ কথা মর্মে মর্মে অনুভব করছে নীলোমোতি।

গ্রাম দেখতে গিয়ে গ্রামের সংস্কৃতি জানতে গিয়ে কি নাকাল তার। বীভৎস রসের উৎসব এটা, কে জেনেছে আগে! কুড়মুনের গাজন।

উৎসবের পাঁচ-ছদিন আগে গ্রাম বেড়াতে বেশ ভালো লেগেছে। শহুরে মানুষের আচার ব্যবহারের চেয়ে এদের ব্যবহারে প্রাণ আছে, হৃদয়ের স্পর্শ আছে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছে সব আপনজনের মত।

ফকিরডাঙার ঢিবি। শাজাহানের আমলের মসজিদের স্মৃতিচিহ্ন। এধার-ওধার ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ইট-পাথরের টুকরো। রাস্তা খুঁড়ে কবর বেরিয়েছে। বেরিয়েছে অনেক কুয়ো, কুয়োর পাড়। খড়্গেশ্বরী নদীর কোলে কুড়মুন। নদীটা অনেক সরে গেছে এখন।

শিবের নামে পাড়ার নাম। ঈশানেশ্বর পাড়ায় রামমোহন রায়ের

শ্বশুরবাড়ি ছিল। তাঁয় দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী শ্রীমতী দেবী ওখানকারই মেয়ে। মাথা নত করে মনে মনে রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা-প্রণাম জানিয়েছে নীলামোতি। ওখানে ও-সময়ে মনে হয়েছে, মহাতীর্থ দর্শনে এসেছে সে। নীলামোতির জীবন ধন্য। না জানে কত জন্মের পুণ্যের ফল এটা!

ঈশানেশ্বর পাড়ায় ঈশানেশ্বর শিবের মন্দিরে দেবীদুর্গার অষ্টশক্তিমূর্তির একটি মূর্তি রয়েছে—ইন্দ্রাণী। বড় সুন্দর পাথরের মূর্তিটি। এমন মূর্তি বড় একটা দেখা যায় না কোথাও।

ঈশানেশ্বর মন্দিরে নেই। তেরই চৈতের রাতে গাজনতলার মন্দিরে চলে গেছে ব্রাহ্মণপাড়া ছেড়ে। গাজন উৎসব অবধি ওখানেই বসবাস। তারপর ফিরে আসবে আবার ব্রাহ্মণপাড়ায়। এইটাই নিয়ম। এ কদিন সন্তোষ মণ্ডলের বংশধরেরাই পুজোপাঠের ভার বইবে শিবের।

শিবের আবিষ্কার করে প্রতিষ্ঠা করে সন্তোষ মণ্ডল। সে অনেক যুগ আগের কথা। গাজনেশ্বর তলার মন্দিরের পাথরে লেখা ইংরিজি সন। সতেরশো পঁয়তাল্লিশ। দুশো বছরেরও বেশী পুরনো মন্দির। সন্তোষ মণ্ডলরা উগ্রক্ষত্রিয়। তাই ঘোষাল ব্রাহ্মণরা শিবের পুরোহিত।

এক সময় কত না লক্ষ্মীর শ্রী ফুটে উঠেছে গাঁয়ের জলমাটিতে। মুখের ছড়ায়। সে ছড়ায় ধরা পড়ে আছে অতীত। অতীতের সুখ-শান্তি। মানুষের কাছে তুচ্ছ ছিল অভাব অনটন।

মাটির দেয়াল আর খোড়ো চাল হলেও বেশ নিকনোমোছানো গোপবাড়ীর গিন্নী ঠাকুরমা দাওয়ায় মাদুর পেতে বসতে দিয়েছে নীলামোতিকে। ভরণের চকচকে ঘটিতে জল ভরে দিয়ে, রেকাবিতে নারকেল নাড়ু দিয়েছে চারটে। ফোগলা মুখে হাসির উজান বয়ে গেছে। কাঁপা গলায় ছড়া শুনিয়েছে।—বারো আহার তেরো দীঘি। নবুড়ি গড়ে ছবুড়ি ডোবা। তিনশো ষাট পুষ্করিণী, এ নিয়ে কুড়মুন জানি।

ঠাকুরমার যত্নআত্তিতে মুগ্ধ না হয়ে পারে না কেউ। নীলামোতির না দেখা নিজের ঠাকুরমাকে যেন সশরীরে ফিরে পেয়েছে। ঠাকুরমার আদর কি, পায়নি জীবনে। ভূমিষ্ঠ হবার আগেই ইহলোক ত্যাগ

করে চলে গেছে পরলোকে। বাড়ির লোকের মুখে শুনেছে, ঠাকুরমার স্নেহের তুলনা হয় না। আপন পর বিচার ছিল না। বাড়িতে ভালো খাবারদাবার হলে পাড়াপড়শীর ছেলে মেয়েদের ডেকে ধরে দিয়ে এসে, না খাইয়ে মন ভরতো না।

কে বলে আগের মন সব হারিয়ে গেছে, আগের মানুষের সঙ্গে ?

ঠিক নয় ঠিক নয়। একথা ঠিক নয়। হৃদয়ের পথে পথে খুঁজলে, সে হৃদয় সে সাতরাজার ধন এক মানিকের মন পাওয়া যায়।

দেখার চোখ আর বোঝার মন নিয়ে খুঁজলে—তবে ?

প্রাণভরা পরিতৃপ্তি নিয়ে গাঁয়ের এপাড়া ওপাড়া পুব পশ্চিম উত্তর—ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে নীলামোতি। অনাদর অবহেলার চিহ্নমাত্র দেখেনি কোথাও। বরং উল্টোটাই পেয়েছে। না চাইতেই মেঘ-জল যাকে বলে। গেছে ডোম বাগদি দুলেদের ঘরে, গেছে মুসলমান পাড়ায়। ভেদাভেদ দেখেনি। দেখেনি অমানুষ। দেখেছে মানুষ। মানুষ মানুষ মানুষ।

চৈতের বাতাস গাজনের গান গেয়ে চলেছে। রাতের হাওয়া কানে কানে এসে শুনিয়ে যাচ্ছে।—ও সাতুলে সরস্বতী বসোমতী তুমি আমার মা, তোমাকে স্মরণ করে বাড়াই দুটি পা···।

কলকে গাছের ডালে ডালে গাজনের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ উনতিরিশ, চারটে দিনই সন্ন্যাসীদের আগমনে গাঁ সরগরম। গাজনতলা থেকে গাজনেশ্বর শিবকে পালকিতে তুলে শ্মশান-সন্ন্যাসীরা কাঁধে করে গ্রাম প্রদক্ষিণ করেছে।

শিব একা কারো নয়। সবার দেবতা! শিবের মাথায় আকন্দফুল আর বেলপাতা চাপিয়েছে জনায় জনায়। ছেলে বুড়ো জাতবেজাত। শিবের কাছে যে সবাই সমান ছোট বড় উঁচুনিচু কোন তফাৎ নেই। 'মান-অপমান সমান তো তার তার কাছে নাই কেউ দোষী। (ভোলা) বেলপাতা নেয়, মাথা পেতে, গাল বাজালে হয় খুশী। এততে ভুলে থাকে, নেচে আসে যেথায় ডাকে। ব্যোমভোলা বলে নাওনা যেচে যা খুশী। যা ফেলে দেছে, নেয় সে বেছে ভালোমন্দ নাই হুঁশী।' গানটা মনে পড়ে গেছে নীলামোতির অনেকদিন বাদে। বাবা রোজ ভোরে উঠে, দেয়ালে টাঙানো ঢুলুঢুলু আঁখি মহাদেবের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে দিয়ে গাইত এক মনে। একটু দুলে

দুলে। কে দেখছে, না দেখছে কোনদিকেই ভ্রূক্ষেপ থাকত না কোন।

নীলামোতির ঘুম ভাঙতো গানের কথায় সুরে। ছোট নীলামোতি খাটে বসে বসেই শুনেছে। একদিন আধদিন নয়, প্রতিদিনই শুনেছে আর মনে মনে গেয়েছে। বড় ভালো লাগতো। মর্ম কিছু বুঝুক না বুঝুক, ভুল হক ঠিক হক—কল্পনা হক——শিবের ছবিটা যেন অনেক বড়, অনেক জীবন্ত দেখাত।

মা শুনে, হেসে বলেছে, বাপের ধাত কিছু না কিছু ছেলে মেয়েরা পাবে তো। মায়ের মুখে শোনা তখনকার দিনে শিব-চতুর্দশীর রাত্রিতে সারারাত ধরে থিয়েটার হত। থিয়েটারে থিয়েটারে প্রতিযোগিতা চলত। এ থিয়েটারে তিনখানা হলে, ও থিয়েটারে চারখানা বই দেখানো হবে। সব জায়গায় নামীদামী অভিনেতা-অভিনেত্রী।

শিবচতুর্দশী বই দেখানো হবে প্রথমে। মায়ের উপোস বলে, মা ওই বইটা বাবার সঙ্গে গিয়ে দেখে এসে জল খেত।

শিবের ব্রতকথা অভিনয় করে দেখানো হত। কলকাতার প্রায় সব বাড়ির মেয়েরা যারা উপোস করত, শিবচতুর্দশী দেখতে যেত।

বেলগাছের তলায় শিব আধবোজা চোখে বসে আছে চুপচাপ। যেন ধ্যানমগ্ন। খালি গা, ধবধবে সাদা। বড় ভুঁড়ির নিচে বাঘছাল আঁটা। মাথার পাটকেলে জটার কিছু উঁচু করে ঝুঁটি বাঁধা। কিছু ঘাড়ের দপাশ দিয়ে বেয়ে এসেছে বুকে। গলায় হাতে বাহুতে রুদ্রাক্ষের সাজ। চকচকে রুপোলি ত্রিশূল ডান হাতের মুঠোয় ধরে সিধে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। বাঁহাত পার্বতীর কাঁধে।

পার্বতী সালংকারা। লাল বেনারসী শাড়ি। মাথায় নকল পাথর বসানো জ্বলজ্বলে মুকুট। নাকে টানা দেয় নথ। গা ভরতি গয়না। শিব-পার্বতীর—দুজনেরই কপালের মধ্যিখানে ত্রিনয়ন আঁকা। এমন আঁকা, দর্শকদের চিনতে 'অসুবিধে হয় না একটু দেবদেবীকে।

হিংস্র জন্তুর পেটে যাবার ভয়ে বেলগাছের ওপর উঠে বসেছে শিকারী ব্যাধ। সারাদিনের শিকার থলেয় পোরা। বুকে চেপে ধরে রয়েছে ডালের সঙ্গে জড়িয়ে রেখে।

কৃষ্ণপক্ষের ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত।

মঞ্চের দুধারের আলোর ফোকাস শিব-দুর্গার ওপর। মাঝে মাঝে কাঠের গাছে ব্যাধের ওপর। ব্যাধ ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে। পড়ে আর কি শিবের ঘাড়ে। থলে চুঁইয়ে রক্ত ঝরে পড়ল শিবের মাথায় গায়ে। বেলডাল পাতাসুদ্ধ ভেঙে পড়ল শিবের পায়ের ওপর।

ধ্যান ভাঙলো শিবের। বড় বড় চোখ করে তাকাল। বজ্রগম্ভীর স্বরে চিৎকার করে বলল, কে আমার ভক্ত রে। আমায় পুজো করলি আমার প্রিয় জিনিসে! বর চা. বর চা।

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেছে শিবদুর্গাকে। শিব ব্যাধকে বর দিয়েছে মুক্তির।

ব্যাধের মুক্তির কাহিনী শোনাতে শোনাতে মায়ের চোখ ভরে উঠেছে জলে। আপন ভোলানাথ সকলের মঙ্গল রে! সব অন্যায়ের মুক্তি রে! পাপীতাপী—সকলেরই পরম আশ্রয় পরম অভয়।

দশ-বারো বছরের নীলামোতির তখন এ বোধ জাগে নি মায়ের কথা বোঝার। তখন অর্থ বুঝতে না পারলেও মুখস্থবিদ্যার মত কাহিনীর সঙ্গে মায়ের শেষের কথাও মনে দাগ কেটে বসে গেছে। মঙ্গল · অন্যায়ের মুক্তি···পরম আশ্রয় পরম অভয়।

গাজনেশ্বরের গ্রাম প্রদক্ষিণ দেখতে দেখতে নীলামোতির ভেতরে কথা কথারই না ভিড় জমে উঠছে। সরল গ্রামবাসীদের আন্তরিক আকুতি সত্যিই তারিফ করার মত। যার কিছু নেই, ফুল-বেলপাতা ছাড়াই শুধু স্পর্শ করেছে শিবকে পালকির ভেতর হাত বাড়িয়ে দিয়ে। স্পর্শের পুণ্য নিজের মাথায় বুকে বুলিয়ে নিয়েছে বার বার নিজের হাতে।

এদের ভক্তিতে খাদ নেই, এদের বিশ্বাসে ভেজাল নেই। স্পর্শের অপরিসীম আনন্দে এদের মুখ-চোখ জ্বলজ্বলে হয়ে উঠেছে। সত্যি-সত্যিই যেন স্বর্গের দেবতা—হৃদয়ের দেবতাকে হৃদয়ের আসনে বসাতে পেরেছে এরা। এরা পাথর মাটির মূর্তিকে পাথরমাটি দেখে না। দেখে, মমতা আর দয়ামায়ায় গড়া মহাপ্রাণ। এদের প্রাণের প্রাণ।

নীলামোতি পালকির শিবকে ফুলের অঞ্জলি দিতে দেখছে আর

গ্নন গ্নন করে গাইছে বাবার গান। এ গান শিবস্তুতি বা শিবমাহাত্ম্য বলা যেতে পারে। গাইছে নীলামোতি।—বেলপাতা নেয় মাথা পেতে…।

অনুভূতিপ্রবণ মানুষ নীলামোতি। কোন কিছুর ছোঁয়া লাগলেই ভেতরের সুরে বাঁধা অনুভূতির তারটা কেঁপে ওঠে। বেজে ওঠে। বাজনার রেশটা থেকে যায় অনেক—অনেকক্ষণ ধরে। শিবের কাছে কিছু পাক না পাক, নিজের কাছ থেকেও কিছু তো এরা। এটা কম বড় পাওয়া নয়। এইটাই প্রকৃত পাওয়া।

শিব মঙ্গল। অতএব তিনি মঙ্গল করবেন। তাঁর মঙ্গল করা মানে মানুষের মঙ্গল হবেই। মানুষের মঙ্গল হলেই প্রত্যেকের নিজেরই মঙ্গল। শিব অন্যায়ের মুক্তি। অন্যায় থেকে মুক্ত করেন। মানুষকে সংশোধনের আলোয় নিয়ে যান. এই ধারণা-বিশ্বাসই মানুষকে সংশোধন করে নেয়ার প্রেরণা যোগায়। অন্যায়ের আওতা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার শক্তি খুঁজে পায়। শিব পরম আশ্রয় পরম অভয় ভেবে প্রবল ইচ্ছে-শক্তি জেগে ওঠে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করার।

ছোটবেলায় মায়ের মুখের কথার যথার্থ প্রমাণ পেয়েছে নীলামোতি কুড়মুনের গাজনে। শিবভক্তদের প্রাণঢালা ভক্তির জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেয়া দেখে। এসব চোখের সামনে না দেখলে, এ জ্ঞান আসতো কিনা জীবনে—সন্দেহ। আর একটা জিনিস, মানুষকে পশু না করে, মানুষ করে তোলার উৎসব গাজন। প্রতিটি মানুষ সমান—ধনী-গরীব। জাতপাতের কোন বালাই নেই। সকলে শিবের সন্তান। সবাই এক পিতার। সবাই একাত্মা। কুটিল হিংসাদ্বেষের বাঁধন ছিঁড়ে নিঃস্বার্থ ভালোবাসার বাঁধনে বাঁধা!

পৃথিবীর মানুষজনের সঙ্গে পরিচয় নীলামোতির। দেবতাদের সঙ্গে নয়। স্বর্গের রূপ কি জানে না। স্বর্গ কোথায়—তাও না। তবুও ভালো লেগেছে ভাবতে। উৎসবের দেবতা-স্বর্গের দেবতা। উৎসবের মানুষ—দেবপুত্র। উৎসবের স্থান—স্বর্গরাজ্য।

আর যারা দেখছে?

তারা পুণ্যার্থী, তারা তীর্থযাত্রী। তারা সাধক-সাধিকা।

ঊনতিরিশে চৈত্র।

গাজনেশ্বর তলায় এসে যত সন্ন্যাসী জড়ো হয়েছে। চেক কাপড় জাঙিয়ারের মত করে পরা। কোমরে বড় বড় ঘুঙুরের মালা। ঢাকের বাজনায় নাচতে নাচতে এসেছে ওরা। কোমরের ঘুঙুর বেজে উঠেছে বাজনার বোলের তালে তালে।

গাজনেশ্বর শিব ঈশানেশ্বরের প্রতিনিধি। গ্রাম প্রদক্ষিণে পালকিতে চড়ে বেড়ায় না ঈশানেশ্বর। গাজনতলার মন্দিরে থাকে। বেড়ায় গাজনেশ্বর।

সন্ন্যাসীরা শিবের সামনে নাচছে আর গাইছে। গলার উত্তরীয় দুলছে। গলা ছেড়ে গলায় গলা মিলিয়ে গাইছে ওরা।—

ও সাতুলে।
গণেশ থাকতে
অন্য দেবের পুজো!
নানান বিঘ্ন,
সিদ্ধ হয় না
তোর কাজে।

চতুর্দিকে ভিড় উপচে পড়ছে। তিল ধারণের জায়গা নেই। নীলামোতির কিন্তু অসুবিধে নেই। তাকে যত্ন করে আগলে রেখেছে, রেখেছে গাঁয়েরই মেয়েছেলেরা। নীলামোতি তাদের অতিথি যে। কোনরকমে গায়ে আঁচড় না লাগে এতটুকু।

উত্তর-পুব-পশ্চিম দিকে বাঁশের থাক থাক সিঁড়ি নিচ থেকে ওপরে উঠে গেছে। সিঁড়িতে হরেক রকমের ছবি নয়। মাটির পুতুল, লোকেরা ছবি বলে।

উত্তর দিকে উত্তর পাড়ার পটুয়ারা সাজিয়েছে নিজেদের গড়া মূর্তিতে। পুব দিকে পুবের। পশ্চিম দিকে পশ্চিমের। সকলে দেখছে আর বাহবা দিচ্ছে। পুরস্কার দেয়া হবে তিরিশে চৈত্র—সংক্রান্তিতে—গাজনের পূর্ণ-সমাপ্তি উৎসবে।

যে পাড়ার ভালো ছবি—পুতুল, সেই পাড়ার পটুয়াকে পুরস্কার দেয়া হচ্ছে। অবাক কাণ্ড। না টাকাকড়ি না কাপড়-চোপড় না মানপত্র। কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। পটুয়াকে মাথায় নিয়ে ঘাড়ে বসিয়ে নাচ। সকলের এক সঙ্গে সে কি নাচ! আনন্দে আত্মহারা। এই হচ্ছে শিল্পীর পুরস্কার। তার শিল্প-মাধুর্যের উচ্চ স্বীকৃতি।

প্রথমে একটু কেমন কেমন ঠেকেছে নীলামোতির। এ আবার কেমনতর পুরস্কার! ঘটে যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে এদের।

একটু পরেই—সব দেখেশুনে, সে ভুল ধারণার ঘোরটা কেটে গেছে। না, এইটাই যথার্থ—আসল পুরস্কার। স্বতঃস্ফূর্ত অন্তরের প্রীতি ভালোবাসা পাওয়াটাই তো জীবনে শ্রেষ্ঠ পাওয়া। প্রীতির সায়র সেঁচে সবার ভালোবাসার মধ্যে থেকে একটা অমূল্যরত্ন ভালোবাসাকে নিজের করে পাওয়া।

নীলামোতির মন নেচেছে এদের নাচের সঙ্গী হয়ে। গান গেয়েছে মন। 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে… ।'

শেষরাতে আনন্দধারা সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে নীলামোতির ভেতর থেকে। এতে আনন্দের পর এমন একটা ভয়ংকর-বীভৎস দৃশ্য দেখতে হবে—ভাবা যায় না। আগে জানতে পারলে, আগেই স্থানত্যাগ করে সরে পড়ত যে কোন অজুহাতে।

এরকম একটা ঘটনার কানাঘুষো শুনেছে কিছু, কিন্তু বিশ্বাস করে নি। এ যুগে এরকমও হয়, ধারণার বাইরে। তাই লোকের সত্যিকথাও কৌতুক ভেবে নিয়েছে। হাতে হাতে ফল ফলতে বসেছে নীলামোতির নিজের বুদ্ধির দোষে। দেখতে ইচ্ছে না করলেও, দেখতে হচ্ছে। দেখতে হবেও শেষ অবধি।

ভেবেছে নরমুণ্ড বলতে মাটিরই হবে। যেমন কালীর নিচের বাঁহাতে থাকে। কিন্তু তা নয়, সত্যি সত্যি নরমুণ্ড। মরামানুষের ধড় থেকে কেটে নিয়ে আসা। প্রত্যেক সন্ন্যাসীর হাতে একটা করে। বাঁহাতে কলকে ফুলের ডাল আর খড়ের দড়িতে বেঁধে ঝোলানো নরমুণ্ড। ডান হাতে তলোয়ার।

এরা শ্মশান-সন্ন্যাসী। মণ্ডলদের কিছু দক্ষিণা দিয়ে আর এদের প্রধান পরামানিকের আদেশ নিয়ে এরা শ্মশান-সন্ন্যাসী। মড়ার মাথা নিয়ে গাজনের শেষপ্রহরে এদেরই নরমুণ্ডনৃত্য করার অধিকার।

গ্রামের মড়া শ্মশানে পুঁতে রেখে দেয় এরা, মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসে। শ্মশান জাগিয়ে আসে ক্রিয়াকলাপে। কেউ কেউ মনে মনে জপ করে পোঁতা জায়গার ওপর বসে। ওঁ ভূং ভূতেশ্বরায়…!

মাঝরাতে আকাশের ধ্রুবতারা দেখে এরা উৎসবে আসছে নাচতে

নাচতে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বেশবাস। ঢাকের কাঠি নাচতে ঢাকির আঙুলের যাদুতে।

সন্ন্যাসীদের কোমরের ঘুঙুরের আওয়াজ বেজে চলেছে বাতাসে ঝমর-ঝমর আওয়াজ তুলে। যারা এসে পেঁছয় নি, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে তারা। মুখে, ওঁরা এসে গেছেন, ওঁরা এসে গেছেন। শিবের আসল ছেলেরা এসে গেছেন। ওই ওই ওই।

ওদের নাচের সঙ্গে হাতের নরমুণ্ড নাচছে। এ হাতের তলোয়ার ঘুরছে বন বন করে। গাজনতলায় এসে ওরা গান ধরল—

উলোর ভুঁয়ে ধুলোর বাসা
মটর ভুঁয়ে খই,
কালকেপাতা সেজে এলাম
মড়ার মাথা কই ?

কালোসাজে কালো মুখোশ পরা কালকেপাতা—শিবের প্রধান সন্ন্যাসী। হাতে তলোয়ার-নরমুণ্ড আর কলকে ফুলের ডাল। মাঝে কলকেপাতাকে রেখে, চারদিকে গোল হয়ে বসল সন্ন্যাসীরা। উবু হয়ে বসেছে। ডান-পা সামনে বাঁ-পা পেছনে রেখে। ওই ভাবেই বসে নাচছে। এককার পেছু হটছে, একবার সামনে এগোচ্ছে। যেন বসে বসেই ওরা একটা চলন্ত বৃত্তের দিয়ে ঘুরে চলেছে অনায়াসে-স্বচ্ছন্দে।

তলোয়ার কলকেফুলের ডাল রেখেছে মাটিতে। রেখেছে এক একজনের হাতের নরমুণ্ডও। একটা করে তুলেছে গানের সঙ্গে। হাতে হাতে লুফে নিচ্ছে। প্রথম-দানে মড়ার মাথা সবহাত ফেরত হয়ে এলে, রেখে দিয়ে দ্বিতীয়টির শুরু। তারপরের তারপরের তারপরের।

ওদের গানের কথা কান থেকে কানে কানে পিশাচের উল্লাসে ভেসে বেড়াচ্ছে !—

ও সাতুলে !
এ গাছের পাতা নয়
ও গাছের পাতা।
ছুঁওনা ছুঁওনা দাদা
ভাদরবৌয়ের মাথা

মাঠের মধ্যে বটবৃক্ষ,
বৃক্ষে নেইকো পাতা।
একলা মায়ের পুত্র ম'লে,
মা দাঁড়াই কোথা।
একলা মায়ের পুত্র ম'লে,
ফেলবো গঙ্গার জলে—
এমন সময় কেউ নিল না
গঙ্গা নিলেন কোলে।
বাছার জন্যে আনলে কিনে
শান্তিপুরের ডুরে।
আলনার কাপড়
আলনায় থাকলো
বাছা গেল মরে।
ও সাতুলে।

গানের কথার সঙ্গে এই বীভৎস নাচের কোন মিল আছে কি? গা শিউরে ওঠা দৃশ্য। আকাশ বাতাস মাটি থমথমে। লোকজনের মুখে কোন কথা নেই। কেমন একটা অপার্থিব ভাব ঘুরে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে। গোটা শ্মশানটাই বুঝি উঠে এসেছে এই গাজনতলায়।

শোঁ-শোঁ বাতাসে কত অতৃপ্ত নিশ্বাস বয়ে যাচ্ছে যেন। শরীরটা ভারী হয়ে উঠেছে বড্ড বেশী। এক একটা নরমুণ্ড এক একটা পূর্ণ মানুষের কঙ্কাল হয়ে দাঁড়িয়ে। এক একটা সন্ন্যাসী এক একটা ছায়ামূর্তি। ছায়ামূর্তি ছায়ামূর্তি ছায়ামূর্তি।

দেখাটা এত বাস্তব এত সত্যি কেমন করে হয়ে উঠেছে নীলামোতির চোখে! পলকের দেখার তবু একটা যুক্তি থাকে ভুলচুক হবার। পলকে হারিয়ে যায় মিলিয়ে যায় বলে। কিন্তু এক্ষেত্রে? একই ভাবে দেখছে মুণ্ড থেকে পুরো মানুষের কঙ্কাল। আর সন্ন্যাসী ছায়ামূর্তি।

চোখের সামনে থেকে সরে যাক এদৃশ্য, এদশ্য ভুল—ভাবলেও সরছে কই? ভুল মনে করতে চেষ্টা করলেও, মনে থাকছে কই! মনে হচ্ছে ভুল হলে, এতক্ষণ ধরে দেখা সম্ভব কি? নয় নয়।

তবে একটা জিনিস চিন্তা করার বিষয়। নয়ের মধ্যেও একটা কিছু উঁকি মারছে থেকে থেকে। মাথা তুলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ডুবে ডুবেও ভেসে উঠছে। এটা কি চোখের মায়া, না জেগে জেগে দুঃস্বপ্ন দেখা। না ভেতরের ভয়! না তিনটে মিলে মিশে একটা ছবি আঁকছে সামনে। এর সঙ্গে আঁকার তুলির রং যোগাচ্ছে ছোটবেলার কঙ্কাল-ভূতের কাহিনী শোনা! হবে বা।

হলেও হতে পারে, না হলেও না হতে পারে। একবার এদিকে একবার ওদিকে। দোটানা টানা পোড়েনের অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে নীলামোতি। আচমকা মাথাটা হাল্কা হয়ে উঠেছে। দৃষ্টি স্বচ্ছ-পরিষ্কার। কোন কঙ্কাল নেই, নেই কোন ছায়ামূর্তি আগের যা ছিল, তাই-ই রয়েছে। আছে নরমুণ্ড, আছে গাজনের সন্ন্যাসী।

তবু অস্বস্তি বোধ করেছে নীলামোতি। কতক্ষণে এ বীভৎস রসের নাটকের যবনিকাপাত হবে—কে জানে! চোখ আর দেখতে পারছে না। দেখতে চাইছে না। আর নয় আর নয়।

আকাশের অন্ধকারে টান ধরেছে। নিশিভোরের সময় এগিয়ে আসছে একটু একটু করে।

গাজন শেষে, কালকেপাতাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছে নীলামোতি। দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রকাশ করতে সংকোচ বোধ করেনি কোন। একটা স্বর্গসুন্দর, ধারণার রাজ্যের এমনতর কাণ্ড ঘটাল কেন? ভয়াবহ হয়ে উঠে, লোকের মনে ভয় ধরানোর কি একান্তই প্রয়োজন ছিল?

কালকেপাতাকে জানানোর আগে নিজের ভেতর থেকে নিজের প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছে। নানান উত্তরের ভিড় করেছে মাথার মধ্যে তলকূল পায় নি। কখনো ভেবেছে, পুরনো দিনে অনেক দেশের অনেক মানুষ মানুষ শিকার করতো নাকি। যার ঘরে যত নরমুণ্ড, সে সমাজে তত বড় বীর। এটা আফ্রিকার কোন কোন জায়গার সন্ধানে জেনেছে কেউ কেউ। সেই আদিম ধারার নমুনা কি কুড়মুনের বাতাসে এসেও পৌঁছেছিল কোন অলক্ষুণে সময়ে! তারই

কিছু কিছু নমুনা ঘুরে বেড়াচ্ছে হয়তো গাজনে। তক্ষুণি আগের ভাবনাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে নতুন ভাবনা উপস্থিত হয়েছে আর একটা। যুদ্ধজয়ে জয়ীপক্ষেরা পরাজিত-নিহত হতভাগাদের মুণ্ড নিয়ে খেলায় মত্ত হয়ে পৈশাচিক উল্লাসে—বিজয় উৎসবে আত্মহারা হয়ে উঠতো। সেই স্মৃতি কি গাজনে? তাই বা হয় কি করে! মন মেনে নেয় নি।

তবে কি ভয় আর বীভৎসকে বুকে আঁকড়ে ধরে ভয় দূর করা? না মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করা? না দেহ গলে গেলে, দেহ থাকে তারই কোলে—ইষ্টদেবতার কোলে, দেহ লাগে দেবতার পুজোর ফুল হিসেবে এই ধারণার বশে শোক দুঃখ ভোলার একটা মস্ত পথ মেনে নিয়ে কি?

সমস্তই খুলে বলেছে কালকেপাতাকে নীলামোতি। কালকেপাতাকে এমন কথা কেউ কোনদিন বলে নি বোধ হয়। একটু থতমত খেতে হয়েছে বৈকি প্রথমে। একটু চুপ করে থেকে কিছু একটা ভেবে নিয়েছে। তারপর বলেছে, শিব তো ভূতপ্রেতের রাজা। ভূতপ্রেত নিয়েই বসবাস দিনরাত। তাই এই খেলা। শিবকে সন্তুষ্ট করার খেলা।

নীলামোতির মন সায় দেয় নি এতে। গাজনের গান বেজে উঠছে কেবল মনের কানে। একলা মায়ের পুত্র ম'লে···গঙ্গা নিলেন কোলে···।

শিবের ছবিতে দেখেছে নীলামোতি, জটা বেয়ে মাথা থেকে নেমে আসছে পতিতপাবনী গঙ্গা। দুখিনী মায়ের ছেলে ম'লে, কেই বা শবদাহে এগিয়ে না আসে। গঙ্গার কোলই তখন শেষ সম্বল। শিব গঙ্গা মৃতশিশু তখন মিলেমিশে একাকার। এখানে নেই মৃত্যুভয়, নেই মৃত্যুশোক। মৃত্যুঞ্জয় শিবের গাজনে তাই খেলার ছলে নরমুণ্ডের খেলায় শিবের জটাবাহিনী গঙ্গায় নরমুণ্ডেরই পুষ্পাঞ্জলি দেয় যেন এরা।

নীলামোতির মন বলে উঠেছে, হ্যাঁ, এইটাই সত্যি। এইটাই সত্যি। নীলামোতি যেন কোন অজানা রহস্যলোকের দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করেছে। দেখেছে, বহু দিনের চেনাবস্তু অচেনা হয়ে

পড়ে রয়েছে বিস্মরণের ধুলোয় মলিন হয়ে। আসল রূপ দেখা যাচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে না।

তার সত্যসন্ধানী মন মুছেছে সেই ধুলো। সত্যের পূজারিণী দেখেছে সত্য-সুন্দরের স্নিগ্ধ-শুভ্র আলো। নরমুণ্ডনৃত্যের অর্থ খুঁজে পাওয়ায়, গাজনের গানের মর্মকথা অনুভব করতে পেরে নীলামোতি বুঝি কোন কিছু আবিষ্কার করে ফেলার আনন্দে—সম্মানে মহাখুশি মহাসম্মানী হয়ে উঠেছে।

নীলামোতির মনে হচ্ছে, প্রত্যেককে ডেকে ডেকে তার আনন্দে অংশীদার করে তোলে। তার সম্মানের মুকুট—নিজেরই ভেতরের দেয়া, এক একজনের মাথায় পরিয়ে দিয়ে, মানুষের শান্তির পথ আবিষ্কারের অতীত গৌরবের গরবী করে তোলে।

কি একটা শব্দ হল যেন। হুম না ওম—ঠিক বোঝা গেল না। বুকটার ভেতর ধড়াস করে উঠেছে নীলামোতির, মনে হল আকাশ থেকে বুঝি মর্তে পড়ে গেল ধপাস করে। আর সঙ্গে সঙ্গে কুড়মুনের সমস্ত দৃশ্য অদৃশ্য হয়ে গেল। ওখানকার ভাবনাচিন্তাও হারিয়ে গেল।

নীলামোতির কান মন দৃষ্টি বুদ্ধি আবার ফিরে এসেছে, যেখানে বসে সে। নিতুমার পুজোমণ্ডপের ভেতর।

আশ্চর্য হয়ে বড় বড় চোখে এক দৃষ্টে দেখছে নীলামোতি। নিতুমার বলির খাঁড়ার কোপ পড়ল না মঙ্গলা বাগদিনীর ঘাড়ের ওপর। আলতো ভাবে একটু স্পর্শ করল মাত্র। আস্তে আস্তে ওপরে উঠে আসছে। মাথার ঠিক মধ্যিখানে নয়, পেছন দিকে, চার আঙুল নিচের চুলের গোছা থেকে কটা চুল ওপর মুখো করে বাঁহাতে ধরেছে।

ডানহাতে খাঁড়ায় কাটছে আর মুখে উচ্চারণ করছে, ওঁ ক্লীং ওঁ ক্লীং।

হতভম্ব নীলামোতি কিছুটা মিল খুঁজে পাচেছ যে নিতুমার সঙ্গে অন্য একটা জগতের। সে জগতের ক্রিয়াকলাপ নীলামোতি দেখেছে স্বচক্ষে। মন্ত্রপাঠও শুনেছে স্বকর্ণে। অবিশ্যি এসব গুপ্ত ক্রিয়ায় সুযোগ সবার আসে না সহজে। অনেকের নাকি প্রবেশ. নিষেধ। দেখাশোনা নিষেধ। পবিত্র মনের মানুষ ছাড়া।

নীলামোতির হঠাৎ প্রবেশের ছাড়পত্র কেমন করে মিলল, সেটাই মহাভাগ্যের কথা। অবিশ্যি শাশুড়ির দৌলতেই মিলছে—এটা ধ্রুব সত্য।

বলতেই হবে এটা মস্ত সৌভাগ্য নীলামোতির। বিয়ের পরই শ্বশুর-শাশুড়ির খুব সুনজরে পড়েছে। শাশুড়ি কোনদিন বৌমা বলে নি। নাম ধরেই ডেকেছে। কখনো বা নিজের দেয়া নামে ডেকেছে।—কঙ্কন।

শাশুড়ির অতি আদরের ভাইঝির নাম কঙ্কন। কঙ্কন পৃথিবী ছেড়ে অনেক আগেই চলে গেছে। নীলামোতির বিয়ে হবার অনেক আগে।

বাড়ির অন্য বৌঝিরা কোন অন্যায় করে ফেললে, ভয়েময়ে স্বীকার করতো না। অপরাধ গোপনের প্রবল চেষ্টা তাদের। নীলামোতির কিন্তু সেটা ছিল না। না বুঝে না জেনে কিছু করে ফেললে, নিজে হতেই আগেভাগে শাশুড়িকে জানিয়ে দিয়েছে, অপরাধ স্বীকার করেছে।—ক্ষমা চেয়েছে। আর কখনো জীবনেও এমন হবে না বলে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে।

অন্যের কাছে নির্দয় নামে খ্যাত শাশুড়ি মুখের দিকে অপলকে চেয়ে থেকেছে খানিক। নিজের গাম্ভীর্য বজায় রাখা সম্ভব হয়নি তার। মুখে কাপড় চেপে কাশির ছলে হাসি ঢেকেছে। নিজেকে সামলে নিয়ে মিষ্টি-ভারী গলায় বলেছে—মনে রেখো. চোখকান খুলে কাজকর্ম করা উচিত। ভুল হওয়া ঠিক নয়. মোটেই নয়।

শাশুড়ির একটা মস্ত গুণ সত্যিকথা বলা, সত্যি শুনতে ভালোবাসা। সেই সূত্রেই হয়তো যত স্নেহ সমস্ত ঢেলে দিয়েছে নীলামোতিকে। এতে নীলামোতিকে অনেকের চক্ষুশূল হতে হয়েছে। জা ননদ কেউ আর ঠাট্টাবিদ্রুপ করতে বাকি রাখেনি। নীলামোতি গুণতুক জানে নিশ্চয়। তা না হলে অমন রাশভারী মানুষ হাতের মুঠোয় একেবারে। কেউ কিছু বললে, কানে কথা নেয় না। সবাই নাকি মিথ্যুক। একমাত্র ওঁর কঙ্কনই সত্যবাদী! মরি মরি! দ্বাপর যুগের যুধিষ্ঠির কলিযুগে জন্মেছে মেয়ে হয়ে।

মেজো জা তো ছোট জার গাল টিপে দিয়ে হেসে কুটিকুটি

হয়েছে। সেজো আবার মৃদুস্বরে গান ধরেছে—ম'লে জন্মাবো এবার সত্যিকথার মানুষ হয়ে।

এদের এসবে কোন ভ্রূক্ষেপ করেনি কোনদিন নীলামোতি! কোন আরজি পেশ বা বিরুদ্ধ সমালোচনাও করেনি শাশুড়ির কাছে।

বাবার উপদেশই শিরোধার্য করে শ্বশুরবাড়িতে সুনাম কুড়িয়ে গেছে অনায়াসে। বাবার আদর্শ—মানুষই ভুল করে। ভুল না করলে সংশোধন হবে কি করে! নিজের অন্যায় বুঝতে চেষ্টা করবে। স্বীকার করার সাহস রাখবে ভেতরে। দেখবে, কখনো কোনদিন তোমাকে নিয়ে কেউ অশান্তি পাবে না। তুমিও খুব শান্তি পাবে।

বাবার অমৃতসমান উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে নীলামোতির। জীবনে। বিশেষ করে শ্বশুরবাড়িতে শাশুড়ির কাছে। জ্ঞাতি-কুটুমের কাছে নীলামোতির সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ শাশুড়ি।—ও আমার মা-দুর্গা।

ঠাকুর ঘরে অষ্টধাতুর দুর্গামূর্তি ধ্যান করতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে যায় শাশুড়ি! দুর্গার ধ্যানে একি কি দেখে রোজ! দুর্গার মুখে নীলামোতির মুখ। ভক্তের আকুল ডাকে ভগবান না এসে পারে না। মা-ও থাকতে পারেনি, এসেছে তার ঘরে। আর সত্যিকথা চেপে রেখে তো কোন লাভ হবে না। বড়বৌয়ের পা পড়তেই তো ব্যবসা-বাণিজ্য উথলে পড়া যাক বলে, তাই হয় নি কি?

শাশুড়ির কাছে নীলামোতি দেবী। কিন্তু জায়েদের কাছে? দেবী নয়, দানবী।

হৃষিকেশের আশ্রম থেকে মুক্তেশ্বরানন্দ এসেছে বাড়িতে। শাশুড়ির গুরুদেব। শাশুড়িই আনিয়েছে তার বিপদের কথা জানিয়ে। বিশেষ অনুরোধ করে। একটা বিহিত করতে হবেই। ছোটছেলে শান্তিনাথের জন্য দুর্ভাবনার অন্ত নেই শাশুড়ির। ভয় ধরে, কিছু না করে বসে শেষে।

করে বসার কারণ কি? উত্যক্ত করে মেরেছে ছোটবৌ। ছেলেটা যে কি ভাবে, কিচ্ছু বোঝা যায় না। দিনদিন শুকিয়ে মড়ার কাঠ হয়ে যাচ্ছে। তবু ছোটবৌয়ের চৈতন্য উদয় হচ্ছে না। উগ্র মেজাজ থেকে একচুল নড়বে না। পৃথিবী রসাতলে গেলেও না।

মুখে কেবল এককথা। মাসের মধ্যে বিশদিন যদি ছেলে হৃষিকেশ

গুরুদেবের কাছে পড়ে থাকবে, তবে বিয়ে দেয়া কেন ? পরের মেয়ের জীবন নষ্ট। আবার স্বামীকে একটু ঘরবাসী করার জন্য শাসনেরও উপায়ও নেই।

তিনতলা থেকে দোতলায় নেমে এসেছে শাশুড়ি। মুখেচোখে বিরক্তি। গলার স্বরও তীব্র তীক্ষ্ম।—ছেলেটাকে দিনরাত বকাবকি করে করে মেরে ফেলতে বসেছো। না পারছে বাড়ির লোক তিষ্ঠোতে, না পারছে পাড়ার লোক। লজ্জায় ঘেন্নায় মুখ দেখানো দায়। ছিঃ!

ঝাঁঝিয়ে উঠেছে ছোটবৌ।—যা কাণ্ড করে বসেছেন, মুখ আর দেখাবেন কি করে! সন্ন্যাসী বাতিক পাগলব্যামো চেপে রেখে বিয়ে দিতে ধর্মে বাধেনি ? এত অধর্ম সইবে না। ঠাকুরঘরে গিয়ে নাক টিপে বসে থাকলে বড়সাধিকা আর যোগিনী হওয়া যায় না। যা অন্যায় করেছেন, এর সাজা পেতেই হবে স্বর্গ থেকে পুষ্পকরথ এসে নিয়ে যাবে না কেউ।

নীলামোতি ঠাকুরঘরেরই কাজ করছিল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নের কাজ। ঠাকুরঘরে নীলামোতি ছাড়া কোন বৌয়ের প্রবেশ নিষেধ। যাদের মন পরিষ্কার নয়, তারা কি দেবতার কাজ করবে! চেঁচামেচি শুনে, তরতর করে নেমে এসেছে নীলামোতি, ছোটবৌয়ের হাত ধরে অনুরোধ করেছে চুপ করতে।—গুরুজনকে এভাবে বলতে নেই। দোহাই চুপ কর।

দোহাই, চুপ কর! কেন বল দিকিনি এত দরদ গুরুজনের ওপর ? বিষয় হাতিয়ে নেবে বলে তো খোশামুদে রামপ্রসাদে হয়ে রয়েছো দিনরাত গুরুজনের। বোঝে না কে ? ঘাসে মুখ দিয়ে চলে না কেউ জেনো।

জোর করে চোখের জল চাপা যায় না। আরো উপচে পড়ে। সেই দশা অভিমানী নীলামোতির। শাশুড়ি জড়িয়ে ধরে বলেছে— অসভ্যটা তোমার মর্ম কি বুঝবে কঙ্কন। এখানে না এলেই ভালো করতে।

খেঁকিয়ে উঠেছে ছোটবৌ। ব্যঙ্গের সুরে বলেছে, কি বুঝবে কঙ্কন! অসভ্যকে বাড়িতে খাঁচায় পুরে রেখে যন্ত্রণা দেয়ার কি অধিকার আছে সভ্যদের। একটা ব্যবস্থা করে বিদেয় করে দিলেই তো হয়।

ব্যবস্থাটা যে কি তা ভালোরকমই জানে শাশুড়ি, জানে নীলামোতিও। ছোটবৌ তার হকের ধন এখুনি বুঝেপড়ে নিতে চায়। শাশুড়ির জীবদ্দশায়। শ্বশুর অনেক ভেবেচিন্তে ছেলেদের নামে কিছু করে যায় নি। সমস্ত শাশুড়ির নামে। মায় লেদড্রিল মেশিনের ব্যবসাটাও।

শ্বশুরের কেমন ধারণা জন্মেছিল, ছেলেদের গতিপ্রকৃতি খুব সুবিধার নয়। মানুষের খোলসে কি লুকিয়ে আছে বাইরে থেকে বোঝা ভার। নিষ্ঠুর মন বসবাস করলে করতেও পারে তো।

শাশুড়ি অনুরোধ করেছে, করুক, যার যার বখরা দিয়ে দেয়াই ভালো। কারো যেন না দয়ার ওপর ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে হয় তাকে। সিঁথির সিঁদুর আর বাঁহাতের লোহা বজায় রেখে যেন চলে যেতে পারে শাশুড়ি। এর চেয়ে মেয়েদের আর কি বড় চাওয়া আছে! আর তা ছাড়া মেজো সেজোর নিজেদের দিকে টানটা বেশী বলে বড় ছোট তো অন্যরকম, মা বলতে অজ্ঞান।

মৃত্যু কারো জন্য অপেক্ষা করে না। শাশুড়ির লোহা সিঁদুর খুইয়ে চলে গেছে, শ্বশুর যা মনস্থ করেছিল, তাই-ই করে গেছে। অর্থাৎ স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি শাশুড়ির একার। শাশুড়ি যাকে যেমন বুঝবে, তাকে তেমন দেবে। সব কিছু ইচ্ছের ওপর নির্ভর। যা খুশি, যাকে দিতে পারে।

শাশুড়ি সম্পত্তি আর দায়দায়িত্ব নিতে চায়নি কোনদিন। কিন্তু নিতে হয়েছে নিয়তির ফেরে পড়ে। শাশুড়ি চেয়েছে শ্বশুর বেঁচে থাকুক। ঐশ্বর্যের দরকার নেই। কিন্তু অবাক হয়ে ভেবেছে কতবার ছোটবৌয়ের মন কেমনতর! কি ধাতুতে গড়েছে ঠাকুর ওকে, ঠাকুরই জানে স্বামী মরুক বাঁচুক দুঃখ নেই। সম্পত্তির অংশটা বুঝে নেয়া, লিখিয়ে পড়িয়ে নেয়াটাই ওর কাছে জীবনের বড় ধর্ম।

শাশুড়িকে বলে ছোটবৌ, ছেলেকে সন্ন্যাসী করে রেখে দিন না মা, কিছু এসে যায় না। বাঁচে সে। এরকম স্বামীর হাত থেকে মুক্তি চায় সে। মুক্তি, মুক্তি।

মুক্তি চায় শাশুড়িও। সংসারের সাধ পূর্ণ হয়েছে খুব তারও। শ্বশুর চলে যেতে, কত আশায় বুক বেঁধেছে। ছেলেরা বৌয়েরা

সোনার সংসার গড়ে তুলবে। তা আর হল কই। মানুষের সব ইচ্ছেই কি পূর্ণ হয়? হবার নয় বুঝি।

ছোটবৌকে ফাঁকি দিলে, ব্যবস্থা করে না দিলে নরকে যেতে হবে, মহাপাতকীর ফল পেতে হবে। অন্যায় করলে ধর্ম সইবে না। সইবে না সইবে না।

দিনরাত ছোটবৌয়ের শাপমন্যি শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে শাশুড়ির। সহ্যের শেষ সীমায় এসে হাজির হয়েছে। একথাটা ভাবতে পারলে কি করে ছোটবৌ। শাশুড়ি বেঁচে থাকতে রাস্তায় বসবে।

গুরুদেবের সামনেই লেখাপড়া হয়ে গেছে ছোটবৌয়ের অংশ। ছোটছেলের অংশটা বৌয়ের নামেই দেয়া হয়েছে। ছেলের মত নিয়েই। এখন ছেলেকে গুরুদেবের হাতে তুলে দিয়ে নিষ্কৃতি দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত। তাই গুরুদেব মুক্তেশ্বরানন্দকে হৃষিকেশ থেকে আনিয়েছেন। বিষয় আশয় লেখাপড়া সাঙ্গ। এখন শান্তিনাথের সন্ন্যাস দেয়া বাকি।

ছেলের রকম সকমে মা-ই নিজে থেকে বিয়ে দিতে চায়নি। পরের মেয়ের জীবন। শেষ কথা শেষ করতে দেয়নি গুরুদেব। মুচকি হেসে বলেছে, সংসার জীবনে ওর একটু আঘাত না এলে, সংসারীদের বেশীর ভাগের লোকেরই প্রকৃত চাওয়াটা কি, না বুঝতে পারলে, সন্ন্যাস নেবার পরও একটা মিথ্যে আশায়—একটা না জানা স্বাদের মোহে সন্ন্যাসজীবন থেকে সরে আসতে পারে। আসে অনেকে।

শাশুড়ি কিন্তু কোন পাত্রীপক্ষকে একথা গোপন করেনি। শাশুড়ির কথা শুনে হতভম্ব হয়ে যেত লোকে। কুমারী হয়ে থাক, তবু ভালো। এ তো মানুষের সঙ্গে বিয়ে নয়, বিষয়ের সঙ্গে। দরকার নেই, দরকার নেই।

অনেকে শাশুড়িকে মাথা খারাপ বলতেও কসুর করেনি। এসব কথা বললে বিয়ে হয়ে হয়ে কখনো? কখনো না। নিজের ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ নিজেই ভেঙে দিচ্ছে গোড়ায়। গুরুদেবের কথা চেপে যেতে হবে। একদম গোপন রাখতে হবে।

বান্ধবীদের উপদেশ মেনে নেয়নি শাশুড়ি। মিথ্যে কথা বলে

লোককে প্রবঞ্চনা করতে পারবে না কোনমতেই। বিয়ে হোক আর না হোক সন্ন্যাসী হোক আর না হোক।

সব শুনেই তো রাজী হয়েছে একজন। ছোটবৌয়ের বাবা। মেয়েকে জানাতে বলেছে শাশুড়ি, শেষে না দোষারোপ করে তার ওপর। মেয়ের মাকে বলেছে নিজে। মেয়ে দেখতে গিয়ে। মেয়ের সমুখে।

মা হেসে গড়িয়ে পড়েছে। বলেছে, ওই বয়েসে ওরকম একটা ধর্ম ধর্ম বাতিক হয় বহু ছেলের। সেটা অভিভাবকদের সতর্ক করে দেয়ার জন্য। তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দাও।

শান্তিনাথের বয়েসের ব্যাধি নয় এটা। বা অভিনয়ও নয়। ছোট-বেলা থেকেই ও একটু অন্যরকমের!

রাখুন দিকিনি! বলেছে ছোটবৌয়ের মা—আমার ওনারও এই রকম ছিল। এখন তো ঘোর সংসারী। গুরুদেব, ধর্মকর্ম শিকেয় উঠেছে এখন। নামগন্ধ নেই। আর তাছাড়া আপনার গুরুদেবই তো ইঙ্গিত দিয়ে দিয়েছেন। সন্ন্যাস নেয়ার পর অনেকে ফিরে আসে সংসারে। আপনি বড্ড সরল দেখছি। এসব বোঝেন না। এই ধরনের ছেলেরাই বেশি সংসারী হয়ে ওঠে।

শাশুড়ির এইটাই বড় দুঃখ। আজ ছোটবৌ আর তার মা শাশুড়ির নিন্দেয় পঞ্চমুখ। মানুষের এইটাই কি ধর্ম? নিজের কথা —আগের কথা ভুলে যেয়ে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানো! হবে বা।

গুরুদেব বাড়িতে সন্ন্যাস দিতে চায় নি। হৃষিকেশে দেবে। গুরুদেবের সঙ্গে শান্তিনাথকে আর নীলামোতিকে নিয়ে ছোটবৌ হৃষিকেশে যাত্রার দিনেও কাছে এসে বিদায় জানায় নি, নিজের মা-ভাইকে নিয়ে কি হাসাহাসি! চড়াগলায় গান ধরে দিয়েছে সকলকে শোনানোর জন্য।—সখি, চাইনে সন্ন্যাসিনী হতে কৃষ্ণ পেতে। অঙ্গে ভস্ম মাখার আগে, ভুলো না সখি বিষ দিতে।

রঙ্গ-তামাশারও একটা সময় আছে, একটা সীমা আছে। মতলবি নির্লজ্জ-বেহায়া নির্দয় বৌ। প্রতিবাদ করতেও ঘেন্না। সেজোবৌ ছোটবৌয়ের দলের লোক। হলে কি হবে, ও-ও এসেছে সদর দরজা অবধি বিদায় জানাতে। শান্তিনাথের দিকে তাকাতে পারে নি।

ভেতরটা যে ওর ফেটে যাচ্ছে, বেশ বুঝতে পারা গেছে বাঁধভাঙা চোখের জলে।

বাড়ির বাইরে বেরিয়ে পূবমুখো হয়ে দাঁড়িছে শাশুড়ি। করজোড়ে মাথা নিচু করে প্রণাম জানিয়েছে পৃথিবীর আত্মা সূর্যদেবকে। প্রার্থনা করেছে করুণ সুরে। ঠাকুর জগতের মঙ্গল কর। শুভবুদ্ধি দাও! বিবেক দাও সকলের। অবুঝপনা থেকে মুক্ত কর প্রত্যেককে। প্রত্যেককে প্রত্যেককে।

হৃষিকেশে এসে অন্য জগতে মন চলে গেছে নীলামোতির। গঙ্গার পশ্চিমতীরে হৃষিকেশ। তিনদিক পাহাড়ঘেরা। মনোরম পরিবেশ। গঙ্গার ধারে কাঠের কুঠিয়ার সাধুসন্তরা নিজেদের তপস্যায় মগ্ন। শুধু কি নিজেদের? না, না। তা হবে কেন?···জগদ্হিতায় চ। পৃথিবীর হিতের জন্য। এদের হিতকামনা বাতাসে বয়ে বয়ে মানুষের কানে অগোচরেই পেঁাছে যায় বুঝি। হঠাৎ মানুষের অশান্ত মন শান্ত হয়ে ওঠে এক অজানা আনন্দে।

দুর্গতি দুর্ভোগের অথৈ কালোজলে অন্ধ হয়ে ডুবতে ডুবতে ভেসে ওঠার পথ খুঁজে পাও যেন দৈব আশীর্বাদে। কুঠিয়ায় কুঠিয়ায় ঘুরে হিতাঙক্ষী সাধুদের প্রণাম জানিয়েছে নীলামোতি শাশুড়ির সঙ্গী হিসেবে। কোন্ অচিন দেশের পরমতৃপ্তি উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে মনেপ্রাণে, কে—কে জানে!

তবে গঙ্গার পাড়ে বসে বসে গঙ্গাবন্দনা শুনতে শুনতে—'জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা'—মনে হয়েছে নিশ্চয় কেউ না কেউ আছে। যে বুদ্ধির ধরাছোঁয়ার বাইরে। অথচ বুদ্ধির ভেতরেই সেই শক্তি অহর্নিশি খেলা করে বেড়াচ্ছে।

দৃষ্টির বাইরে, অথচ দৃষ্টির প্রাণ সে। জীবন মন দেহ নয় সে, কিন্তু জীবন-মন-দেহে মিলেমিশে এক হয়ে রয়েছে। গুরুদেব মুক্তেশ্বরানন্দের এ ধরনের জগৎপিতার ব্যাখ্যায় নীলামোতির মাথা ঝিম ঝিম করে উঠেছে। বলেছে নীলামোতি, ক্ষমা করবেন স্বামীজি! এসব থাক। বরং একটা ভজন করুন।

ভজন করেছে গুরুদেব, নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ, লছমী নারায়ণ···।

ভিড় জমে গেছে গঙ্গার ঘাটে। ভিড়ের নানা গলার নারীপুরুষেরা

গুরুদেবের গলায় গলা মিলিয়ে গাইছে আর হাততালি দিচ্ছে। লছমী-নারায়ণের রাজ্যে মন ঘুরে বেড়াচ্ছে সকলের।

হৃষিকেশ নাকি লছমী-নারায়ণেরই রাজ্য। পুরাণে তাই বলে। রৈভ ঋষির সাধনায় নারায়ণের আবির্ভাব এখানে। ঋষির যুগ কবে চলে গেছে। স্মৃতির স্রোত বয়ে চলেছে পুণ্যার্থীর পুণ্যকর্মের মধ্যে দিয়ে।

আটবছর বয়েস থেকে শাশুড়ির সঙ্গে আসতে শুরু করেছে শান্তিনাথ হৃষিকেশে। ওইবয়েসেই মুক্তেশ্বরানন্দকে ধরে দীক্ষা দিইয়েছে শাশুড়ি। এরপর কতবার আসা যাওয়া হয়ে গেছে, তার লেখাজোখা নেই কোন। আসা যাওয়ার মাহেন্দ্রক্ষণ বুঝে বুঝে শান্তিনাথকে তৈরি করেছে গুরুদেব। বেদপাঠ থেকে শুরু করিয়ে সাধক মনের গড়নে গড়ে তুলেছে। ব্যবহারে বিনয়ী বৈষ্ণব, সংযমে শৈব, শান্তি সঞ্চয়ে শাক্ত মনের তেজে সূর্যসাধক সৌর আর সৎকাজে সিদ্ধিলাভের প্রবল ইচ্ছের সাধনায় গণপতি উপাসক গাণপত্য। সব মিলিয়েই তো তন্ত্রসাধনা। সবকটি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করাটাই তো প্রকৃত তান্ত্রিক হওয়া।

সন্ন্যাস দেয়ার আগে গুরুদেবকে বলেছে শাশুড়ি, শান্তিনাথ নিজের ছেলে বলে বলছি না। উপযুক্ত হয়েছে কিনা, ভালো করে যাচাই বাছাই করুন। আপনার নাম ডুবুক ওর জন্যে, এটা আমি চাই না। আপনারা তো আপন ভোলা! পরীক্ষা করেছেন বলছেন, আবারো করুন। ফাঁকফাঁকির মধ্যে দিয়ে লক্ষ্য এড়িয়েও তো অনেকে পেরিয়ে যায়।

একদৃষ্টিতে চেয়ে থেকেছে গুরুদেব। মুখখানা অসম্ভব রকমের গম্ভীর হয়ে উঠেছে। আচমকা আশ্রমঘরের আবহাওয়া পাল্টে গেছে। ভীষণ থমথমে। গুরুদেবের হাসিটা অদ্ভুত লেগেছে। গলার স্বর কেমন কেমন। বলেছে শাশুড়িকে, তোর মনে সংশয় তাই না?

বুকটা কেঁপে উঠেছে নীলামোতির।

নীলামোতির একার নয় শুধু শাশুড়িরও। নীলামোতির ভেতর কেঁপেছে, বাইরে থেকে অত বোঝা যায় নি। কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় নি দেহের কোন অঙ্গে। কিন্তু প্রকাশ পেয়েছে শাশুড়ির। সারা শরীরই থরথর করে উঠেছে। আসন থেকে টলে পড়ে আর কি! ভয়।

মহাভয় ! কে জানে একটা কিছু বিপত্তি না ঘটে যায় শেষে। তার হঠকারিতার জন্য, মুখের লাগাম ঠিকমতো টেনে না রাখায় যা হবার তা হয়ে গেল। মুখ ফসকে যে কি বেরিয়ে গেল, শাশুড়ি নিজেই আতঙ্কগ্রস্ত।

সব চেয়ে ধাক্কা খেয়েছে মুক্তেশ্বরানন্দের ভর্ৎসনায়। ঘরের ছাদ ফুঁড়ে যেন বাজ পড়েছে একেবারে সামনে। সত্যি পড়লে ভালো হত তবু, কর্মফলের শাস্তি পাওয়া যেত সঙ্গে সঙ্গে। মৃত্যুতেও শান্তি ছিল। কিন্তু এ যে বিষম জ্বালা। আপসোস আর অনুতাপ কুরে কুরে খাচ্ছে ভেতর। শান্তিনাথের এগোবার পথে কি বুনোগাছের কাঁটা বিছিয়ে দিল শাশুড়ি ! কি দুর্মতি তার ! সমস্ত কাজ না পণ্ড হয়ে যায় !

সংসারে ন্যায়বিচারের দণ্ড ধরে থেকেছে বরাবর। কড়া শাসনের ভয়ে ঊনিশ-বিশ হবার উপায় ছিল না কারো। ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে নিস্তার পাবে না কেউ। গুরুজন হোক আপনজন। সকল ব্যাপারেই সদাসর্বদাই সজাগ-সচেতন। মন যেন নিখুঁত দাঁড়িপাল্লায় নিক্তির ওজন হয়েই রয়েছে। কাজে কাজেই এই মানুষের সংশয়মুক্ত না হওয়াই স্বাভাবিক। একবাক্যে কোন কিছু বিশ্বাস করা কোন কিছু মেনে নেয়া। সে নিজের অতি স্নেহের পাত্র সন্তান হলেও।

কমজোরি মনের নিরুপায় প্রকৃতি ক্ষেত্রবিশেষে নিষ্প্রাণ নিঝ্‌ঝুম পড়ে। লোকটা মরেছে কি আছে, বোঝা মুশকিল। কিন্তু বেপরোয়া মনের প্রকৃতি ? মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে স্থান কাল বিশেষ-লোক ভুলে গিয়ে।

শাশুড়ির হয়েছে তাই। শান্তিনাথকে সন্ন্যাস দিক মুক্তেশ্বরানন্দ, কিন্তু নেয়ার ক্ষমতা ঠিক অর্জন করেছে কিনা, পরীক্ষা করে নিক। তার মানে এযে, মুক্তেশ্বরানন্দের শেখানোর ওপর আস্থা রাখতে পারছে না শাশুড়ি।

শাশুড়ি জানে মুক্তেশ্বরানন্দ অতি জ্ঞানী অতি বুঝদার। তার দৃষ্টি এড়িয়ে তার বোধের আসর পেরিয়ে যাবার উপায় নেই; যত বড়ই সূক্ষ্ম জিনিস হোক না। মুক্তেশ্বরানন্দ মন বোঝার রাজা, মানুষের মন গড়ার মহারাজা।

এত সব দেখেশুনেও শান্তিনাথকে পরীক্ষা করে দেখে নিতে

বলেছে। যেমন বলা, তেমনি তার উত্তরও পেয়েছে মোক্ষম।—তোর মনে সংশয় তাই না। চমকে উঠেছে শাশুড়ি। কাঁপুনি ধরেছে ভেতরে। মনে হয়েছে ঘরখানাও কাঁপতে কাঁপতে নিচের দিকে নামছে। পাতালে প্রবেশ করবে বুঝি। নিজের সরম-সম্ভ্রম আর বিবেক-বুদ্ধির হেনস্থায় পড়ে হাঁপিয়ে উঠেছে নিজেই। মন সৃষ্টি করেছে আত্মরক্ষার তাগিদে আত্মগোপনের অস্বস্তিকর পরিবেশ।

ভুল বুঝতে পেরেও, ভুলের ফাঁদে পড়ে ছটফট করেছে। গুরুদেবের গলার স্বর ঘরের আবহাওয়া গম্ভীর, মুখে অদ্ভুত হাসি—সবই নিজের মনগড়া। আসল ঘা খেয়েছে শাশুড়ি নিজের প্রকৃতিকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পেয়ে। মুক্তেশ্বরানন্দের 'সংশয়' কথার মধ্যে।

গুরুদেবের শাসনের অগ্নিবাণে অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা পেয়েছে শাশুড়ি। যম-যাতনা যাকে বলে। দুটি করুণ চোখ আর শুকনো বিমর্ষ মুখই তার জাজ্বল্য প্রমাণ।

শাশুড়ির মুখ চোখের ভাব একটু একটু ক'রে বদলাচ্ছে। গ্রহণের সূর্য রাহুগ্রাস থেকে মুক্তি পাচ্ছে বুঝি ধীরে ধীরে। সন্ন্যাসব্রতের অনুষ্ঠান চলেছে ঘরে। উত্তরমুখো হয়ে লাল কম্বলের আসনে বসে মুক্তেশ্বরানন্দ। পূবমুখো হয়ে বসে শান্তিনাথ। ওই রঙের আসনেই। কাঠের কুণ্ডু থেকে কাঠের হাতায় ঘি তুলে দিচ্ছে মুক্তেশ্বরানন্দ শান্তিনাথের হাতে। মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে আহুতি দিচ্ছে শান্তিনাথ হোমের আগুনে। মাটির বেদি থেকে আগুনের লকলকে শিখায় রঙ ধরেছে লাল, নীল, সাদা, সোনালী, ধোঁয়াটে।···

ক্লীং ক্লীং ক্লীং—উচ্চারণের শেষে শান্তিনাথের মাথায় পেছনে এসে পুজো করা ধারালো লোহার পাত দিয়ে অতি সন্তর্পণে শিখা কেটে নিয়েছে মুক্তেশ্বরানন্দ। শান্তিনাথের হাতে দিয়েছে আহুতি দিতে।

···শিখাকে প্রণাম জানিয়ে আহুতি দিচ্ছে শান্তিনাথ। পূর্ণাহুতির মন্ত্রপাঠ করেছে মুক্তেশ্বরানন্দ তার উদাত্ত দেবকণ্ঠে। গন্ধর্বলোকের প্রার্থনা আকুতির সুরে। নিজের যা কিছু আছে, সর্বস্ব অর্পণ করছি দেবলোকের ঊর্ধ্বে ব্রহ্মালোকে ব্রহ্মে। অগ্নিদেবতার—

যজ্ঞাগ্নির মধ্যে দিয়ে। প্রাণবুদ্ধি দেহ—দেহের প্রতিটি অঙ্গ দিয়ে যে কাজকর্ম করেছি আজ অবধি—সমস্তই সমর্পণ করছি। সমর্পণ করছি—সমর্পণ করছি।

শান্তিনাথ আহুতি দিচ্ছে নিজের সংস্কার। নিজের গণ্ডীর বাঁধন ভেঙে সকলের মঙ্গল হয়ে ওঠার জন্য। মিথ্যে গর্ব অহঙ্কার আত্মঅভিমান আর অন্যায় দুষ্কর্ম পবিত্র আগুনের স্পর্শে হয়ে উঠুক মহাপুণ্যব্রত।

অতীতের হোক পরিবর্তন। নতুন জন্ম হোক নতুন প্রাণের। যে প্রাণের সূক্ষ্ম ছোঁয়ায় হয়ে উঠবে অন্য প্রাণ মরণজয়ী জ্ঞানময় মঙ্গলময়। —ওঁ ইতঃপূর্ব প্রাণবুদ্ধিদেহ···মাং নদীয়ঞ্চ সকলং শ্রীমদ্‌ব্রহ্মাগৌ সমর্পতে···।

নীলামোতির মন এক বিচিত্র ধাতুতে গড়া। আশ্চর্য প্রকৃতি। প্রকৃতি পাল্টানোর জন্য কত কাণ্ড। মন ঘোরানোর নানা রকম অভ্যেস শেখানো। যোগের আসন ধ্যান-ধারণা। সাধক-জ্ঞানীদের বই পড়ানো, বইয়ের উপদেশ মানানো। কোনটায় মন বসে কে বলতে পারে! সব রকমে থাকলে একটা না একটা ধরে যেতে পারে। তাই গান-বাজনা আর নাচেরও ইলেম নিতে হয়েছে নীলামোতিকে।

কোন বিদ্যেয় অরুচি নেই নীলামোতির। সব বিদ্যে শিখেও শুধু শেখা নয়—ভালোভাবে শেখা, নিজস্ব প্রকৃতি বদলাতে পারে নি। সব প্রকৃতিরই মানুষ যেন ও। অপরের সুখ ওরই সুখ। আনন্দে আত্ম-হারা দিশেহারা। অন্যের দুঃখ শোকে এমন কাতর যে, দিনরাত কেঁদে সারা। আহার নিদ্রা ত্যাগ। বোঝানো সান্ত্বনা—সব বৃথা। শোক দুঃখের মানুষটি স্থির হ'লে তবেই ও স্থির।

এ হেন নীলামোতির শান্তিনাথের সন্ন্যাস-দীক্ষার সঙ্গে নিজেকে একাত্মা করে ফেলা কোন অদ্ভুত ব্যাপার নয়। বরং নীলামোতির পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। মুক্তেশ্বরানন্দের ক্রিয়াকলাপে এত তন্ময় যে, শান্তিনাথের শিখা কাটার সময় নিজের পেছনের চুল খানিকটা

কেটে নেয়া হ'ল যেন। শান্তিনাথের আহুতি দেখার সময় নিলা-মোতিও যেন আহুতি দিয়েছে হোমের আগুনে। মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ও মনে উচ্চারণ ক'রেছে পূর্ণাহুতির মন্ত্র।

মন্ত্রের অর্থে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে। নিজেও ডুবে গেছে অজানা অফুরন্ত আনন্দের সাগরে। নীলামোতি পবিত্র নীলামোতি জ্ঞান নীলামোতি মঙ্গল নীলামোতি মরণজয়ী সত্য। আগের জীবনের পাপপুণ্য কামনা-বাসনা ধুয়েমুছে নিয়ে শুদ্ধ দেহে নীলামোতির নতুন প্রাণের জন্ম হ'ল বুঝি হৃষিকেশের আশ্রম-ঘরে।

শ্রদ্ধার পবিত্র নদীতে নির্মল শুদ্ধ চিত্তের জলে বুঝি চান ক'রে উঠেছে নীলামোতি সদ্য। মায়াপুরী দেহে ভেতর দেখছে অপূর্ব স্নিগ্ধ আলোর ছটা। আলোর ছটা। কত না মণিরত্নের কত রকমের জেল্লা। একসঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে আবার যে যার রূপে ফিরে আসছে বাইরের হোমের আগুনের আভা কি ভেতরের গোপনে হৃদয়ের—আলোর রাজ্যের দরজা খুলে দেয়।

ওঁ ক্লীং ওঁ ক্লীং ওঁ ক্লীং ওঁ ক্লীং···।

মন্ত্রটা বড্ড জোরে বলছে? পর পর বলেই চলেছে যে। মুক্তেশ্বরানন্দের কণ্ঠস্বর নয় তো এ। কার, কার? নারী কণ্ঠের না! হ্যাঁ, তাই তাই!

ফিরে এসেছে নীলামোতীর মন নিতুমার পুজোমণ্ডপে।

অতীতের সুখশান্তির ভাবে বিভোর ভাবটা কেটছে। অতীত দেখার মানুষ এখন বাস্তবে মাটিতে বসে বসে দেখছে ঘটনার পর ঘটনা।

মঙ্গলা বাগদিনীর হাতে খাঁড়ায় কাটা মাথার চুল রয়েছে। নিতুমাই কেটে দিয়েছে। এখন মন্ত্র বলার সঙ্গে সঙেগ অন্যদেরও কেটে কেটে হাতে দিচ্ছে। হাতে দেয়া শেষ হয়েছে এবার।

চোখের লাল ফালিটা খুলে দিচ্ছে মঙ্গলার।···অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্নো জীবাত্মা তে নিরন্তর। এতদিন জীবাত্মা সংসারের অন্ধ-অজ্ঞানে ছিল, আজ তার মুক্তি। নতুন দৃষ্টিতে নতুন জীবন দেখার জন্য বাঁধন খুলে দেয়া হল।

মন্ত্রপাঠ আর এক এক করে চোখের আবরণ উন্মোচন সাঙ্গ হ'ল নিতুমার।

নিজের আসনে এসে বসেছে নিতুমা।

এতক্ষণে আগের হোমের আগুন নিভে গেছে। নতুন করে, এবারে বেলকাঠে হোমের আগুন জেবলেছে বিজয়বালা। প্রত্যেককে আদেশ নিতুমা আহুতি দিতে। এখানে মন্ত্রের বা ক্রিয়াকলাপের কোন হেরফের নেই। হুবহু এক। শান্তিনাথের শিখা হোমের পুরো মন্ত্র স্পষ্ট বিশুদ্ধ উচ্চারণে পাঠ করছে নিতুমা মুক্তেশ্বরানন্দেরই মতো। আশ্চর্য!

হাতের চুল হোমের আগুনে দাউ দাউ করে জবলে উঠছে, আর সেই সঙ্গে এক একজনের মুখে পরম তৃপ্তির আমেজ ফুটে উঠছে, এইটাই যেন ওরা চেয়েছিল। এই দিনটির জন্য কত না অধীর উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করেছে দিনের পর দিন। এই মুহূর্তটির জন্য কত না ব্যাকুল প্রার্থনা জানিয়েছে ওদের মনোমতো ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে।

আজ ওরা সফল ওরা সার্থক। ভাবার সঙ্গে সঙ্গে অবাক হয়ে শুনছে নীলামোতি নিতুমার কণ্ঠস্বর। মধুর মোলায়েম। বলছে নিতুমা দু'চোখের উজ্জবল দৃষ্টি চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে। প্রত্যেকের মধ্যে দু'টো করে ভাব আছে। দেব আর দানব। দানবভাবের মুক্তিতেই দেবভাব জেগে ওঠে। তোমরা আজ দেবভাবে দেবদাসী। সন্ন্যাসিনী দেয়াসিনী। মানুষের দুঃসময়ের শান্তি!

গ্রামের মেয়ে নিতুমা। নিতুমার মুখ দিয়ে এসব কথা যে শুনতে পাবে নীলামোতি ধারণাও করতে পারে নি। সত্যি সত্যিই নিতুমা অনেক বড়। অনেক বড় সাধক। কাউকে দেখেশুনে নিজের ছবি এঁকে নেয়া ঠিক নয়। না বোঝা ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ ক'রে, যা তা ভাবা উচিত নয়। ধৈর্য ধরতে হয়। স্থির বুদ্ধিতে চিন্তা করলে, সত্যি এসে হাজির হয় শান্তির মূর্তিতে, আনন্দের মূর্তিতে।

নিজেকে অনেক ছোট মনে হচ্ছে নীলামোতির। নতুন দেয়াসিনীরা প্রত্যেকে প্রণাম করছে নিতুমাকে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে। মাথায় হাত রেখে হাসিমুখে আশীর্বাদ করছে নিতুমা। পবিত্র মনোরম দৃশ্য। মনহারানো পরিবেশ। শোনা যায় অনেক সৎ মনের কাছে মন হারিয়ে গেলে, অনেক মন মিলেমিশে এক হয়ে গিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসে নিজের জায়গায়। মুক্তেশ্বরানন্দ বলেছিল একবার, সামান্য আমিকে হারিয়ে ফেললে তবেই না অনেক আমিকে পাওয়া যায়।

নিজেকে হারাতে পারছে কই নীলামোতি! তার শিক্ষার গণ্ডী থেকে আভিজাত্যের গণ্ডী থেকে, রূপের গণ্ডী থেকে একচুল কি বেরোতে পেরেছে? পারে নি। ঘুরেছে অনেক দেখেছে অনেক শুনেছে অনেক। তবুও আসেনি বিনয়, হয় নি সরল সহজ। উঁচু স্তরের মানুষ হিসেবে গা ঘিনঘিনে স্বভাব যায় নি তো। চল্লিশেও রঙের জেল্লায় ভাঁটার টান ধরে নি—এই গরমে সবাই কুৎসিত তার কাছে এখনো। কারো হাতে হাত ঠেকে গেলে, নিজের হাত পরিষ্কার জলে ধুয়ে না ফেলা পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

মন চাইছে সকলের প্রণাম দেখে উঠে যায় নিতুমার কাছে। পায়ে মাথা রেখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। কিন্তু উঠতে পারছে কই!

নিচুমুখ উঁচু করে তুলেছে নীলামোতি। লজ্জায় মাথাকাটা যাকে বলে। একেবারে নিতুমার চোখে চোখ। তার দিকেই চেয়েছিল। মুখের দিকে ওই চাউনির অর্থ ভালোরকম জানে নীলামোতি। চেয়ে চেয়ে মানুষের ভেতরের লেখাজোখা পড়ে নির্ভুলভাবে। লজ্জার কারণটা আরো বেশী করে ওই জন্য।

নীলামোতির একটা কথা মনে হচ্ছে কেবল। মঙ্গলাবাগদিনীদের দেয়াসিনীদীক্ষার পর থেকে। নীলামোতি সমুদ্রে ভেলা ভাসিয়ে ভেসে ভেসে বেড়িয়েছে কত। কত হাবুডুবু খেয়েছে। বাঁচবার তাগিদে খুঁজেছে জাহাজ। নিরাপদ জাহাজ। যে জাহাজে চড়ে নির্বিঘ্নে-নিশ্চিন্তে যেতে পারে নিজের লক্ষ্যপথে।

চাইলেই কি সবসময় সবকিছু পাওয়া যায়? সবাই পায় না ঠিক। তবে ভাগ্যগুণে নাকি কেউ কেউ পেয়েও যায়। নীলামোতি আবার ভাগ্যটাগ্য মানে না। তার ভাগ্যফল এটাও মেলেনি! ছোটবেলা থেকে অনেক জ্যোতিষীর অনেক ভবিষ্যদ্বাণী শুনেছে। শুনে শুনে কান ঝালাপালা। সাক্ষাৎ দেবী, দেবীঅংশ যোগিনী যোগভ্রষ্টা সম্রাজ্ঞী হবে। অনেকের সম্মান শ্রদ্ধা পাবে। মা—মা হবে অনেকের।

হ্যাঁ, মা হবে। একটারও হ'ল না—অনেকের! অবিশ্বাসের ডালি মাথায় নিয়েই তো অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছে নীলামোতি। ভেলা ধরে ভেসে উঠেছে আবার ডুবছে। এইভাবেই অন্ধকারে

আলোর রেখা বিদ্যুৎ চমকের মতো চমকাতে দেখছে। অনেক—অনেক দূর থেকে একখানা জাহাজ আসছে। খুব দ্রুতগামি।

সরু আলো বড় হয়ে ফুটে উঠেছে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে বেশ বড়সড় জাহাজ। দেখতেও সুন্দর। যাক, বাঁচা গেছে। এই জাহাজে আশ্রয় মিয়ে নিজের পথ পেয়ে যাবে নীলামোতি। আর ভাবনা চিন্তা নেই কোন।

জাহাজ এগিয়ে আসছে তারই দিকে। তাকে তুলে নিতে। কিন্তু একি দেখছে নীলামোতি! দেখছে আগুন! খাণ্ডবদাহনের আগুন। আগুনের এমন রোষ এমন রুদ্রমূর্তি চোখে পড়ে নি এর আগে।

লকলক করে আগুনের শিখা উঠছে ওপর দিকে। মৃত্যুযন্ত্রণার কি আর্তস্বর অসহায় মৃত্যুপথযাত্রীদের। নীলামোতি মরুক দুঃখ নেই। মরবার জন্যই জন্মেছে সে। বাঁচুক ওরা বাঁচুক। কোথায় কোন্ দেবতা আছে, জানে না নীলামোতি। দেবতার কোন ক্ষমতা আছে কিনা, তাও জানে না। তবু প্রার্থনা করছে, সত্যি সত্যি যদি কেউ কোথাও থেকে থাকো। উদ্ধার করার বাঁচানোর ক্ষমতা যদি তোমাদের কারো থাকে, করুণা কর। দেরী না করে এখুনি এসে তোমরা। আমার জীবন নিয়ে ওদের জীবন বাঁচাও। বাঁচাও বাঁচাও।

জাহাজটাকে বা জাহাজের মানুষজনকে বাঁচাতে কোন দেবতাই এলো না সশীরীরে। অশরীরে এলেও তো ফলাফলে মালুম হত। জ্বলতে জ্বলতেই লোকসুদ্ধু জাহাজ ডুবল কালো জলের অতল তলে।

না মরে বেঁচে রয়েছে নীলামোতি। কিন্তু বাঁচার ক্ষীণ আশাটুকু কি স্তুরের দিকে হেলে পড়ছে না? পড়ছে বই কি! কত আর দেরী। জীর্ণ ভেলা আর জীর্ণ দেহ নিয়ে আর লড়াই করতে পারবে না নীলামোতি। নীলামোতি দুর্বল হয়ে পড়েছে। ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত!

অন্যের জীবন বাঁচাতে দেবতাদের কত ডেকেছে নীলামোতি। নিজের জীবন বাঁচাতে কাকে ডাকবে? কোন কিছু মাথায় আসছে

না। আর ডেকেই বা লাভ কি? পরীক্ষা তো হয়েই গেল। দেবতাদের অস্তিত্ব আছে কিনা—সে বিষয়ে পুরো সন্দেহ এখন।

সব কিছু সন্দেহ করো, পরে সন্দেহভঞ্জনও হয়ে যেতে পারে কোন সময় নিজের ভুল বুঝতে পেরে। কিন্তু নিজের কাছে নিজে নিঃসন্দেহ হয়ে থেকো। নিজের ওপর বিশ্বাস রেখো। বিপদে-আপদে সুখ-সম্পদে নিজে সজাগ-সতর্ক হয়ে এগোলে মনোমত রাস্তায় নিশ্চয় পেঁছুবে। উদ্দেশ্য সিদ্ধি নিশ্চিত জানাবে। এসব আদেশ-উপদেশ বাবার। সন্ধ্যেয় পড়বার পর গল্প বলতে বলতে মনের জোর বাড়াবার জন্য এক একদিন একরকম কথা বলত। মনে রাখবার জন্য, মনকে সাহসী করে তোলার জন্য।

নিঃসঙ্গ নীলামোতি একটা ভেলা অবলম্বন ক'রে সমুদ্রে নাটা-ঝাপটা খেয়ে চলেছে। বাবার কণ্ঠস্বরে গল্প শুনছে যখন চতুর্দিক শূন্য আর অন্ধকার দেখছে। দেবতাদের ডাকা নিয়ে গল্প।

কতই বা বয়স আর ছেলে দুটির! এগারো কি বারো। হলায়-গলায় বন্ধুত্ব। গ্রীষ্মের ছুটিতে বেড়াতে গেছে শুশুনিয়া পাহাড়ে। অবিশ্যি বাড়ির লেকের সঙ্গেই। বাড়ির বলতে গেলে দুবাড়ির নয়, একবাড়ির। ত্রিলোকদের। সুলোচন ওদের জিম্মায় গেছে মা-বাবাকে বলেকয়ে।

দুজনে মিলে পাহাড়ে উঠেছে কিছুটা। দুর্মতি চাপলো সুলোচনের মাথায়। ত্রিলোককে বলল, দেখি তোর কত সাহস—ঝাঁপ দিতে পারিস এখান থেকে? হ্যাঁ, পারি।

পারিস্! হাত পা ভাঙবে না?

না। আমার শিব আছে।

শিব রক্ষে করবে তোকে? হা-হা ক'রে হেসে উঠেছে সুলোচন।

ঠাট্টার কি আছে! মা বলে, শিবই আমার মর মর অসুখে বাঁচিয়ে দিয়েছে। আমি নাকি শিবের ছেবে। শিব আমার মধ্যে আছে। শিব আমাকে রক্ষে করছে দিনরাত।

আবার হেসে উঠেছে সুলোচন।—আচ্ছা, দেখি তো তোর শিব কেমন রক্ষে করে তোকে।

জয় শিবশঙ্কর!

ত্রিলোক ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

অক্ষতদেহে নিচে দাঁড়িয়ে ডাকছে ত্রিলোককে সুলোচন—আয়! শিবের নাম নিয়ে তুই পড়। কোন ভয় নেই।

কেন, তোর শিবের নাম নিয়ে পড়তে যাবো কেন? আমার কি কেউ নেই নাকি!

সুলোচন চাক্ষুষ দেখেছে ত্রিলোকের পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া। কোন অঙ্গে যে ওর এতটুকু আঘাত লাগেনি, তাও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ওর শিবশঙ্করের যে রক্ষে করার ক্ষমতা আছে প্রচুর, বেশ বুঝতে পারছে। এ বিষয়ে ভুল নেই কোন। কিন্তু ওর ঠাকুরের নামটা মুখে উচ্চারণ করলে, বড্ড খেলো হয়ে যেতে হয়ে ওর কাছে।

সুলোচনের উর্বর মস্তিষ্কে বুদ্ধি এসে যুগিয়েছে খেলো না হবার। ত্রিলোকটা একটা ঠাকুরের নাম নিয়েছে। সে সব ঠাকুরের নাম নেবে। দেখি কে তাকে রক্ষা করে! ত্রিলোকের চেয়ে অনেক বুদ্ধি তার। অনেক বুদ্ধি!

কা-কৃ-শি-দু-হ-ল-স-কা-গ···।

প্রত্যেক দেবতার নামের প্রথম অক্ষর এক সঙ্গে উচ্চারণ করেই ঝাঁপ দিয়েছে সুলোচন। বেঁচে গেছে মাথাটা, ভেঙেছে হাত-পা। একি হ'ল! কি নিষ্ঠুর দেবতারা! এতটুকু দয়া-মায়া নেই সুলোচনের ব্যাপারে! যত দয়ামায়া ত্রিলোকের বেলায়!

একে হাড়ভাঙার অসহ্য যন্ত্রণা তার ওপর সমুদ্র প্রমাণ অভিমান! সুলোচনের বাঁধভাঙা কান্না আর বুকফাটা আর্তনাদে চতুর্দিকের লোক ছুটে এসে জড়ো হয়েছে ওখানে। সকলে ক্ষোভে-দুঃখে দেবতাদের নিন্দেয় পঞ্চমুখ। একটা দুধের বাচ্চার ওপর এই অবিচার।

সুলোচনকে ঘাড়ে করে নিয়ে দেবতাদের মন্দিরে গেছে ওরা পর পর। পুজারীঠাকুরকে জবাবদিহি করতে হবে! যে দেবতা এত বড় অন্যায় করে, তাকে পুজো করা উচিত নয় মোটে। থাকুক উপোসী হয়ে ভোগরাগ বন্ধ করতে হবে।

প্রথমে মাকালীর মন্দিরে গেছে ওরা।

সুলোচনকে দেখে, মন্দিরের পুরোহিত তো কেঁদেই আকুল। দয়াময়ী মা আমার একি করলে! ঘরের দরজা বন্ধ করে থেকেছে কয়েক মুহূর্ত। তারপর বেরিয়ে এসে বলেছে, মা সুলোচনকে

রক্ষের জন্য ঘরে এক পা আর বাইরে এক পা রেখেছে সবে, এমন সময় কৃষ্ণের 'কৃ' কানে যেতেই, বাইরের পা ভেতরে নিয়ে এসেছে অমনি। কৃষ্ণ তো যাচ্ছেই, আবার মা কেন?

দেবতাদের অন্যায়ের ফয়সালা কোন হয়নি। মন্দিরে মন্দিরে ঘোরা পণ্ডশ্রম হয়েছে। একই কথা শুনতে হয়েছে। দেবতাদের নামের তফাৎ যা কেবল। কৃষ্ণ বলেছে, শিব যাবে বুঝি। শিব বলেছে, দুর্গা। দুর্গা হরি। হরি লক্ষ্মী। লক্ষ্মী সরস্বতী সরস্বতী কার্তিক। কার্তিক গণেশ।

শেষে সব কাজের সিদ্ধিদাতা গণেশের কাছেই বাস্তব-সত্যের নীতি-কথা শোনা গেল কিছু তবু।

মন-বুদ্ধি এক করে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে, কেউ যদি কোন কাজ করে। শত বাধা এলেও সফল হওয়া অসম্ভব নয়। মানুষের মন দুর্বল, তাই কোন কিছুর ওপর স্থির বিশ্বাস রেখে, বা কোন কিছু একটা অবলম্বন ক'রে এগোতে হয়। সে দেবতা হলে, যে কোন একটি দেবতা হওয়া চাই। যেটি যার ভালো লাগে সব চেয়ে বেশী। দশটি হলে, মন দশদিকে ঘোরাফেরা করে। এতে চিত্তবিভ্রম আর মতিভ্রম হওয়াই স্বাভাবিক। এমনি সব কাজেই বাধা-বিপত্তি এগিয়ে আসে। জাপটে ধরে, ছাড়তে চায় না।

গণেশের পূজারী আরো বলেছে, দেবতাকে না হলেও চলবে। মানুষ যদি নিজেকে ঠিকমতো বিশ্বাস করে। একটি দেবতাকেও বিশ্বাস করা, প্রকারান্তরে নিজেকেই বিশ্বাস করা। সেই দেবতাই নিজে, নয় নিজেই সেই সেই দেবতা।

কাকে ডাকবে বিপদভঞ্জন বলে—হদিশ মিলে গেছে নীলামোতির এবার। নিজেই বিপদভঞ্জন সে নিশ্চয় ডুববে না। ডুবতে পারে না নীলামোতি। কিছুতেই না। কখনো না। না না না।

আশ্চর্য ব্যাপার? আবার আর একটা জাহাজের মাস্তুল দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ জাহাজটা দেখা যাচ্ছে এবার। আগেরটার চেয়ে অনেকগুণ বড়। দেখতেও আগেরটার চেয়ে সুন্দর।

কে জানে ওটারই বা বরাতে কি আছে! আর আশা নয়। ধৈর্য ধরে দেখা যাক। অপেক্ষা। শুধু অপেক্ষা। সময় কোন্ সুরাহা

এনে দেয়, দেখার সময় এসেছে যখন নীলামোতির। অস্থির হলে হতাশ হলে চলবে না।

এগিয়ে আসছে জাহাজ।

ডেকের লোকেরা—স্ত্রী-পুরুষ ছোটবড় সকলে হাত নেড়ে অভয় দিচ্ছে। হাসিমুখে আশ্বাস দিচ্ছে, আমরা যাচ্ছি। আমাদের জাহাজে তুলে নিচ্ছি তোমায় এখুনি।

নীলামোতির দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি তো! সত্যিই দেখছে তো!

না, নীলামোতির দৃষ্টিভ্রম নয়। সত্যিই জাহাজটা এগিয়ে এসেছে। মোটা দড়ির সিঁড়ি ফেলে দিয়ে তুলেও নিয়েছে। অকূলে কূল পেল বুঝি নীলামোতি। ভরভরাতি আনন্দে ডেকের ওপর বসে পড়েছে। ডেক—নিতুমার পুজো মণ্ডপ।

পুজো মণ্ডপের ডেকে বসে বসে কত না দোলা খেয়েছে নীলামোতি নানারকম ব্যাপার স্যাপারে। ধকলও গেল কি কম? দেহের ওপর দিয়ে নয়, সমস্ত মনের ওপর দিয়ে। থেকে থেকে দুলে উঠেছে মুক্তিমুখো মন। ধকলও পড়েছে সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ। নিস্তেজ হয়ে পড়েছে নীলামোতি। খানিক পরেই আবার নিঝঝুম ভাব কেটে গেছে। আবার সতেজ।

নিতুমার সাধনার জাহাজ থেকে শেষ অবধি কিছু পাবে কি? কে জানে? যা বরাত তার। কথায় বলে, অভাগা যেখানে যায়, সাগর শুকায় হায়। সঠিক একথা খাটে না নীলামোতির বেলায়। কথাটা একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললে বরং খেটে যায়। অভাগা যেখানে যায় ধ্বংসের আগুন পিছু ধায়।

ভাঙাচোরা ইট পাথর আর খড়কুটোর এবড়োখেবড়ো ডেরাটা পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। স্থানচ্যুত হয়েছে একটি-আধটি প্রাণী নয়, তিন তিনটি। কৃষ্ণভৈরব বৈষ্ণবী আর সুকেশী।

আগুন কি এমনি-এমনি লেগে গেছে, না কোন নির্দয় মানুষ লাগিয়ে দিয়ে সরে পড়েছে নিজের প্রতিশোধ চরিতার্থ করার জন্য? না, দুটোর একটাও না। এমনি এমনি লাগেনি আগুন। প্রতি-

শোধের কোন উত্তাপ স্পর্শ করেনি ওদের কারো ডেরায়। তবে? আশ্চর্য লাগলেও ঘটনা কিন্তু যথার্থ। নীলামোতির স্বচক্ষে দেখা। তখন সেখানে উপস্থিত ছিল সে। আগুন ধরিয়েছে কৃষ্ণভৈরব আর কালীবৈষ্ণবী—দুজনে মিলে। নিজেদের জিনিসে নিজেরা। হ্যাঁ, এছাড়া হয়তো অন্য কোন পথ খোলা ছিল না ওদের সামনে তখন। তখনকার পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করার মতো অন্য কোন শক্ত অবলম্বন খুঁজে পায়নি বোধ হয়।

সে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য। বোশেখের দুঃসহ উত্তাপ আগুন ছিটোচ্ছে চতুর্দিকে। কোথায় নয়—জলে স্থলে আকাশে বাতাসে। গোরু ভেড়া মানুষ—সব আধমরা। ধুঁকছে। ধুঁকলে কি হবে। মনমেজাজ খুব চড়া সকলের। কারণ না বুঝেই মারামারি রাগারাগি তাপাতাপি। সূর্যের রুদ্রলীলায় এই পরিবেশ পরিস্থিতি বেশ মানানসই।

সময়ে সময়ে মনে হচ্ছে দীর্ঘ ক' বছরের মধ্যে এমন গ্রীষ্ম আসে নি। অনেকে বলে নাকি প্লাবনে পৃথিবী ধ্বংস হবে। এ অবস্থায় কথাটায় ব্যঙ্গের সুরই বেজে ওঠে শুধু। গরমে ত্রাহি মধুসূদন। জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে বেঁচে থাকবে, না প্লাবনে ডুববে?

পশ্চিমী লু চলেছে বরাকরের মাটিতে। প্রাণঘাতী গরম হাওয়া। অনেকে প্রাণ বাঁচাতে স্থান ত্যাগ করছে। মাসিমাও বারে বারে নীলামোতিকে বুঝিয়ে কলকাতায় ফিরে যেতে বলেছে। নীলামোতির ধনুক-ভাঙা পণ। পাদমেকং ন গচ্ছামি। উদ্দেশ্য সাধন না হওয়া পর্যন্ত যায় কি করে!

যে জন্য আসা, যে প্রত্যাশায় মাস তিনেক ধরে অপেক্ষা করে রয়েছে, আজ হাতের মুঠোয় যখন সেই নক্ষত্র ক্ষণ এসে পেঁীছে যাচ্ছে, তখন চলে যাওয়া মানে মস্ত পাগলামি। চূড়ান্ত ছেলেমানুষি। কাজে ফল ফলুক না ফলুক—এটা বড় কথা নয়। বড় কথা, নীলামোতি যে কথা দিয়ে ফেলেছে কালীবৈষ্ণবী আর কৃষ্ণভৈরবকে। থাকবে, ক্রিয়াকলাপের সময় নিশ্চয়ই থাকবে। শ্মশানে নয়, বাড়িতে অবিশ্যি।

মনে যে প্রখর গ্রীষ্মের দাবদাহ চলছে, তার চেয়ে কি বাইরের গ্রীষ্মের বেশী জ্বালা? কার ধারণার কোনটা অতিরিক্ত কষ্টকর—

জানে না নীলামোতি। কিন্তু এটা ভালোরকম জানে, তার নিজের ভেতরের কষ্ট বাইরের চেয়ে লাখো গুণ বড়। নিজের কষ্টের টানা-পোড়েনে আর দুটো জীবন জেরবার হয়ে যাচ্ছে। অকালে না শুকিয়ে যায় সুবাসে নেশা ধরানো সুন্দর দুটি ফুল। শুকোবেই বা কেন? জীবন থাকতে নীলামোতি তা হতে দেবে না।

নীলামোতিকে এপথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টার কসুর করেনি অনেকে। কেউ কেউ বলেছে, এসব অবাস্তব-উদ্ভট স্রেফ। নিছক কল্পনা। মিছিমিছি নিজেই নির্যাতন ক'রে চলেছে নিজের মনকে। দুনিয়ায় বহুরকমের পাগল আছে, তার মধ্যে এও এক-শ্রেণীর।

মনের পাঠে অভিজ্ঞ নয় যারা, যারা পাঠ উদ্ধার করতে অক্ষম, তাদের মতামতের কি মূল্য আছে নীলামোতির কাছে! নীলামোতির নিজের চোখ যেমন কথা কয়, তেমনি অন্যের চোখের দিকে চেয়ে তার মনের কথা চোখের ভাষায় বুঝতে পারে। যেটা পারে, সেটা যে ভুল-ভাল বেঠিক নয়, এটা নির্ভুল প্রমাণ হয়ে গেছে অনেকের ক্ষেত্রে অনেক বার।

কেন জানে না, এটা আপনা হতেই হয় তার ছোটবেলা থেকে। মিলে গেলে সেকি আনন্দ! মিলে যায় বলেই হাঁ করে দেখে এক দৃষ্টে লোকের চোখ—সে জানা-অজানা যে কেউ হোক না কেন—চোখের দিকে চেয়ে থাকা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেল। বড় হয়েও যায় নি। বেড়েছে বই কমে নি।

হৃদয়নাথ আর পুষ্পরানীর তো কথাই ওঠে না। ওদের সঙ্গে তো আর চোখে চোখে পরিচয় নয় শুধু, প্রাণের কথায় চেনাজানা। সে কথা যত গোপন আবরণে ঢাকা থাকুক না ভেতরে, নীলামোতির দৃষ্টির আলোয় ধরা পড়ে গেছে ঠিক। নীলামোতির কানে কানে চুপিচুপি বলে দিয়েছে ওদের চালচলন, ওদের চাউনি, ওদের আচার-ব্যবহার। ওরা ভাবতে পারে, কেউ জানে না। কিন্তু সমস্তই জানে নীলামোতি। জানে বলেই নীলামোতি জোর করে যা-যা করতে বলেছে, ওরা সে আদেশ—আদেশ বলেই শিরোধার্য করেছে মৌন-মুখে। কোন বাদ-প্রতিবাদ করে নি।

কলকাতায় বেড়াতে গিয়ে নীলামোতিদের বাড়িতে উঠেছে

মাসিমা। মাসিমার মুখেই কালীবৈষ্ণবী আর কৃষ্ণভৈরবের গুণাগুণ শুনে. মাসিমার সঙ্গেই চলে এসেছে বরাকরে ওরা তিনজনে। নীলামোতি হৃদয়নাথ আর পুষ্পরানী।

এখানে এসেও কম বিপদের মুখে পড়তে হয় নি। ওদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে প্রাণ যাবার লক্ষণ। সে এক গা শিউরোনো ঘটনা।

মাঘের শেষাশেষি।

সন্ধ্যের বাতাসে হিম ছেয়ে গেছে। হাড় কনকনে ঠাণ্ডা। সবার মাথা থেকে পা অবধি শাল-দোশালার মুড়ি। শুধু নাক আর চোখ দুটো বার করা। আগুপেছু চলেছে দুটো সাইকেল রিকশা। পথের মাটি কাঁকর মাড়িয়ে মাড়িয়ে চলেছে। কিচ কিচ কিচ কড় কড় কড়াস। রিকশা হেলছে দুলছে। একটু আধটু উঁচু নিচু হয়ে উঠেছে মাঝে মাঝে।

মাসিমা রিকশাঅলার উদ্দেশ্যে বলে উঠেছে. এ নওজওয়ান, সামাল কে?

ঘাবড়াইয়ে মত মাইজি! জান জানেসে ভি কোই নুকসানি নহি হোনে দেগা।

আগের রিকশায় মাসিমা আর নীলামোতি পাশাপাশি বসে। পেছনেরটায় হৃদয়নাথ আর পুষ্পরানী। মাসিমার কাছেই বসতে চেয়েছে পুষ্পরানী। নীলামোতির আপত্তিতে বসতে পারে নি। ওর ইচ্ছেই মেনে নিয়েছে হৃদয়নাথের রিকশায় বসে।

শ্মশানে পেঁছিতে তখনো খানিকটা রাস্তা বাকি। বিশাল তেঁতুল-গাছটার কাছ বরাবর আসতেই যমদূতের মতো গোটা ছয় সাত যুবক. কে জানে কোথায় ঘাপটি মেরে বসে ছিল, দুটো রিকশাকেই গোল করে ঘিরে ফেলল। সকলেই ছোরা উঁচিয়ে ধরেছে। মালমুগুর চেহারার বাহুর পেশী ফুলে ফেঁপে উঠেছে ওদের। মৃত্যুর হাতছানি দিচ্ছে এক একটা তীক্ষ্ণ ধারালো ছোরা।

সামনের যুবককে লক্ষ্য করে নীলামোতি গায়ের শালটা ছুঁড়ে দিয়েছে। হাতের বালা খুলছে দেবে বলে। শাল লুফে নিয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে তরুণ। কর্কশ গলায় বলেছে, চোর ডাকাত ভেবেছেন নাকি? নিয়ে নিন আপনাদের শাল। এত ছোট মনে করবেন না

মানুষকে। জানবেন রাক্ষস যেমন মানুষখেকো, তেমনি আমরাও চোর-ডাকাতখেকো। বুঝলেন? চোর-ডাকাতখেকো।

কোথা থেকে আর একটা যুবক দৌড়ে এসেই, দুহাত দিয়ে নদীর ঢেউ সরাবার মতো সরিয়ে দিয়েছে ওদের। উদাত্ত গম্ভীর স্বরে আদেশ করেছে, এঁদের কোনরকম বিরক্ত করবে না কেউ। করলে, মাটির তলায় জ্যান্ত পুঁতে ফেলব। নিজের বুকে হাত দিয়ে বলেছে, বাসুদেবকে ভালোই চেনো তোমরা। খুব সাবধান।

বোঝা গেল বাসুদেব এদের নেতা। হ্যাঁ, নেতার মতোই চেহারা, কণ্ঠ!

একটু ব্যক্তিত্ব না থাকলে, সে ভালো বা মন্দ—কোন পক্ষেরই সর্বেসর্বা হতে পারে না।

বাসুদেবের নির্দেশে বাসুদেবের অভয় পেয়ে রিকশাঅলা দু'জন এগোতে শুরু করল আবার। রিকশার মোড় ঘোরা দেখে বাসুদেব বুঝতে পেরেছে রিকশাযাত্রীদের গন্তব্যস্থল কোথায়। কার কাছে

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এলো নীলামোতির রিকশার কাছে। নীলামোতিকে উদ্দেশ করেই বলল, নিশ্চয় শ্মশানে যাচ্ছেন? ভণ্ড কৃষ্ণভৈরবটার কাছে? বলবেন গিয়ে, বাসুদেব তোমাদের ছাড়বে না কিছুতেই, যতক্ষণ না সুকেশীকে ছেড়ে দেয়। যে পায় সে পায়—বাসুদেব ওদের মারণ-টারণের ভয় পায় না। ভালো পথে না গেলে, অন্য পন্থা বেছে নিতে হবেই। তখন কিন্তু কেঁদে কূল পাবে না ভৈরব।

যেমন ছুটে এসেছে, তেমনি ছুটেই ফিরে গেছে আবার বাসুদেব। ওর আসা হাওয়ার মধ্যে বাতাসে একটা প্রাণের পরশ দুলে উঠেছে। রঙিন স্বপ্নের উচ্ছল জীবনের পরশ। বিজয়ী বীর বিক্রম নায়কের পরশ।

বসে বসেই ঘাড় ফিরিয়ে দেখেছে নীলামোতি। না, একমাত্র সামনে ছাড়া কোনদিকেই তাকাচ্ছে না বাসুদেব। ডান বা পেছনে না—কোন লক্ষ্যই নেই। সেনার মতো পা ফেলে ফেলে চলছে। চলছে তো চলছেই। এ পথ চলার কি শেষ হবে ওর একদিন? ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে নিজেকে সংযত করেছে নীলামোতি। অচেনা অজানাকে নিয়ে

এমন অদ্ভুত প্রশ্ন তোলপাড় করে উঠছে কেন ভেতরে? কে ও, কে সুকেশী?

শ্মশানে কৃষ্ণভৈরবের ডেরায় এসে প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেছে নীলামোতির। বাসুদেব সুকেশীর ব্যাপার যেটা আঁচ করেছে মনে মনে, তাই।

ডেরায় এসে প্রবেশের মুখেই কৃষ্ণভৈরবের সঙ্গে চোখাচোখি। যেন নীলামোতিদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। একগাল হেসে মাসীমাকে বলেছে, রাস্তায় কোন গোলমালের মধ্যে পড়তে হয় নি তো?

মাসীমা মৃদু হেসে বলেছে, পড়লেও কেটে গেছে আপনার আশীর্বাদে।

আমার নয়, আমার নয়। সব মা কালীর। দাঁড়াও ডেকে দিচ্ছি। এখনো তোমাদের চিন্তায় ও মায়ের মূর্তির সামনে বসে।

না, কষ্ট করে ডাকতে হবে না আর। আমরাই যাচ্ছি।

কৃষ্ণভৈরবের সঙ্গে সঙ্গে নীলামোতিরাও গেছে ভেতরের ঘরে। সেখানে ধীরস্থির ধ্যান-তন্ময় অবস্থা কালীবৈষ্ণবীর। মৃন্ময়ী কালী-মূর্তির সামনে বসে আর একটি মাটির প্রতিমা বুঝি।

কালীবৈষ্ণবীর ফরসা মুখে লালচে আভা ফুটে উঠেছে। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। ওই আভায় পরিপূর্ণ মাতৃস্নেহের সবটুকু মাখানো বুঝি।

অতি সন্তর্পণে—একপ্রকার নিঃশ্বাস বন্ধ রেখেই মাদুরের ওপর এক এক করে বসে পড়েছে সবাই। বসে আছে চুপচাপ। নড়লে চড়লে পাছে কালীবৈষ্ণবীর ধ্যান ভঙ্গ হয়। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় নি। খানিক বাদেই চোখ খুলেছে। চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিল নীলামোতিদের প্রত্যেককে।

প্রণাম করেছে মাসীমা মেঝের মাথা ঠেকিয়ে। ওই ভাবেই প্রণাম করেছে কৃষ্ণভৈরবকেও। পরে মূর্তিকে। মাসিমার দেখাদেখি তিন-জনেই প্রণাম সেরেছে নিজেদের—নীলামোতি হৃদয়নাথ পুষ্পরানী।

হেসেছে কালীবৈষ্ণবী। সত্তর-বাহাত্তর বয়সেও বেশ শক্তসমর্থ দেহের আঁটসাঁট বাঁধুনি। বিরাট জটা মেঝেয় লুটোচ্ছে। কপালে নাকে হাতে শ্বেতচন্দনের তিলক। পরনে লাল পাড় হলুদ শাড়ী। গলায় কণ্ঠী—তুলসীর মালা। কম্বলের আসনে বসে।

ওপাশে কুশের আসনে মৌনমুখে বসেছে কৃষ্ণভৈরব। ঘাড় অবধি বাবরি চুল। কালো কুচকুচে। কপালে বড় টকটক লাল সিঁদুরের টিপ। সিধে সিঁথে। মুখখানা ঢলঢলে। বছর চল্লিশের মানুষটার যেন চার বছরের শিশুর মুখ। কাছা কোঁচা দেয়া লাল রঙের ধুতি পরা, গায়ে লাল ফতুয়া। ঠিক ফরসা বলা যায় না। একটু তামাটে ধরনের।

কালীবৈষ্ণবীই সুকেশীকে ডেকেছে। শশা-কলা আর বড় বাতাসার ডালি নিয়ে হাজির হয়েছে সুকেশী। হাতে হাতে প্রসাদ দিয়েছে সবার। ওকে বসতে বলে ওর কাহিনী শুনিয়েছে কালীবৈষ্ণবী।

বাসুদেবটা একেবারে বাউণ্ডুলে। বাপ-মার তো দু'চোখের বিষ। বাড়ী ঢোকা নিষেধ। পাড়ার মেয়েদের অকারণ এত উত্যক্ত করে যে, টেকা দায়। সুকেশীকে তো 'বিয়ে করবো, বিয়ে করবো' ক'রে, উদ্ব্যস্ত করে মেরেছে। চতুর্দিকে রটিয়েছে, সুকেশী ওর বৌ। রটিয়ে রটিয়ে কত না সম্বন্ধ ভেঙেছে সুকেশীর। শেষে সুকেশীকে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করতে, ও নিজেই পালিয়ে এসেছে। এই শ্মশানের মধ্যেও এসেছে বাসুদেব। স্পষ্ট বলে দিয়েছে সুকেশী, বাসুদেব কেন— কাউকেই বিয়ে করবে না জীবনে। কালীবৈষ্ণবীর মতো সন্ন্যাসী হয়ে যাবে।

কালীবৈষ্ণবীকে ভালোরকমই জানে বাসুদেব। ওদেরই পাড়ার ধনীর দুলালী। স্বেচ্ছায় স্বামী বাড়ীঘর ত্যাগ ক'রে দিয়ে শ্মশান-বাসিনী সন্ন্যাসিনী। কৃষ্ণভৈরব ওর মধ্যে জগন্মাতাকে দেখে যেন। আর কৃষ্ণভৈরবের কাছে কালীবৈষ্ণবী আরো কিছু। যশোমতী কালী-বৈষ্ণবী ওকে কৃষ্ণগোপাল দেখে।

রেগে গেলে কিন্তু কালীবৈষ্ণবী ভয়ঙ্করী হয়ে ওঠে। তখন স্বয়ং জ্যান্ত কালী একেবারে। বলির খাঁড়া নিয়ে তেড়ে যায়। ওর দুচোখের দিকে তাকানো যায় না. যে যেখানে আছে, পালিয়ে প্রাণে বাঁচে। বাসুদেব একদিন রণমূর্তি দেখে পালাতে পথ পায় নি। আর ত্রি-সীমানায় আসে না। যত হম্বিতম্বি ওই দূর থেকে।

সুকেশীর বয়স খুব একটা বেশী নয়। চব্বিশ-পঁচিশ। সুশ্রী-মিষ্টি। শান্তশিষ্ট গোছের মেয়ে। ওর খুব পছন্দ এদের সাধনা।

বৈষ্ণব আর তন্ত্র—দুটি নদী এসে মিলে মিশে একাত্ম হয়ে গেছে যেন এখানে—এদের সাধনা ধারায়। একটি নামে—বৈষ্ণবতন্ত্র।

নীলামোতির মনে পড়ে যায় ভক্তসুরদাস—সাধক সুরদাসের গানের কলি।···দো মিলকে এক বরণ ভয়ো সুরেশ্বরী নাম পর···। নর্দমা নদী, দুটো মিলে গিয়ে গঙ্গায় পড়লে আর অস্তিত্ব থাকে না কারো। গঙ্গার রঙে গঙ্গার নামেই তখন হারিয়ে ফেলে নিজেদের।

মাসীমার খুব বিশ্বাস এদের ওপর। কালীবৈষ্ণবী আর কৃষ্ণ-ভৈরবের ওপর। এদের কাছে যাতায়াত দীর্ঘদিনের। অতি সৎ এরা। এদের সৎ-পরামর্শে অনেক বিপদ-আপদ কেটেছে। বাসুদেবটা পাগল। স্বার্থে বাধা পড়েছে, এদের নামে যা-তা বদনাম দিয়ে লোকের মন বিষিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। কিন্তু তা কি হয়! পূর্ণিমা পূর্ণিমাই, অমাবস্যা অমাবস্যাই। মেঘে ঢাকা থাকলেও চাঁদ চাঁদই। মেঘ সরে গেলেই ফুটফুটে জোছনা। কিন্তু অমাবস্যায় মেঘ সরলেও সেই অন্ধকার। ঘন অন্ধকার। বাসুদেব তাই ওর বদনাম দেয়ার ভয়ে ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য এদের কিছু আসে যায়. কিছু আসে যাবেও না।

কালীবৈষ্ণবী ভরসা দিয়েছে নীলামোতিকে। তার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। মাঝে তো মোটে দুটো মাস। এসেছো যখন, আবার ফিরে যাবেই বা কেন? কাজ সেরে যাওয়াই ভালো। যে কাজ হবে, তার নক্ষত্র মাস পক্ষের ঠিক ঠিক মিল হওয়া চাই। বরাত জোরে সে সব এসে যাচ্ছে বোশেখে। প্রথম দিকেই। এসময় ছেড়ে দিলে, অনেক দেরী হয়ে যাবে। শ্রাবণের জন্য হাপিত্যেশ করে বসে থাকতে হবে।

কালীবৈষ্ণবীর মতামত যুক্তিগ্রাহ্য, সিদ্ধান্ত ন্যায্য।

ক্রিয়াকলাপের যোগাড়যন্ত্র চলেছে নিয়মমাফিক। মূর্তি তৈরিরও নির্দেশ দেওয়া হ'ল কুমোরকে। এমূর্তি আবার ভয়েময়ে বানাতে চায় না অনেকে—বেশীর ভাগই।

ভয়াবহ মূর্তির ভীষণ কড়াকড়ি।

কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাতে দেখলে সত্যি-সত্যি ভয় ধরে। প্রথমে পরিবেশেই বুক গুরগুর করে ওঠে। এ দেবতার পুজো একদম

লোকালয়ে নিষেধ। শ্মশানে-মশানে বা জঙ্গল-পাহাড়ে দেবতার আসা নাকি সহজ। দেবতার কাজ শত্রুমারণ।

হিংস্রকে মনের মানুষই মূর্তি গড়ার উপযুক্ত। সুন্দরের পূজারীরা প্রকৃত রূপটা ফুটিয়ে তুলতে পারে না। একটু না একটু খুঁত থেকে যায়। মূর্তির চেহারা হবে ইস্পাত-কঠিন। মুখ হবে উগ্রমেজাজীর। বড় বড় কান, থাকবে কুণ্ডল। চার হাত। ওপরের হাতে শাঁখ-পদ্ম নিচে চক্রপুরুষ আর গদাদেবী।

দুটোই শাসনের প্রতীক। চক্রের শাসনে খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে শত্রুর সমস্ত জারিজুরি। আর গদায় পিষে গিয়ে একেবারে মাটি নেবে। অর্থাৎ মাটিতে মিশে যাবে। শাঁখ-পদ্ম শত্রু নিপাতে বিজয়-ধ্বনি আর মঙ্গলের আহ্বান।

কৃষ্ণভৈরবকে প্রশ্ন করার সময় দেখেছে নীলামোতি সর্বাঙ্গ কাঁপছে ওর। ঊর্ধ্বদৃষ্টি। বসে থাকতে থাকতে ধপাস করে পড়ে গেছে।

গম্ভীরমুখে কালীবৈষ্ণবী বলেছে, কোন ভয় নেই। ওর অমন হয়। দেবতার কথা বলতে ও নিজে সেই ভাবে বিভোর হয়ে যায় অমন যে, নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে একেবারে। সমাধি। একটু পরে উঠবে'খন।

স্নেহঝরা স্বরে বলেছে বৈষ্ণবী, প্রশ্ন আমাকেই করলেই উত্তর পাবে। খোলা মনে সব কিছু জেনে নেয়া ভালো মা! বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর। দ্বিধা এলে কাজে ফল ভালো হয় না। আর সে কাজ যে করবে তারও যেমন বিপদ, যে করবে তারও তেমন।

নীলামোতি বলেছে, এত সব কাণ্ড কার জন্যে? শত্রুটা কে?

আছে মা, আছে। পোড়ার মুখো লোকেরা মানুষের সুখশান্তি দেখতে জ্বলেপুড়ে মরে। এমন অনেকে আছে, অন্যের দুর্গতি দেখলেই খুশি। কোন কারণ অকারণের ধার ধারে না এরা। এদের স্বভাবই লোকের ঘরাঘরি বিবাদ বিচ্ছেদ বাড়িয়ে দেয়া। মন উচাটন করে দেয়া। ষট্‌কর্মের 'উচ্চাটন' ক্রিয়াকলাপে। এসব কথা, এরকম খটমটে ভাষা শোনে নি কখনও এর আগে নীলামোতি। অবাক হয়ে যাচ্ছে শুনে। বৈষ্ণবীকে প্রথম দর্শনেই ভালো লেগে গেছে বলে, অবিশ্বাসী কথা শুনলেও মন শুনতে চাইছে কিন্তু। কড়া কথা

শুনিয়ে দিয়ে আঘাত করতে ইচ্ছে করছে না। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেও না।

বৈষ্ণবীর কথাবার্তায় আর ভাবভঙ্গীতে বসিয়ে রাখার আর চুপ করে শোনার জাদুকাঠি ছোঁয়ানো আছে নিশ্চয়। বৈষ্ণবীর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ফিক করে হেসে ফেলেছে নীলামোতি।

মাসীমার নজর এড়ায় নি। বৈষ্ণবী যাতে রেগে না যায়, অথচ নীলামোতিও যাতে ঘোর অবিশ্বাসী দোষী সাব্যস্ত না হয়ে পড়ে— সাধু-সন্ন্যাসীদের শাপমুন্নির ফেরে না পড়ে, শ্যামকূল রাধাকূল রক্ষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে মাসীমা।

বলেছে, বৈষ্ণবীদি! এরা কলকাতার লেখাপড়া জানা মেয়ে। সব জিনিসই জানতে চায় বুঝতে চায়। ওর মনে কিন্তু কোন ঘোর-প্যাঁচ নেই। ছোটবেলা থেকেই ওর হাসি বাতিক। শুনলে অবাক হবে বৈষ্ণবীদি। তখন ওর বয়েস সাত। একজন বুড়ি মারা গেছে শুনে হেসে খুন।

সকলের বকাবকি। কেমনতরো মেয়ে লা তুই! আক্কেল বিবেচনার মাথা খেয়েছিস! একটু দয়ামায়ার লেশ বলে নেই তোর ভেতর! কি পাষাণী রে! ওদের বাড়ির লোকেরা কেঁদে সারা! আর তোর উল্লাস জেগে উঠল! বুড়ো হ'লেই বা, হাজার হোক মা তো! ছেলেমেয়েদের বয়েস বাড়লেও মায়ের কাছে তারা ছেলেমেয়েই তো। কাঁদবে না। কি বুকফাটা কান্না মেয়ে দু'টোর।

কাকে বোঝাল কে। মেয়ের তো হাসি বাড়ল আরো। মেঝেয় পড়ে গড়াগড়ি। দম আটকে মরে আর কি!

মেয়েকে ঘরে একা রেখে, বাইরে থেকে শেকল তুলে দিয়ে চলে গেছে সকলে। কেলেঙ্কারির একশেষ। ও বাড়ির কেউ এসে পড়লে, দেখে ফেললে মুখ দেখানো দায়। সমাজ বলে কথা আছে একটা। ভদ্রবাড়ি বলে প্রচার চারদিকে। ছিঃ! কি অসভ্য মেয়ে জন্মাল এ বংশে। কি লজ্জা কি লজ্জা। লোকের কাছে বার করা দায় এ মেয়েকে।

মেয়ের জন্য মাকে কম লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে হয় নি। বড় বাড়ি একান্নবর্তী পরিবার। একসঙ্গে সব। মেজোঠাকুর্দা, সেজো-

ঠাকুর্দা, ছোটঠাকুর্দা—এদের ছেলেমেয়ে নাতিপুতি। মেয়ের একটু খেয়াল রাখা উচিত। মেয়েকে সভ্য করে তোলা একান্ত কর্তব্য। মায়ের আস্কারাতেই হয়েছে এরকম। কোন শাসন নেই। বললেই বলে, কত তো বোঝানো হয়। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। হচ্ছে না-এ আবার কেমন কথা! তাদের ছেলেমেয়ে তো এমন নয়। শাসনে বাঘ বশ মানে, আর মেয়ে মানবে না। হাতে না মারো পেটে মারো। দেখবে কেমন জব্দ হবে। কান্না-কান্না! হাসি শুকিয়ে দু'চোখ উপচে কান্না ঝরবে তখন। ওর মা কি পারবে! পারবে না। উল্টে মেয়ের মুখে ক্ষীরের নাড়ু গুজে দেবে।

ছোটজায়ের মেয়ের হাসিব্যামো সারানোর দাওয়াই বাতলাতে বাতলাতে নিজেরাই হেসে কুটিকুটি। নীলামোতির মায়ের দিকে তাকাচ্ছে আর নিজেদের মধ্যে চোখ টেপাটেপি গা টেপাটেপি চলছে। রান্নাঘরের সামনের বারান্দায় বসে মহিলামহলের মজলিশ বেশ জমে উঠেছে।

মা তখন রান্নাঘরে, ঠাকুরমশাইয়ের কাছ থেকে মটরডালের চারটে গরম গরম বড়া চেয়ে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে, ছোট কাঁসার বাটিতে রেকাবি ঢাকা। নীল ভালোবাসে বড্ড। খোলা নিয়ে গেলে আবার খাবে না। সম্পূর্ণ বাপের ধাত পেয়েছে মেয়ে। মাছি বসেছে নিশ্চয়, ধুলো পড়েছে। খাবে না। কিছুতেই খাবে না। এত সাবধানে নিয়ে যাওয়া তাই।

জায়েদের পাশ কাটিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলেছে।

পেতনীর হাসি হেসে উঠেছে জায়েরা।

মেজোজা মাকে শোনানোর জন্যই বলে উঠেছে, একরকম চিৎকার করেই। ওলো সেজো, ক্ষীরের নাড়ু বলেছিলি! আসল বড়াটা বলতেই ভুলে গেলি! বড়া না হলে যে, মেয়ের মুখে রোচে না। বমি করে। সরু দাদখানি চালের ভাতও গলা দিয়ে নামে না!

সেজো আবার ভেঙচি কেটে বমি করার ঢঙে গলা দিয়ে বিকৃত স্বর বার করে—ওয়াক্ ওয়াক্ ওয়াক্।

মুচকি হেসে বড়জা বলে, আ ম'লো যা। ঘি দিয়ে দিয়ে পটল-ভাজা। এত আদর, তবু ন্যাকার।

ঘরের দোর অবধি পৌঁছয়নি আর মা। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ফিরেছে রান্নাঘরে আবার। বড়ার বাটিটা ঠাকুরমশাইয়ের হাতে ধরিয়ে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে।

ঘরে এসে দরজা বন্ধ করেছে। ভেতরের খিল-ছিটকিনি এঁটে দিয়েছে। মায়ের রকমসকমে নীলামোতির অবাক লেগেছে খুব। মুখখানা থমথমে দু'চোখের কোণে জলের ফোঁটা। জানালার ধারে বসে রয়েছে আকাশের দিকে চেয়ে।

নীলামোতির মা-ডাকে কোন সাড়া নেই। কান্নায় ও মৌন-নিথর। মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফোঁপাচ্ছে। স্নেহমাখা নরম হাতের পরশ পাচ্ছে না মাথায় পিঠে। কি করবে নীলামোতি! বুদ্ধি জোগাচ্ছে না মাথায়। ভগবান! তুমি মায়ের মতো বড় করে দাও আমায়! ছিটকিনি খিলে হাত যায় যেন। বাড়ির সবাই আসুক। মাকে দেখুক। মা কেমন হয়ে গেছে।

নীলামোতি ভেবেছে তার মনের কথা ভগবান শুনেছে। দরজায় খটখট আওয়াজ হচ্ছে। ছিটকিনি খিল খুলবে এবার। ভগবান এসেছে।

কোথায় ভগবান! ঠাকুরমশাই মাকে আর তাকে ডাকছে খেতে যাবার জন্য। এবারে মা কিন্তু কথা কইল বলেছে, আজ আর খাবো না। নীলও খাবে না।

কেন মা? বড্ড খিদে পেয়েছে।

পাক!

তোমার যখন তখন হাসির জন্য এই শাস্তি। তুমিও খাবে না, আমিও খাবো না।

এ সাজার পরও কি নীলামোতির ঝরনা-হাসি বন্ধ হয়েছে? হয় নি। হাসি যখন আসে, সাজার কথা মনে হয় না একবারও। হাসতে-হাসতে পাগল হয়ে ওঠে ও। গুরুজনদের আদেশ-উপদেশ অমান্য করে নি। জিভ কামড়াতে চেষ্টা করেছে। কিছুতেই কিছু নয়। জোয়ারের টান আটকাবে কে! নিজের অজান্তেই ভেসে চলে। টানে মন চলে যায় হাসির উজানে।

সুখে হাসি, দুঃখে হাসি, জন্মালে হাসি, মরণে হাসি। পাগল নাকি ?

না, পাগল নয়। বলেছে ব্যাসদেব কথক।

কাশীতেই মামার বাড়ি নীলামোতির। বাড়িতে গীতা পাঠ হ'ত প্রতি মঙ্গলবার। নীলামোতিকে নিয়ে বসে শুনত, যখন বাপের বাড়ি বেড়াতে যেত। ব্যাসদেব ব্যাখ্যার সময় একটা কথাই বেশি ক'রে শোনাতে ভুলত না। পাঠ শেষে শ্রীকৃষ্ণ প্রণামের পর বলত।—সার কথা, সুখেদুখে সমভাবই মানুষের শান্তি মানুষের তৃপ্তি। যার এভাব সেই প্রকৃত মায়া-শোক-মুক্ত মানুষ। সন্ন্যাসী বললেও চলে। মরণ বলে কিছু নেই। দেহের নাশে দেহীর নাশ নেই। অর্থাৎ আত্মার মৃত্যু হয় না। এ বোধ যার এসেছে, তার মৃত্যুতেও হাসিমুখ দুঃখেও হাসিমুখ।

এই শোনার ফলেই কি নীলামোতির সবটাতে হাসি। মায়ের প্রশ্নের জবাব দিয়েছে ব্যাসদেব, না—তা নয়। শোনে তো অনেকেই। নানা বয়সীর নারী-পুরুষ। কই, টনক তাদের নড়ে না। এখান থেকে বেরিয়ে গিয়েই বিষয়ের চিন্তা, মামলার চিন্তা, অসুখের চিন্তা— অগুনতি চিন্তা।

নীল আর কতটুকু মেয়ে! এখনো ভালোমন্দ বোঝার বয়স হয়েছে কি ওর! হয় নি। হাসে এমনি-এমনি। বোধ এলে ঠিক হয়ে যাবে।

ঠিক হয়ে যাবে! নামগন্ধও নেই। পাড়ায় বুড়িমা মারা গেল। হাসির ফোয়ারা ছুটল নীলামোতির। যদি কেউ দেখে ফেলে, সেই ভয়ে বাইরে থেকে শেকল তুলে মেয়েকে ঘরে বন্ধ ক'রে রাখা হ'ল।

এসময়ে—পাড়াঘরের ব্যাপারে—হাসি ভালো লাগে নি মায়ের। খানিক বাদে শেকল খুলে ঘরে ঢুকেছে। বলেছে, নীল! তোর জন্য মনে হয় ঘরবাড়ি ছেড়ে কোথাও চলে যাই। সত্যি আমার ভালো লাগছে না আর। আমি না ম'লে তোর এ কালহাসি থামবে না দেখছি। আমি ম'লে, যত পারিস হাসিস। তোকে বলতে আসবো না।

মা কাঁদতে কাঁদতে বিষ্ণুর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বার বার প্রার্থনা করেছে, তুমি আমায় তুলে নাও ! তুলে নাও !

মাকে জড়িয়ে ধরেছে নীলামোতি। বলেছে, তুমি এমন করছো কেন ? মানুষের আত্মার তো মৃত্যু নেই। দেহ পরিবর্তন শুধু। ভাঙা পুরনো বাড়ি ছেড়ে নতুন বাড়িতে গেল বুড়িমা। ছেঁড়া কাপড় ছেড়ে, নতুন কাপড় পরল। পুরনো ছেড়ে নতুন শরীর পাবে।

আবার হেসে উঠেছে নীলামোতি।

অবাক চোখে তাকিয়ে থেকেছে মা শুধু। মুখে কোন ভাষা যোগায় নি বলার মতো। কাশীর বেদব্যাসের পড়া গীতার সেই শ্লোক কানে বেজে উঠেছে। একবার দু'বার নয়। একনাগাড়ে—অনেক সময় ধরে।—বাসাংসি জীর্ণানি···সংযাতি নবানি দেহী।

এতক্ষণ মন দিয়ে শুনেছে নীলামোতির হাসির অধ্যায় কালীবৈষ্ণবী। কালীবৈষ্ণবীর মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। হাসি দেখে হেসেছে মাসীমাও। নিজেকে আশ্বস্ত বোধ করেছে। যাক, তার বক্তব্যে বৈষ্ণবীর মন ভিজেছে। নীলামোতির হেসে ফেলায় কোন রাগক্ষোভ নেই ভেতরে।

নীলামোতির মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে রইল বৈষ্ণবী। তারপর মাসীমার দিকে চেয়ে বলেছে, সুখী ! তোমার নীলামোতির কিন্তু আর পাঁচটা মেয়ের মতো হবে না। ওর মধ্যে ছাই-চাপা আগুন রয়েছে। এ আগুন পোড়ায় না কাউকে। তোমার শিউরে ওঠার কি আছে ! এ আগুনে ভাত-ডাল হয়। মানুষের বাঁচার খাবার তৈরি !

বেঁহুশ হয়ে পড়ে থাকা সমাধি থেকে নিজের মধ্যে ফিরে এসেছে কৃষ্ণভৈরব। উঠে বসেছে। চোখ দুটো এখনো তত স্বাভাবিক নয়। ঘুম ঘুম চোখে লালচে আভা। ঘোরও রয়েছে। একভাবে চেয়ে থাকতে পারছে না আগের মতো। মাঝে মাঝে চোখ বুজে থাকছে।

সুকেশী গালে হাত দিয়ে ঠায় বসে। চোখ নীলামোতির মুখে। এত কি দেখছে, ওই জানে।

সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল কৃষ্ণভৈরবের ওপর। গাইছে ভৈরব। চোখ বুজে বুজেই গাইছে। গলায় সুর আছে। মিষ্টি স্বর। মনে ভাব আছে। খালি গলার গান কত না সুরবাঁধা বাজনার সঙ্গে মিলে-মিশে কানে এসে বাজছে।

'এখনো কি ব্রহ্মময়ী
হয় নি মা তোর মনের মতো,
পতিত সন্তানে মাগো
যন্ত্রণা আর দিব কত।
ভুলাইয়া ভবে আনিলি,
বিষয় বিষ খাওয়াইলি,
বিষের জ্বালায় সদাই জ্বলি –
মা-মা বলে আর ডাকবো কত।'

ভেতরের আবহাওয়াটা পাল্টে গেছে! ডেরা যেন সুন্দর মন্দির হয়ে উঠেছে। শমশানে নেমে এসেছে দেবতাদের স্বর্গ। শমশানের এককোণে যে এই ডেরা, একবারও মনে হচ্ছে না। মাটির প্রতিমা নিষ্প্রাণ। জানে নীলামোতি। তবুও কালীমূর্তি বুঝি জীবন্ত হয়ে গেছে ভক্তের আকুল-আহবানে। হৃদয়ের ব্যথা উজাড় করা গানে কি? জলভরা চোখ! সত্যি?

সবার চোখে জল ঝরছে। কালীবৈষ্ণবী মাসীমা সুকেশী আর কৃষ্ণভৈরবের। নিজের জিভে নোনতা -নোনতা স্বাদ কিসের! নীলামোতির চমক ভেঙেছে। নিজের অগোচরেই দু'চোখের জল গাল বেয়ে ঠোঁট বেয়ে জিভ ভিজোচ্ছে। তাড়াতাড়ি চাঁপাশাড়ির আঁচলে চোখমুখ মুছে ফেলেছে। পাছে কেউ দেখে ফেলে। লজ্জায় পড়ে গেছে হৃদয়নাথ আর পুষ্পরানীর দিকে চোখ পড়তে। জলে ভেজা চোখে ওরা তাকিয়ে। নীলামোতির দৃষ্টি ফিরল অন্যখানে। বাইরে। মন চাইছে না আর আবদ্ধ হয়ে থাকতে ডেরার মধ্যে। ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে মায়ের কাছে, বাবার কাছে ঠাকুর্দার কাছে। ঠাকুর্দা এই গানটা বড় ভালোবাসত।

কত পুরনো দিনের পুরনো রেকর্ডের গান। মানদাসুন্দরীর রেকর্ড। খুব যত্ন করে রাখা। যখন বিষয়আশয়ের নানা ঝামেলার কথা শুনেছে ঠাকুর্দা মামাদের মুখে, তখুনি নীলামোতিকে ডেকে

বলেছে, নীল ! 'এখনো কি ব্রহ্মময়ী' গানটা বাজা তো ভাই। কখনো আবার বলেছে, তুই তো ভারী সুন্দর গাস—একেবারে রেকর্ডের মতো। আজ তুই-ই গা।

বড্ড আনমনা হয়ে পড়ছে নীলামোতি।

স্মৃতি—স্মৃতিই। সে তো অতীত। বর্তমানের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। ঘুম ভাঙা ভোর সকালে নিশিরাতের স্বপ্নের মতো। স্মৃতি নিয়ে জড়িয়ে থেকে লাভ নেই কোন। বরং বর্তমান নিয়ে থাকলে ভবিষ্যৎকে কাছে ফিরে পাওয়া যায়।

মাসীমার কথা কানে এলো।—আজ তাহলে উঠি আমরা। তোমার ওপর আর ভৈরবদার ওপর সমস্ত দায়দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি বৈষ্ণবীদি। যা করার করবে। নীলরা আমার ওখানেই থাকছে বোশেখের প্রথম সপ্তাহ অবধি। কাজ সেরে যাবে।

মাসীমার সিদ্ধান্তের ওপর কেউ কোন কথা কয় নি। গুরুজন, ভালোর জন্যই নিয়ে এসেছে। মাসীমাদের অনেক নাকি ভালোও করেছে এরা। পরিচয় অনেকদিনের, ঠগ-শঠ নয়। সাধক-সাধিকা। লোকের মঙ্গল চিন্তা আর নিজেদের ধ্যানধারণা চিন্তা নিয়েই থাকে এরা। ভোগলালসার কথাই ওঠে না দুজনেই বড় ঘরের। কৃষ্ণ-ভৈরব আবার বেশ লেখাপড়া জানা। ঘর ওদের বাঁধতে পারে নি। স্বেচ্ছায় সর্বত্যাগী এরা। শ্মশানবাসী সন্ন্যাসী। কালীবৈষ্ণবীর বিয়েও হয়েছে ধনীর ঘরে। স্বামীকে স্বামী বলে নিতে পারল কই ! সব পুরুষের মতো স্বামীও সন্তান। ও যে সকলের মা।

কালীবৈষ্ণবীর ক্রিয়াকলাপের বক্তব্যের ওপর খুব যে একটা বিশ্বাস জন্মেছে নীলামোতির, মোটেই নয়। তবে ওর জীবনযাপনের প্রণালী আর মাতৃত্বভাবের ওপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এসেছে। অনেক কিছু প্রশ্ন ছিল, শ্রদ্ধা এসে বাধা দিয়েছে।

সকলে উঠে পড়েছে। বেরিয়ে যাবে। সুকেশী আহ্লাদী মেয়ের মতো কাছে এসে জড়িয়ে ধরেছে।—আবার এসো দিদি ! ভুলো না, মনে রেখো।

দাঁড়িয়ে পড়েছে নীলামোতি। মুহূর্তের দেখায় মেয়েটা লোককে আপন করে নিতে পারে তো। চেয়ে রয়েছে। চাঁদনীরাতের এই মেয়ের আকাশেও কি তাড়া ক'রে মেঘ এসে পড়ে, সহসা বাদল ঝরে।

বাসুদেবের মুখখানা ভেসে উঠেছে! শাসানি মনে ঝড় তুলছে। সুকেশীকে আটকে রাখতে দেবে না এদের!

মুখ ফিরিয়েছে নীলামোতি। প্রশ্ন করেছে কালীবৈষ্ণবীকে। ব্যঙ্গের সুরে নয়, আবেদনের আদরে।—আপনারা তো অনেকের অনেক কিছু করেন। বাসুদেবের মতিগতিটা ফিরিয়ে দি না। যাতে না সুকেশী আর আপনাদের জ্বালাতে পারে ও।

একটু গম্ভীর হয়ে গেছে কালীবৈষ্ণবী।—অন্যায় কিছু বল নি মা। দিন কতক পরে আপনা হতেই ঠিক হয়ে যাবে। আগের চেয়ে হয়েছে অনেক। বিনা ক্রিয়াকলাপেই হয়েছে। ওর চিন্তায় মন দিই না আর তাই।

অপেক্ষার শেষ হয়েছে।

কেটেছে মাস তিনেক। এসেছে বোশেখ। সপ্তাহ পূর্ণ হতে আর মাত্র দুটো দিন বাকি। দুদিন হাতে থাকতেই ক্রিয়াকলাপ সেরে ফেলতে হবে। কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথি পাওয়া যাচ্ছে। শুধু তিথি নয়। আর্দ্রানক্ষত্রটাও। যেটার বিশেষ প্রয়োজন। যখন যোগাযোগ হয়, হঠাৎই হয়ে যায় এরকম। নীলামোতির ভাগ্য সুপ্রসন্ন। বারটাও মিলেছে এসে কেমন। মঙ্গলবার।

দেবতার পুজো শুরু গভীর রাতে।

ধারেকাছে থাকবে না কেউ। নিরালা-নিস্তব্ধে পুজোপাঠ। এ দেবতা অভিচার ক্রিয়ার। শত্রুনিধনের—মারণক্রিয়ার। বৈখানসআগম শাস্ত্রের মতে এ দেবতার মূর্তি তৈরি হবে একেবারে নিখুঁত। কোন ত্রুটি থাকলে সর্বনাশ। যে করেছে তার, যার জন্য করছে—তারও। এমন ঠাকুরের প্রচার কবে থেকে?

ঠিক ঠিক বলতে পারে না কেউ। অনেকে জানেই না। খুব গোপনে রাখা হত, পুজোও অতিগোপনে। দু'একজন, যারা খবরাখবর রাখবার চেষ্টা করে, বা সাধনা করে—তারা বলে, চোদ্দশ-পনেরোশ বছর ধরে হ'তে পারে। তার আগে—অনেক আগে থেকেও হ'তে পারে।

ঠাকুরের বনেদিয়ানার বর্ণনায় নীলামোতির দেখার কৌতূহল

জেগেছে প্রবল। বৈষ্ণবীকে ধরে ক'রে পড়েছে—একবারটি দেখাতে হবেই মূর্তিকে। কেমন!

বৈষ্ণবী বলেছে, পুজোর আগে অন্যকে দেখানো নিষেধ। তবে তোমার আগ্রহের জন্য দেখাচ্ছি। রাতে তো শ্মশানে আসতে পারবে না। আর রাত কাবারের আগেই তো বরাকর নদীতে বিসর্জন হয়ে যাবে। লোকচক্ষুর আড়ালে যেমন আবাহন, তেমনি লোকচক্ষুর আড়ালেই বিসর্জন।

নীল কাপড়ে ঢাকা দেয়া মূর্তি। কাপড় খুলতেই চমকে উঠেছে নীলামোতি।

অন্ধকার রাতে যদি কেউ হঠাৎ দেখে, আর কলিজা যদি কমজোরি হয়, তাহলে আর দেখতে হবে না। মা-বাবা বলে ডাকারও সময় পাবে না।

কমনীয়ভাবের লেশমাত্র নেই মূর্তির গড়নে। কপালের দিকে ড্যাবরা ড্যাবরা দু'চোখ তোলা। ঊর্ধ্বদৃষ্টি। ধোঁয়াটে রঙ গায়ের। পরনে বিচ্ছিরি করে একটা নীলকাপড় পরানো। শতভাঁজ, তাও আবার হাঁটুর ওপরে। মুখখানা ভীষণ লম্বাটে। দুটো ঠোঁটই রাক্ষুসে ঠোঁট। কি পুরু!

দেবতা না বলে রাক্ষস নাম দিলেই তো ভালো।

জিভ কেটে নাক-কান ম'লে বৈষ্ণবী বলেছে, বিষ্ণু বিষ্ণু বিষ্ণু। জয় অভিচারী বিষ্ণু।

নীলামোতির দিকে ফিরে বলেছে, একথা মুখে আনতে নেই মা। ইনি যে বিষ্ণু। ইনি শত্রুনাশে নেমেছেন বলে, রুদ্রমূর্তি। তমোভাব। এখানে বিষ্ণু পালনের কর্তা নয়, লয়ের।

কেন—চণ্ডীপাঠ-ব্যাখ্যা শোনোনি কোনদিন!

নীলামোতির মুখের উত্তর কেড়ে নিয়ে মাসিমা বলেছে, শুনবে না আবার কেন! বাড়িতে যা হবে যখন, পাটিপেতে বসে বসে শোনা চাই মেয়ের। বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত। তারপর প্রশ্নের তুফান। যত রাজ্যের একটার পর একটা। এটা কেন হল? এ কি সত্যি সম্ভব···? এমনতরই স্বভাব ওর।

বৈষ্ণবী বলেছে, যখন নেই তারা, নেই চন্দ্র, নেই সূর্য—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই তখন—প্রলয়ের পর, প্রলয়ের

জলে অনন্তশয্যায় শুয়ে ঘুমিয়ে বিষ্ণু। বিষ্ণু থেকেই যাদের সৃষ্টি, সেই দুর্দান্ত মধু-কৈটভই বিষ্ণুকে গ্রাস করার জন্য উঠিপড়ি লেগে গেল।

মহাশক্তি বিষ্ণুর দেহে চেতনা শক্তি দিয়ে জাগিয়ে তুলেছেন। বধ করিয়েছেন মধুকৈটভকে। সে বিষ্ণুর কি বিশ্ববিমোহন রূপ। এমন কদাকুৎসিত কি ?

না কাজ বিশেষে সময় বিশেষে রূপের তারতম্য। দুর্গামূর্তিতে কালীমূর্তিতে তফাৎ নয় ? কালী আর কমলা কি এক রকমের ?

নীলামোতির মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। মূর্তির মর্ম যেমন বোঝে তেমনই বিশ্বাসও যে করে, তাও নয়। মুক্তেশ্বরানন্দের কাছে একবার আলোচনা হয়। মুক্তেশ্বরানন্দ বলেছে, মূর্তি মানুষের ভেতরের সৎ ছবি! ছবি দেখে নিজেকে জানা-চেনা। কিভাবে নিজেকে সৎ করে গড়ে তোলা যায়, সেই ইঙ্গিতই ছড়ানো।

এ ব্যাখ্যা ভালো লেগেছে নীলামোতির। যুক্তি আছে তবু। সময়ে সময়ে নিজের কাছে নিজেকেই নীলামোতির এক আশ্চর্য ধরনের মানুষ মনে হয়। দুটো মনের তো নিশ্চয়ই। ঠাকুর দেবতা আর ক্রিয়াকলাপে বিশ্বাস নেই। অথচ যার মুখে যেখানে অদ্ভুত ঘটনার কথা শুনবে, দৌড়ে যাবে। কেন অমন হয় তার, কেন—কেন ? এটা কি জলে ডোবা মানুষের পাতালপুরীর অন্ধকার রাজ্যে হাতড়ে বেড়ানো। অভিষ্ট পূরণে মোর / মিলিলেও মিলিতে পারে কভু অরূপরতন।

কথায় কথায় বেলা ঘুমিয়ে পড়েছে কখন। সাঁঝের প্রদীপ জ্বলে উঠেছে মাটির পিলসুজে, কালীপ্রতিমার সামনে। শাড়ির আঁচল গলায় দিয়ে পঞ্চমুখী শাঁখ বাজিয়েছে সুকেশী। এক দুই তিন চার—তিনবারই বাজায় জানে নীলামোতি। পাঁচবার শোনে নি কখনো। প্রথম শুনল।

কৃষ্ণভৈরব বলেছে, মঙ্গলধ্বনিতে পঞ্চশক্তিকে প্রণাম জানানো এটা। আর ওদের জয়ধ্বনি করা। মাটি জল আলো বাতাস—মানুষের প্রাণ এরা। মানুষের শক্তি এরা। এই চারশক্তি যে শক্তি বা চারশক্তিকে নিয়ে যে শক্তি—সে মহাশক্তি। মাটি জল আলো বাতাস আর মহাশক্তি—পঞ্চশক্তি।

নতুন কথা শুনেছে নীলামোতি কৃষ্ণভৈরবের কাছ থেকে। কৃষ্ণ-ভৈরব রাত দুটোয় অভিচারী বিষ্ণুর পুজোয় বসবে শ্মশানে। ওই সময়ে যদি জেগে থাকে বা জেগে ওঠে নীলামোতি, মন্ত্র বলে দিচ্ছে—জপ করে যেন যতক্ষণ পারে। ওঁ বিষ্ণোর্দেহে মহাশক্তি আগচ্ছ আগচ্ছ·····তিষ্ঠ তিষ্ঠ তিষ্ঠ···। বিষ্ণুর দেহে মহাশক্তির আবির্ভাব হোক অধিষ্ঠান হোক···।

ভালো ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছে কৃষ্ণভৈরব। যার ইচ্ছাপূরণের আর মঙ্গলের ক্রিয়াকলাপ এক মনে করবে সাধক, তারও উচিত মনের দরজা খুলে রাখা, যাতে সাধকের প্রার্থনা অনায়াসে প্রবেশ করতে পারে। দরজা খুলেই রাখা মন্ত্র জপ। মনকে ধরে রাখা একটা ভাবধারার মধ্যে।

এ ব্যাপারে সায় দিয়েছে নীলামোতির মন।

মাসিমার সঙ্গে উঠে পড়েছে। বাড়ি যাবে। হৃদয়নাথ আর পুষ্পরানী এবারে আসেনি ওদের সঙ্গে। আসেনি নিজে থেকে নয়! নীলামোতি আনে নি। বারণ করেছে। হৃদয়নাথের জ্বরভাব। পুষ্পরানীকে থাকতে হবে কাছে।

শ্মশানের সীমানা ছাড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে ওরা। রিকশা অপেক্ষা করছিল। উঠে বসেছে দু'জনে। পরপোকারী মাসি আর আদরের বোনঝি। মূর্তিমান বাসুদেব একদঙ্গল ছেলে নিয়ে এসে হাজির। একেবারে সামনাসামনি।—বলুন সুকেশীকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে। বাজপড়া আওয়াজে চিৎকার ক'রে বলছে বাসুদেব।

ওদিকে ডেরার বাইরে ওরা তিনজনে দাঁড়িয়ে। কৃষ্ণভৈরব কালী-বৈষ্ণবী সুকেশী।

ওদের দিকে আড়চোখে দেখছে আর তর্জন-গর্জন করছে বাসুদেব।—আজ একটা হেস্তনেস্ত ক'রে তবে যাবো। ওই ঘুঘুর বাসা পুড়িয়ে জ্বালিয়ে দিয়ে যাবো। আস্ত রেখে যাবো না কাউকে।

দলের ছেলেদের হম্বিতম্বি দেখে, নীলামোতি তাজ্জব। এদের কেউই প্রকৃতিস্থ নয়। এমনকি বাসুদেবও। রিকশা ঘিরে রেখে যত আক্রোশ দেখানো যত আস্ফালন করা।—যতক্ষণ না সুকেশী আসবে, এদেরও যেতে দিচ্ছি না।

কালীবৈষ্ণবী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাগে ফুলছে। মাঝে মাঝে চিৎকার

করে উঠছে ভীষণ।—যা করবি আমাদের সঙ্গে বোঝাপড়া কর। সাহস থাকে তো এগিয়ে আয়। মরণ বাড় বেড়েছে তোর। শিগ্‌গীর রিকশা ছেড়ে দে বলছি! ছেড়ে দে, ছেড়ে দে।

উঁহু বাবা! মোকা পেয়েছি এবার। ছাড়বো না। সুকেশী না আসা পর্যন্ত ছাড়বো না! ছাড়বো না ছাড়বো না ছাড়বো না।

কি হ'ল কে জানে। ছুটে চলে গেল বৈষ্ণবী ডেরার ভেতর। বলির খাঁড়া হাতে বেরিয়ে এসেছে। শান্ত সুন্দর চেহারার মানুষটা কি ভয়ংকর হয়ে উঠেছে, চোখে দেখা যায় না। অতবড়ো ধারালো খাঁড়াটা ঘোরাতে ঘোরাতে দৌড়নোর মতোই এগিয়ে আসছে। এত শক্তি এত সাহস হ'ল কি ক'রে! এই বয়সে।

নীলামোতি অবাক চোখে দেখছে। মনে হচ্ছে না কালীবৈষ্ণবী। ধুলোয় জটা লুটোচ্ছে। প্রায় বিবসনা বললেই হয়। দু'চোখ রক্ত-জবা। ঠেলে বেরিয়ে আসছে। এক একটাকে গিলে খাবে বুঝি ওই চোখ! কে এ! মাটির মাকালী কি জ্যান্ত হয়ে অসুর বধে এগিয়ে আসছে!

কালীবৈষ্ণবীর রণচণ্ডী মূর্তি দেখে প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারল, ছুটে পালাল। কোন খেয়াল নেই বৈষ্ণবীর। তাড়া করছে, যাকে নজরে পড়ছে। এক ঘটি জল নিয়ে দৌড়ে এসেছে কৃষ্ণভৈরব। বৈষ্ণবীর পায়ে ঢেলে, সামনে এগিয়ে গিয়ে জোড় হাত ক'রে বলেছে, মা! শান্ত হও, শান্ত হও!

থমকেছে বৈষ্ণবী। হাত থেকে খাঁড়া নিয়ে নিয়েছে কৃষ্ণভৈরবী। খানিক চুপচাপ একভাবে পাথর মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল বৈষ্ণবী। তারপর জোরে নিঃশ্বাস ফেলল একটা।

তারপর চনমন করে তাকিয়েছে চতুর্দিকে! ছুটে চলে গেছে ডেরার ভেতর। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। বেরিয়ে এসেছে হাসতে হাসতে।

প্রাণখোলা হাসি হাসছে বৈষ্ণবী।

একি বিস্ময়! মানুষটার চেহারা আবার বদলেছে! নির্লিপ্ত-নির্বিকার সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিনীর চেহারা। ওকে দেখছে একদৃষ্টে নীলামোতি। বৈষ্ণবীর পেছনে আগুনের শিখা উঁকি মারছে না?

হ্যাঁ, জ্বলে উঠেছে খড়কুটো আর টুকরোটাকরা ভাঙা-চোরা ইট পাথরের ডেরা।

বৈষ্ণবীর কিন্তু হাসি থামেনি। আকাশের দিকে তাকিয়ে হাসছে। কি দেখছে ও, কাকে দেখছে! কার সঙ্গে এত হাসাহাসি!

বৈষ্ণবীকে আগুনের গ্রাস থেকে বাঁচানোর জন্য দৌড়েছে কৃষ্ণ-ভৈরব। দৌড়েছে সুকেশীও।

রিকশায় বসে থাকতে পারল না নীলামোতি। লাফিয়ে নেমে পড়েছে। ছুটছে। আগুনের লকলকে শিখা এগিয়ে আসছে। বৈষ্ণবীর শাড়ির আঁচল ছুঁয়ে ফেলল নাকি!

শেষ পর্যন্ত অগ্নিদেবের মনস্কামনা পূর্ণ হয় নি। হতে দেয় নি কৃষ্ণভৈরব আর সুকেশী। ওদের প্রাণপণ চেষ্টায় নিষ্ঠুর আর লোভী আগুনের সর্বগ্রাসী খিদের খোরাক হতে আর হয় নি বৈষ্ণবীকে। শাড়ির আঁচল ছোঁয়ার ঠিক আগের আগের মুহূর্তেই বৈষ্ণবীকে সরিয়ে আনতে পেরেছে। খুব তাড়াতাড়ি পড়িমরি করে শ্মশান এলাকার বাইরে নিয়ে এসেছে একদম। অজ্ঞান হয়ে পড়েছে বৈষ্ণবী।

নীলামোতি স্বপ্নে দেখা জাহাজ জ্বলেপুড়ে শেষ হয়ে গেছে এইভাবে। এরপর আর কোনদিন দেখেনি নীলামোতি কৃষ্ণভৈরবকে। না শ্মশানে না রাস্তাঘাটে না অন্য কোন জায়গায়। বৈষ্ণবী-সুকেশীকে না। বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছে ওখান থেকে। মাসিমার চোখের জলের ছবিটাই ভেসেছে চোখে। পথে গাড়িতে ট্রেনে।

কোত্থেকে আগুনের হলকার ঝাপটা এসে লাগছে নীলামোতির চোখে মুখে!

চমক ভেঙেছে নীলামোতির। নিতুমার পুজোমণ্ডপে হোমের আগুন জ্বলে উঠেছে আবার। এবারের আগুনের তেজতাপ অনেক গুণ বেশী আগের তুলনায়। ওপর দিকে উঠেছেও অনেকখানি। বসে হোম করছে নিতুমা। নিতুমার পেট বুক মাথা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। নিতুমার হেলদোল নেই কোন। যারা বসেছিল, সকলেই বেশ খানিকটা করে সরে সরে বসেছে। নীলামোতি সরতে গিয়েই চক্ষুস্থির। পাশে

মড়ার মতো পড়ে রয়েছে পরবেশ। নিরাময় সাধু ওর বুকের ওপর হাত রেখে কড়গুনে জপ করছে। পরবেশের বোজা চোখে নিরাময়-সাধুর চোখ আটকানো। বোধ হয় চৈতন্য ফিরিয়ে আনার ক্রিয়া। নিরাময়ের পাশে বসে হৃদয়নাথ। জবুথবু। হৃদয়নাথের বাঁদিকে জল ভরতি মাটির কলসী। পাত্রসায়রের শ্মশানে ক্রিয়াকলাপ সেরে সানিপুকুরের জল নিয়ে ফিরে এসেছে ওরা এতক্ষণে।

নীলামোতির দ্বিতীয় জাহাজ এমন টলমল করে উঠল কেন? নিরাপদ নির্ভয় আশ্রয়ে কি বিপদ ভয়ের সূচনা এটা। স্বপ্নের জাহাজে কোন পরিণতিতে পেঁছুতে হয় নি তাকে। তার আগে চোখের পাতার ঘুম সরেছে। ভোরের আলো ঘর ছড়িয়েছে। মুখে ছড়িয়েছে।

যে উদ্দেশ্যে নিতুমার পুজো মণ্ডপে আসা, সত্যি সত্যিই সিদ্ধ হবে কি? নীলামোতি স্বকর্ণে যা শুনল, আশা খুবই কম। বিজয়বালাকে ইশারায় কাছে এনে বলেছে নিরাময়। খুব হুঁশিয়ার। যে কোন প্রকারে নীলামোতির মন ফেরাতেই হবে। মনে থাকে যেন। পুষ্পরানী আর হৃদয়নাথের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। পুষ্পরানীর কাছ থেকে হৃদয়নাথকে কেড়ে নেবার কি ফন্দিফিকির।

গলা নামিয়েই বলছে নিরাময়। আরো একটু নামিয়ে নরমসুরে বলতে শুরু করেছে। আমি জানি, ওই নষ্ট-দুষ্ট ছেলেটাই সবের মূল। বেহায়া-বেসরম। ভদ্রঘরে একটা মানইজ্জত বলে যে কথা আছে সেটা ওর মগজে ঢোকে না। ঢোকে নাই বা বলা যায় কেমন করে! সবই বোঝে সবই জানে। ইচ্ছে করে ঘর ভাঙাবার মতলব। নীলামোতিরও বোঝা উচিত ছিল, তা নয়। 'অবন-অবন' ক'রে পাগল একেবারে। মা-বাপহারা যে তার ব্যথা কারই বা বুকে বাজে! হ্যাঁ, কারো বুকে বাজে না। যত বাজে নীলামোতির বুকে। অদৃষ্টে দুর্ভোগ আছে ওর অনেক। ধড়িবাজ মেয়ে। স্বামীর মনকে নিজের দিকে টেনে রাখার অনবরত চেষ্টা। স্বামী মুঠোয় থাকলে ওর যে মস্ত সুবিধে।

এখানে এমনভাবে বলা কেন? আস্তে বলার ছলে নীলামোতি যাতে শুনতে পায়, সেইরকম স্বরেই তো বলে গেল নিরাময়। শেষ

ধাক্কা দিতেও কসুর করল না। পুষ্পরানীর সঙ্গে হৃদয়নাথের বিয়ের ব্যাপারে নিজেই উদ্যোগী হওয়ার মধ্যে বদ মতলব কাজ করেছে ওর খুব ঠাণ্ডা মাথায়। নিজে সাধু সেজে পার পেয়ে যাবে!

ধরণী তুমি দ্বিধাবিভক্ত হও! সীতার মতো পাতাল প্রবেশ করুক নীলামোতি! মানুষ যতদিন বাঁচে, ততদিন তার শিক্ষা, তার অভিজ্ঞতা। দেনাপাওনার মিটমাট না হলে, মুক্তি পাবে কেমন করে নীলামোতি! এ সমস্ত অপবাদ পাওনা ছিল যে তার।

পাত্রসায়রে না এলে, নিতুমার এ পুজোর মণ্ডপে না এলে—এ জ্ঞান হ'ত না তার। এবারে সঙ্গে আসতে চায় নি পুষ্পরানী। তখুনি মনে খটকা লেগেছে নীলামোতির। আসার কদিন আগে থেকেই লক্ষ্য করেছে, সদাসর্বদা বিরক্ত পুষ্পরানী। কোন কিছু বলতে গেলেই, মারমুখী হয়ে উঠছে। বিশেষ ক'রে নীলামোতির ওপর।

নীলামোতি এতদিন হৃদয়নাথ আর পুষ্পরানীর জন্য যা করেছে, সমস্ত বৃথা। ভস্মে ঘি ঢালা। ওদের দুজনের মন মেনে নেয় নি তাকে কখনো কোনদিন। এখন এক একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। সে সবের অর্থ আজ অন্যরকম হয়ে উঠছে। তখন সরল-হাসির বাঁধনে দেবতার প্রসাদীফুলের কথার মালা ভেবে গলায় পরেছিল নীলামোতি। এখন দেখা যাচ্ছে, ভুল—সব ভুল। সরলহাসি নয়, ওটা ব্যঙ্গবিদ্রূপের। ওদের কথা দেবতার প্রসাদীফুল নয়, বিষবৃক্ষের বিষফুল।

অবন এসেছে বাইরে থেকে। আনন্দ সংবাদ শোনাতে এসেছে। নীলাবৌদির আশীর্বাদেই ব্যবসায় বেশ উন্নতি করেছে। ভেতরে আসে নি, বাইরের জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা কয়েছে। ওর অনুরোধে নীলামোতি লোহার রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে আস্তে আস্তে দুহাত বাড়িয়ে দিয়েছে। পকেট থেকে সোনার বালা জোড়াটা বার ক'রে খুব যত্নে হাতে পরিয়ে দিয়েছে অবন। বলেছে সজল চোখে, আমার কত ইচ্ছে ছিল, কবে তোমার হাতে পরিয়ে দিতে পারবো নিজে।

ঘরে ঢুকছে পুষ্পরানী আর হৃদয়নাথ। হৃদয়নাথকে পুষ্পরানীই ডেকে নিয়ে এসেছে। হাসতে-হাসতে হৃদয়নাথের গায়ে ঢলে পড়ে

বলেছে পুষ্পরানী।—আপন চেয়ে পর ভালো, পর চেয়ে বন ভালো। অদৃষ্টে থাকিলে সোনা, কাকে আনি দেয়। আমার পোড়া অদৃষ্ট, তার ওপর ভোঁদা স্বামী। কোন সুখ-আহ্লাদের যোগাযোগও দেখছি না।

লজ্জায় ফর্সামুখ রাঙা হয়ে উঠেছে অবনের। একদণ্ড দাঁড়ায় নি আর। ছুটে পালিয়ে বেঁচেছে।

মুচকি হেসে হৃদয়নাথ বলেছে, আসল মানুষকে চায় কে বল আর! পাওনা-থোওনাটাই বড় হয়ে দেখা দেয় লোকের চোখে। বড়বৌ ধরেছে অবনকে। ছোটবৌ না হয় একজন তপন-গগন-পবন —যাকে হোক ধরলেই তো হয়। নীলার হাতে সোনার বালা, পুষ্পের হাতে জড়োয়ার বালা উঠবে খন।

ওদের হাসির সঙ্গে যোগ দিয়েছে নীলামোতিও। অবন সকলের কাছে পেয়েছে লাঞ্ছনা-অবহেলা। চাকরি পাচ্ছে না হন্যে হয়ে রোদ-জল মাথায় করে ঘুরে ঘুরেও। ব্যবসায় মাথা। পয়সার অভাবে হবে না। নিরর্থক ভাবনা। মনস্থ করেছে, বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই আর।

লক্ষ্মীমূর্তিতে নীলামোতি এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। জামার ভেতর থেকে লুকিয়ে আনা বালা দুটো বার ক'রে হাতে তুলে দিতে গেছে। দুচোখে হাতচাপা দিয়ে কেঁদেছে অবন। বৌদি! আমি নিতে পারবো না। পারবো না কিছুতেই। বেরোতে যাচ্ছে ঘর থেকে, দরজা আগলেছে নীলামোতি।—মা এসে দিলে, এইভাবে অপমান ক'রে ফেরাতে পারতে?

একি আঘাত হানল নীলাবৌদি! মুখ তুলে তাকিয়েছে অবন। নীলামোতির চোখের কানায় টলটলে জল, দুলছে। ঝরে পড়ে বুঝি এবার।

অবন নিজের অগোচরেই দু'হাত পেতে নতজানু হয়ে বসে পড়েছে। ওই জলভরা দুটি চোখে তার মৃতমায়ের স্নেহমাখা চোখের নির্দেশ উঁকি মারছে যে।

বালা বেচে ব্যবসা করতে বলেছে নীলামোতি। অবন প্রাণধরে খোয়াতে চায় নি। রেখেছে বন্ধক। ব্যবসার লাভে ছাড়িয়ে এনে পরিয়ে দিয়েছে।

পুষ্পরানীর টিকাটিপ্পনী কাটার ভয়ে বাড়িতে আর প্রবেশ করে না অবন। যখন আসে, ওই শ্যামবাজারের বাড়ির জানালার ধারেই আসে। দেখা ক'রে দে ছুট।

নীলামোতির বরাবরের অভ্যেস এক ঘরে গান গাওয়া। কখনো গুনগুন ক'রে, কখনো আবার গলা ছেড়ে।

কোন বিষয়ে হুতো খুঁজলে, হুতো সামনে নাকি এগিয়ে আসে। নীলামোতির বেলায়ও হুতো সন্ধানীরা নানা অজুহাতে খুঁজে পায় নীলামোতিকে ঘিরে, রঙ্গতামাশা করার। নিজেরা জ্বলে ওঠে বলেই ওকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক ক'রে ফেলার ত্রুটি করে না কম।

অন্য কারো তরফ থেকে নয়। পুষ্পরানীর তরফ থেকেই অগ্নি-বাণের নিক্ষেপ প্রায়ই। নীলামোতির ভেতরে কি জ্বলে ওঠে সত্যি? জ্বলুনির কোন চিহ্নই তো প্রকাশ পায় না নীলামোতির চোখেমুখে। বরং চাঁদশীতল ঝরনার ধারা নামে চোথ-মুখের ঠাণ্ডা হাসিতে।

মুখ ঘুরিয়ে নেয় পুষ্পরানী।

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে, চাবির থোলো বাঁধা শাড়ির আঁচলটা খসে পড়ে টেবিলের ওপর। আঁচল টানার ধকল সইতে পারে না জলভরতি কাঁচের গেলাস। টেবিল থেকে গড়িয়ে পড়ে মেঝেয়। ভেঙে খানখান।

সেদিন সকালে গাইছে নীলামোতি।—'আজ সকালে নয়ন মেলে, তোমার দেখা পাইনে বলে, দিন যে আমার কেঁদেই গেল··· ।'

মানিকজোড় একসঙ্গেই ঢুকেছে ঘরে। ঘর কাঁপিয়ে জোরে হেসে উঠেছে দু'জনে। হাততালি দিয়ে বলেছে পুষ্পরানী, এনকোর এনকোর। অত ভাবো কেন দিদি? অবনঠাকুরপো আসবেই। সব ছাড়তে পারবে, সব ভুলতে পারবে। তোমাকে? না না না। অসংখ্য 'না' তার মুখ থেকে বেরোবে আর তোমার কানে বাজবে।

এসবে কোন কানই দিত না নীলামোতি, দেয়ওনি। দিতে চায়ও নি। হেসে উড়িয়ে দিয়েছে সমস্ত। পুষ্পর অনেক জ্বালা। বিয়ের জীবন খুব সুখের হয়নি। অবিশ্যি প্রথম বিয়ের।

সকলেরই অগাধ বিশ্বাস ছিল, প্রজাপতির নির্বন্ধ ওই একজনের সঙ্গেই। বিধাতার বিধিলিপিতে এইটাই রয়েছে। এলেখা কেউ মুছতে পারবে না কিছুতেই। বিধাতা স্বয়ং এসেও না।

বিয়ের সব ঠিকঠাক, মায় পাকাদেখাও হয়ে গেছে দু'পক্ষের। বেশ ধুমধামে ঘটা ক'রে। বিয়েরই উৎসব বাড়িতে। এলাহি কাণ্ড। মান্যগণ্যরা এসেছে। এসেছে নিকট আর দূরসম্পর্কের জ্ঞাতি-স্বজনেরাও। রাতভোর ভোজ। আর মাস পাঁচেক বাদে বর-কনের শুভপরিণয়। হৃদয়নাথ আর পুষ্পরানীর চারচোখের শুভদৃষ্টির মিলনলগ্ন। ওই দিনটির আশায় বুক বেঁধে আনন্দ ভেতরে ভরে নিয়ে বিদায় নিয়েছে। হাসিমুখে সকলে।

কথায় বলে, হাকিম টলে তো হুকুম টলে না। কিন্তু টলে, বিধাতার বিধান টলে। টলল পুষ্পরানীর বেলায়। মানুষের বুদ্ধি মানুষের ধারণাই জয়ী হ'ল বিধাতার বিধানকে সরিয়ে দিয়ে, হারিয়ে দিয়ে। নাটকের গুরু গুরুদেব মুক্তেশ্বরানন্দের মুখের কথায়। তাও একটিমাত্র কথা। না।

মুক্তেশ্বরানন্দের কাছে দীক্ষা নিয়েছে তিন বাড়িই। নীলা-মোতিদের বাড়ি পুষ্পরানীদের বাড়ি আর হৃদয়নাথদের। ভগবানের আসনে বসিয়ে তিনবাড়ির লোকেরাই অন্তরের ভক্তিশ্রদ্ধার অঞ্জলি দেয় ওকে। ওর আদেশ উপদেশ ঈশ্বরেরই। শিরোধার্য না করে অন্য কোন পন্থা নেই কারো। আর তাছাড়া না মানার কোন কথাই ওঠে না। এ চিন্তাধারা কারো মাথায় বয় না কখনো। অমান্য, ভাবাই যায় না।

হৃষিকেশে মুক্তেশ্বরানন্দের আশ্রমে গেছে সবাই। গুরুদেবের জন্মতিথি। মহাসমারোহে উৎসব চলেছে। ভিড়ে ভিড়, গুরু-প্রণাম করছে সকলে এক এক করে। বেদির ওপর বাঘছালের আসনে বসে গুরুদেব। প্রত্যেকের মাথায় মঙ্গল-হাতের স্পর্শে মঙ্গল-আশীর্বাদ ক'রে যাচ্ছে হাসিমুখে। কোন ক্লান্তি নেই দিব্যজ্যোতি পুরুষের শরীরের কোথাও।

এসেছে শাশুড়ি। প্রণাম সেরে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। পাশে নীলামোতি। চিবুক ধরে আদর ক'রে বলেছে, আহা-হা। এ যে সাক্ষাৎ পার্বতীর মুখ! কত জন্মের সুকর্মের ফলে কার ঘর আলো করা বৌমা হবে মা জননী আমার।

কথাটা লুফে নিয়েই বলেছে মুক্তেশ্বরানন্দ, কার আবার! তোর ঘরের বৌমা হবে রে পাগলি! তোর ঘরের।

আমার !

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

চারজনের কোনজনের এমন ভাগ্য বাবা ?

বড়জনের—হৃদয়নাথের। ওর পূর্বজন্মের স্ত্রী নীলামোতি। ওদের দু'জনের বিয়ে রুখতে পারবে না কেউ। না দেবতা না গন্ধর্ব না যক্ষ না মর্ত পাতালের কেউ। আমার আদেশ, এর পরের প্রথম বিয়ের তারিখেই ওদের বিয়ে দিতে হবে। আমি উপস্থিত থাকবো। আমার সামনেই সব কিছু সম্পন্ন করতে হবে।

গুরুদেব আনমনা হয়ে গেল হঠাৎ। একটু বিমর্ষ। পরেই হাসি ফুটে উঠল মুখে। আর এক মুহূর্ত বসে থাকেনি। আসন ছেড়ে উঠে পড়েছে তাড়াতাড়ি। সটান ভেতরের ঘরে চলে গেছে।

স্তব্ধ পাথর শুধু শাশুড়িই হয় নি একমাত্র, হয়েছে উপস্থিত সবাই। পুষ্পরানীর দিকে চাইতে পারছে না নীলামোতি। বড় কষ্ট হচ্ছে। ওর মুখখানা কেমন হয়ে গেছে নিমেষে। কালচে—সুন্দর মুখে কালির পোঁচ বুলিয়ে দিয়েছে যেন কে !

নীলামোতি যে জানে সমস্ত। নীলামোতি কেন—পাড়াঘরের সকলে। ওদের পরস্পরের ওপর আকর্ষণ এত বেশী যে ছাড়াছাড়ি হলে, কারো জীবন সংশয় না হয়ে পড়ে। সেই চিন্তা সেই ভয় নীলামোতির। সত্যিকারের অপমৃত্যু হতে চলেছে এ যে! একি হৃদয়হীন-নির্মম আদেশ গুরুদেবের। নীলামোতিও কি এতে সুখী হবে ? না, না। হবে না। হতে পারে না। মত ঘোরাতে হবে গুরুদেবকে ধরে ক'রে।

গুরুদেব আনমনা হ'লে গম্ভীর হ'লে ধারে কাছে ঘেঁষার সাধ্যি নেই কারো। নীলামোতি বরাবরই বেপরোয়া। গুরুজন-প্রিয়জন-কারো নিষেধ মানে নি। আদেশ-উপদেশ কানে নেয় নি। ঢুকেছে মুক্তেশ্বরানন্দের ঘরে। কেঁদে আছড়ে পড়েছে পায়ের ওপর।—গুরুদেব দয়া করুন। পুষ্পর মুখ চেয়ে আদেশ ফিরিয়ে নিন।

কোন জবাব দেয় নি গুরুদেব। যতবার চোখ পড়েছে নীলা-মোতির চোখে, ততবার হেসে উঠেছে। শেষে হাসি আর থামে নি। হাসতে হাসতে কম্বলপাতা বিছানায় গড়াগড়ি। বাচ্চা ছেলের মতো।

হাসি দেখে নীলামোতি ধরে নিয়েছিল গুরুদেব বোধ হয় রগড়

করেছে। আদেশ ফিরিয়ে নেবে নিশ্চয়। ধারণা কিন্তু বেঠিকই হয়েছে নীলামোতির। নীলামোতির সঙ্গেই হৃদয়নাথের বিয়ে হয়ে গেল।

পুষ্পরানীর বাবা জেদ করেই অন্য পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে খুব তাড়াতাড়ি। পুষ্পরানীর ইচ্ছের বিরুদ্ধেই দিয়েছে। বিয়ে না ক'রে বসে থাকলে তো আর চলে না। হৃদয়নাথ যখন জীবনে ফিরে আসবে না আর। তখন মিথ্যে হা-হুতাশ। আহাম্মক কিনা। ওকে দেখিয়ে দিতে হবে, রূপ আর রুপিয়া থাকলে, তোমার চেয়ে অনেক গুণ ভালো পাত্রই পাওয়া যায়।

বাইরে ভালো হলেও ভেতরে কার কি, হলপ ক'রে ঠিক-ঠিক বলতে পারে কেউ?

পুষ্পরানীর বাবার অহঙ্কার থাকে নি। গোলাপের বদলে শিমুলে হাত রেখেছে ভুল ক'রে। একদিনের জন্যও চোখের জল না ফেলে স্বামীর ভাত পেটে যায় নি পুষ্পর। কোন অনুরোধ কোন অভিমান কোন আব্দারই গ্রাহ্য করে নি স্বামী। যেমন উদ্ধত তেমনি অবুঝ। তেমনি নেশায় বুঁদ আর অসৎ-সঙ্গ বিলাসী।

কতদিন এসে নীলমোতিকে জানিয়েছে পুষ্প তার অসুখী মনের ব্যথাবেদনার কাহিনী। ওর চোখের জলে নীলামোতির চোখও জলে ভেসেছে। হৃদয়নাথকে বলেছে, ওকে একটু সান্ত্বনা দাও, একটু বোঝাও। তুমি ওর অ তপ্রিয়, নিশ্চয় এসময় তোমার সহানুভূতি ওর প্রধান কাম্য।

একা পেলে হৃদয়নাথকে বলেছে, এমন কি হয় না—পুষ্পর সঙ্গে তোমার বিয়ে দেয়া যায় আবার? জোরে হেসে উঠেছে হৃদয়নাথ।—তা কেমন করে হয়।

কেন—আগের দিনে দু-তিনটে স্ত্রী তো থাকতো।

পুষ্পর বিয়ে হয়েছে, স্বামী বর্তমান—এটাও মগজে নেই তোমার?

বর্তমান থাকে নি বেশীদিন পুষ্পর স্বামী। দেহের যত্ন নেয়নি কোনদিন। অনিয়ম-অত্যাচারে জর্জর করে তুলেছে। দেহও ক্ষমা করে নি, নিয়েছে চরম প্রতিশোধ। মৃত্যুর দ্বারে নিয়ে গিয়ে পেঁাছে দিয়েছে।

পুষ্পের বরাত ভাঙল, না বন্দীদশা ঘুচে মুক্ত বিহঙ্গের মতো মুক্ত হ'ল? পুষ্পের মনের মণিকোঠায় এর জবাব মৌন হয়ে রয়েছে। একমাত্র পুষ্পই এর উত্তর দিতে। আর কেউ নয়।

অপয়া হতভাগিনী পুষ্পের জন্য বংশের আদুরে দুলালকে হারাতে হ'ল। সাক্ষাৎ সর্বনেশে কালকে কে ঘরে পুষে আরো সর্বনাশ ডেকে আনবে! শ্বশুর বাড়িতে গুঞ্জনে-গুঞ্জনে ছয়লাপ।

চোখের জলে প্রবেশ যেমন, তেমনি চোখের জলেই প্রস্থান হয়েছে পুষ্পের শ্বশুর বাড়ি থেকে।

কাছাকাছি বাড়ি দু'জনের। নীলামোতিদের চৌমাথায় আর পুষ্পদের আর একটু ভেতরে। একজনের শ্বশুর বাড়ি, অন্যের বাপের। রোজ বিকেলে জ্বালা জুড়োতে আর অন্যমনস্ক হতে আসে পুষ্প নীলামোতির কাছে। ওসময় বাড়ি ফেরে হৃদয়নাথ। গল্পগুজবে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নামে। পুষ্পকে একা ছেড়ে দিতে নারাজ নীলামোতি। অগত্যা নীলামোতিরই জোরজবরদস্তিতে পুষ্পকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে হয় হৃদয়নাথের।

পূর্বের ভাবভালোবাসা মরে নি, চাপা ছিল। ফল্গুনদী বইছিল, এখন জেগে উঠেছে ক্রমে। বর্ষার দুকূল ছাপিয়ে উঠি উঠি। হাসি-চাউনি চালচলন কথাবার্তায় সকলের নজরে পড়েছে। নীলামোতির তো সবার আগে লক্ষ্যে এসেছে। এতে নীলামোতি খুশি! ভেতরে ভেতরে চেষ্টা করছে, কাকে ধরে কি ক'রে বিয়েটা ঘটানো যায়। বিয়ে হলে, ওরা দু'জনে সুখী হবে। আর সত্যি কথা বলতে কি, মনে ওরা অনেক আগের স্বামী-স্ত্রী হয়েই রয়েছে। সামাজিক অনুষ্ঠানে দুটি মানুষই স্বীকৃতি পাবে। এটা পদের প্রকৃত পাওনা। নীলামোতি অনেক পরে এসেছে এবাড়িতে। বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে নীলামোতি শাশুড়িকে। শাশুড়ির দু'চোখে বিস্ময়। মুখ দিয়ে কথা বেরোতে খানিক সময় গেছে। বলেছে, বৌমা! তুমি মানুষ, না সত্যিই দেবী! স্বামীকে যমের হাতে তুলে দিতে পারে স্ত্রী, কিন্তু পরনারীর হাতে নয়। ওসব চিন্তাভাবনা মাথা থেকে দূর ক'রে দাও দিকিনি! আশ্চর্য ব্যাপার!

না শুনেছে শাশুড়ির কথা, না শুনেছে স্বামীর। দিবারাত্র একই

দুশ্চিন্তা নীলামোতির। কি ক'রে কাকে ধরে ওদের চারহাত এক করা যায়, হৃদয়নাথ আর পুষ্পরানীর! চিন্তা তো মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে আর সেই সঙ্গে গুরুদেবের মুখখানাও। ছুটে চলে যেতে ইচ্ছে করছে গুরুদেবের কাছে। গুরুদেবকে যদি কোন রকমে রাজী করাতে পারা যায়, তাহলে সমস্ত ঝক্কি ঝামেলা মিটে যাবে তখুনি। শাশুড়ির মুখ বন্ধ, স্বামীরও। সুন্দর সুষ্ঠভাবে কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। নির্বিঘ্নে-নির্ঝঞ্ঝাটে।

নীলামোতির মনে পড়ে যায় গুরুদেবের হাসি। একদিক দিয়ে চোখের জল ফেলে যাচ্ছে নীলামোতি, আর এক দিক দিয়ে গুরুদেব হেসেই যাচ্ছে। কই, তার চোখের জলে তো গুরুদেবের পাষাণ মন গলে নি। মত দেয় নি পুষ্পর বিয়ের। এখন কে দেবে? জানতে পারলে, সমস্ত ব্যাপারটা ভণ্ডুল ক'রে দেবে শেষে।

দরকার নেই। দেখা যাক নিজের চেষ্টায় কি করা যায়। স্মরণে এসেছে ছোট পিসিমার জীবন, বাবার প্রাণপণ চেষ্টা। বিয়ের মাস ছয়েক পরে পিসিমাকে হাতের লোহা খুলতে হয়েছে, সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলতে হয়েছে। পনের বছর বয়সে এই দশা, বাকি জীবন অনেক পড়ে আছে সামনে। স্বামী কি, জানল না যে, তার বিয়ে দিতে দোষ কোথায়! গুণীজ্ঞানী আর বিদ্বান পণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞের দ্বারস্থ হয়েছে বাবা দফায় দফায়।

অনেকে নির্দয় ব্যবহার ক'রে সমাজের কলঙ্ক অপগণ্ড বলে বার ক'রে দিয়েছে বাড়ি থেকে। অনেকে আবার সদয় হয়ে ভরসা দিয়েছে বিদ্যাসাগর-কাহিনী শুনিয়ে। বিদ্যাসাগরের উদ্যোগ নেয়ার আগে বিধবা বিয়ের ব্যাপারে অনেক মহৎ-হৃদয় মানুষ এগিয়ে এসেছিল, তবে সফল হয় নি কেউ।

বিদ্যাসাগরের দেড়শ বছর আগে ঢাকার রাজা রাজবল্লভ। বিদ্যা-সাগরের আগে কোটার রাজাও। ১৮৫২ সালে মতিলাল শীল। শীল-মশাই আবার পুরস্কারও ঘোষণা করেছে। যে বিয়ে করবে তাকে দশ হাজার টাকা, যে বিধবা মেয়ের বিয়ে দেবে—তাকে দশ হাজার। কালী-প্রসন্ন সিংহ বিজ্ঞাপন দিয়েছে ফলাও ক'রে। প্রথম বিধবা বিয়ে করবে যে, তাকে হাজার টাকা পুরস্কার। বিপক্ষদের দাপটে সমাজচ্যুত হবার

ভয়ে আঘাত আর প্রাণ সংশয়ের সন্দেহে এগিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছে অনেককে।

বর্ধমানের মহারাজা নবদ্বীপের রাজা শ্রীশচন্দ্র আরো গণ্যমান্যেরা তবু হাল ছাড়েনি। নানা বাধাবিঘ্নের ভেতর নির্ভয়ে এগিয়ে চলার নীতি অবলম্বন ক'রে এগিয়েছে ওরা জোর কদমে।

আঠার শ পঞ্চাশ সালে উমেশ মিত্রের 'বিধবা বিবাহ' নাটক বেশ কিছু লোকের মনে দাগ কেটে বসেছে। কত মানুষই চোখের জল ফেলেছে বিধবাদের জন্য। বিদ্যাসাগরেরও চোখের জল বাঁধ মানে নি। এ নাটক মঞ্চে আনার প্রধান হোতা কিন্তু কেশবচন্দ্র সেন।

বিধবা বিয়েকে আইন সিদ্ধ করতে বিদ্যাসাগরকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে। গ্রান্টসাহেবের কাছ থেকে সুপ্রিম কোর্ট অবধি এগিয়েছে সমস্ত। প্রধান বিচারপতি জেমস কলভিন বিয়ের সপক্ষে। আঠারশ ছাপান্ন সালে ছাব্বিশে জুলাই আইন পাস হয়েছে। সাঁই-তিরিশ হাজার লোকের প্রতিবাদ আবেদন সত্ত্বেও।

ছাপান্ন সালেই বিদ্যাসাগরের সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে শ্রীশ চন্দ্র বিদ্যারত্নের সঙ্গে বিধবা কালীমতীর বিয়ে হয়েছে। বিদ্যাসাগরের সামনেই। সাতই ডিসেম্বর রোববার। এ ব্যাপারে বিদ্যাসাগরকে কি না সহ্য করতে হয়েছে! রাস্তা চলা দায়। বেরোলেই গালাগালি শুনতে হবে চতুর্দিকে। শান্তিপুরী নতুন শাড়ির নাম দেয়া হয়েছে বিদ্যাসাগরপেড়ে শাড়ি। পাড়ে পদ্য লেখা গানের ঢঙে।

'সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে। মনের সুখে থাকব মোরা মনোমত পতি লয়ে।'

কিন্তু বিদ্যাসাগরের ভেতর অচল অটল হিমালয়। টলে নি এক মুহূর্ত। পরাশর সংহিতার সার কথা নিয়েই কাজ সমাধার জন্য মগ্ন হতে হয়েছে। 'নষ্টে মৃত···নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে'। মরে গেলে, অন্য পতিগ্রহণ—এ তো শাস্ত্রেরই বিধি।

জ্ঞাতিস্বজনের সামনে উদাহরণ-প্রমাণ তুলে ধরেও বাবা নিরাশ হয়েছে শেষ অবধি। প্রতিবাদের ঝড়ে পেছিয়ে এসেছে বাবা নিদারুণ আঘাত পেয়ে। এ আঘাত সামলে উঠতে পারে নি আর জীবনে। শয্যাগত, তারপর জীবনান্ত।

শীর্ণকায় দেহের পাশে বসে বসে বাবার মর্মপীড়ার কথা শুনেছে নীলামোতি। বাবা দুঃখ করে কতবারই বলেছে, পাশে কেউ থাকলে তবু একটু জোর পেতুম নীলা। বিদ্যাসাগরেরও হেনস্থায় সান্ত্বনা এসেছে মস্ত বড় ছেলে নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিধবা ভবসুন্দরীকে বিবাহ করেছে। বিদ্যাসাগর মহাখুশি হয়ে জানিয়েছে, নারায়ণ উপযুক্ত ছেলে বটে।

নীলামোতি তখন ভেবেছে, কেন সে ছেলে হয়ে জন্মালো না! তাহলে বাবার সান্ত্বনা তো হতে পারত!

ছেলে না হোক নীলামোতি, বাবা পিসিমারা যা করতে পারে নি, নীলামোতি পুষ্পকে নিয়ে অতৃপ্ত আত্মার মনস্কামনা পূর্ণ করবে নিশ্চয়। নিশ্চয়। নিশ্চয়।

শাশুড়িকে বিদ্যাসাগরের সব ঘটনাই ভালো করে বুঝিয়ে বলেছে। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেছে মনোযোগ দিয়ে সমস্তই শুনেছে শাশুড়ি। অবিশ্যি হ্যাঁ না কোন উত্তর দেয় নি। এমনভাবে দৃষ্টি আটকেছে নীলামোতির মুখে যেন নীলামোতি কত অচেনা অজানা। নিজের অসাবধানে কিংবা অজান্তে একটা বুকখালি করা নিশ্বাস ঝরে পড়েছে শাশুড়ির।

ঘরে গিয়ে খাটে বসেছে চুপচাপ। ধ্যানের ভঙ্গিমা। হাতে হাতে ধরা দুটি বাহু। সামনে—দেয়ালে ঝোলানো রঙিন ছবি, গুরুদেবের। ওইখানেই চোখ।

শাশুড়ি গুরুদেবের শুধু ছবি দেখছে না রক্তমাংসের মানুষকে দেখছে—শাশুড়িই জানে। কিন্তু নীলামোতি দেখছে সেই মুখ, হৃষিকেশের সেই পাগলা-হাসির ঢল নামা ঢলঢলে মুখ। একেবারে জলজ্যান্ত।

কারও দিক দিয়ে কোন সাড়া পেলেও চেষ্টার অন্ত নেই নীলামোতির। নীলামোতির ভেতর বলে, চলো যেতে গুরুদেবের কাছে। কিন্তু সচেতন চিন্তা বলে, না। একবার তো খুব শিক্ষা হয়েছে। আর কেন সর্বনাশের মুখে এগিয়ে যাওয়া!

পথ পাচ্ছে না নীলামোতি। দোটানায় ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ছে। নীলামোতি অবসন্ন, ক্লান্ত।

কদিন যেতে না যেতেই—সকলকে—বিশেষ করে নীলামোতিকে

অবাক করে দিয়ে গুরুদেব এসে উপস্থিত। সেই হাসি! নীলা-মোতির বুক কেঁপে উঠেছে।

সজোরে একটা চড় মেরেছে গুরুদেব নীলামোতির পিঠে।—পাগলীর জ্বালায় কি নিশ্চিন্তে ধ্যান-ধারণা করবার জো আছে আমার। টেনে এনে তবে ছাড়ল!

শাশুড়িকে লক্ষ্য করে বলেছে, আমি-ই পুষ্পর বিয়ে বন্ধ করেছিলুম, আমি-ই বিয়ে দিতে এসেছি। হৃদয়নাথের সঙ্গে।

শাশুড়ির ঠোঁট নড়ে উঠেছে নীলামোতির দিকে চেয়ে।

গুরুদেব বলেছে, ওর দায়িত্ব আমার ওপর। নীলার ভাবনা ভাবতে হবে না তোকে। চেয়ে কি এতো দেখছিস আমায়! তখন বন্ধ করেছিলুম কেন? প্রয়োজন ছিল। এখন দিচ্ছি কেন—এটারও প্রয়োজন আছে। বর্তমানে অনেক প্রয়োজন জানা যায় না। জানা যায় ভবিষ্যতে।

ভাবনার অকুলপাথারে ভেসে চলেছিল নীলামোতি। ডুবতেও বসেছিল। অদ্ভুত মানুষ গুরুদেবের ঠিক সেই মুহূর্তে কাণ্ডারীর ভূমিকায় বিপদভঞ্জনের ভূমিকায় আবির্ভাব। নীলামোতি আনন্দে না পেরেছে হাসতে না পেরেছে কাঁদতে। কেবল দেখেছে। একদৃষ্টে দেখেছে গুরুদেবকে। দেখে দেখেও দেখার সাধ মিটছে না। মিটতে চাইছে না।

দিনক্ষণ স্থির হয়ে গেছে বিয়ের। ব্রহ্মতন্ত্র মতে গুরুদেব নিজেই এ বিয়ে দেবে। সকলে একবাক্যে বলে উঠেছে, এমন সৌভাগ্য কজনের হয়! পুষ্পরানীর বরাত বলতে হবে। আর হৃদয়নাথের? কৃপা কৃপা! একেই বলে অহেতুকী কৃপা। মেঘ না চাইতে অযাচিত বর্ষণ।

বোশেখি পূর্ণিমা। শুভদিন। গোধূলি লগ্ন। আকাশে লাল আভা। অস্তরথে বসে সূর্য পশ্চিমে। গুরুদেব একবার তাকাল শুধু। তারপর ঘরের ভেতর নিজের আসনে এসে বসেছে। বাঘছাল নয়, হরিণছালের আসনে। মধ্যিখানে। সামনে হোমকুণ্ড।

গুরুদেব পূবমুখো। কুশাসনের ওপর হলুদ কম্বলের আসন উত্তরে। বসেছে পুষ্পরানী। দক্ষিণে কুশাসনের ওপর লাল কম্বল। বসেছে হৃদয়নাথ। গুরুদেবের বাঁয়ে পুষ্পরানী, ডাইনে হৃদয়নাথ। হোমের আগুন জেবলেছে গুরুদেব। বেলপাতা মশলা ফুল ঘিয়ের কোশীতে তুলে আহুতি দিয়েছে। হোমের আগুনে বার বার কি মন্ত্রে, শোনা যায় নি। মনে মনেই বলেছে। গোড়ের রজনীগন্ধার মালা দুটো দু'জনের হাতে তুলে দিয়েছে। গুরুদেবের নির্দেশে পুষ্পরানী হৃদয়নাথ সরে এসেছে কাছাকাছি আগুন বাঁচিয়ে। প্রথমে পুষ্পরানী, পরে হৃদয়নাথ। আবার প্রথমে হৃদয়নাথ, পরে পুষ্পরানী। আবার প্রথম নিয়মে ঘুরে এসেছে। তিনবারের বার পুষ্পরানী স্বয়ং মালা অদলবদলের পর হৃদয়নাথের ডান হাতের তেলোর ওপর পুষ্পর বাঁহাতের ওপর পাতা রেখে কোশা স্পর্শ করিয়ে মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে আহুতি দিইয়েছে ওদের দুজনকে গুরুদেব। পর পর সাতবার।—
ওঁ ত্বং স্ত্রী ও ত্বং পুমান অসি ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা··· ।

ব্রহ্মতন্ত্রের গুপ্তক্রিয়ায়—গুরুমুখী ক্রিয়ার বিয়ের কাজ সম্পন্ন করেছে গুরুদেব। মন্ত্রের অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছেও। আত্মা স্ত্রী আবার আত্মা পুরুষ। কিন্তু যথার্থ স্ত্রীও নয় পুরুষও নয়। অদৃশ্য নিরাকার। সবার সব জানার ওপারে না জানা ব্রহ্মশক্তি। জানার মধ্যে দিয়ে চেনা ভাবনার মধ্যে দিয়েই অজানা রহস্যের কিছু কিছু অনুভবের আশনাই ধরা পড়ে। তোমাদের পরস্পরের আত্মা এক। এই সাধনাই আত্মমিলন। এখানে দেহের নয়, আত্মার শুভ পরিণয়। একই আত্মা আকার ভেদে নানা শক্তির খেলায় প্রকাশ।

এসব কথায় ওদের মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে, বা আদৌ কিছু হয় নি, সে বিষয়ে হলপ ক'রে নীলামোতি কিছু বলতে পারে না। পারে নিজের কথা বলতে। সেই মুহূর্ত থেকে হৃদয়নাথকে চিন্তা করেছে সে, তার আত্মপুরুষ ওই মানুষ। সময়ে সময়ে 'পুরুষ' বাদ চলে গেছে। শুধু মনে হয়েছে তার আত্মা। আর নিজেকে? নিজেও হৃদয়নাথের আত্মা। আত্মা আত্মা। পৃথিবীর সমস্ত আত্মা এক।

নীলামোতির কানে আবার বেজে উঠছে নিরাময় সাধুর কণ্ঠস্বর। বিজয়বালাকে শোনানোর ছলে তাকে শোনানো। তার ভেতর বার ভেঙে তছনছ করার জন্য। নিরাময় সাধু বলছে, নীলা অবন-অবন

ক'রে উন্মত্ত। খলের শিরোমণি। হৃদয়নাথের বেলায় আত্মা ভাবা হচ্ছে, আর অবনের বেলায় আত্মা নয়, সেখানে অবন। মতলবি মেয়েছেলে। গুরুদেবকে দিয়ে আত্মার বিয়ে দেয়া হ'ল শিখিয়ে পড়িয়ে, যাতে ওরা ঘরসংসার না বাঁধে কখনো। দু'জনের—হৃদয়নাথ আর পুষ্পর মিল করানোর অজুহাত দেখিয়ে হেথাহোথা নানা জায়গায় নানা সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে দু'জনকে নিয়ে গিয়ে লোকসমাজে ভালোমানুষ সাজা। আসলে দু'জনের তফাৎ করে রাখার ক্রিয়াকলাপই করায়।

একটু চুপ ক'রে আড়চোখে একবার দেখে নিল নিরাময়-নীলা-মোতিকে। আবার বলছে, পুষ্প আসে নি ওর সঙ্গে এই কারণেই। নীলামোতির এখানে এসে মনের উদ্দেশ্য পূরণ হবে না কিন্তু। বুকে হাত ঠেকিয়ে বলেছে, পুষ্পরানী হৃদয়নাথকে বাঁচাতেই হবে কুহকিনী-মায়াবিনীর হাত থেকে। নিয়ামময় সাধুই বাঁচাবে। নীলার ভয়ে হৃদয়নাথটা জড়পদার্থ হয়ে গেছে। পুষ্পরানী সমস্ত খুলে বলেছে নিরাময়কে। নিরাময়ের শরণাপন্ন ওরা। এত যদি আত্মজ্ঞানী হয়েছে নীলা, ভান না হয়ে সত্যি যদি হয়—এদের মাঝে রয়েছিস কেন? চলে যা—চলে যা—যেখানে ইচ্ছে চলে যা। দুষ্টগ্রহকে কে ঘরে রাখে! রাখতে চায়।

নিরাময়ের মুখে পুষ্পরানী-হৃদয়নাথের মনোভাব জেনেছে নীলা-মোতি। ভালোই হয়েছে। ওদের দু'জনের ওপর সত্যিই খুব মোহ ছিল তার। ওদের তাকে এড়িয়ে চলাটাকে ভেবেছে সম্মানের জন্য। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য আর অবহেলা ঘৃণাকে ভেবেছে, সংসার উদাসী হয়ে উঠেছে বোধ হয় ওরা। উদাসী মনকে ঘরে বসানোর চেষ্টা করেছে সাধুসন্তের দ্বারে ধন্না দিয়ে। ভুল, ভুল। ভুল বুঝেছে, ভুল করেছে নীলামোতি।

এখন পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে নীলামোতি। নিতুমা-নিরাময় তাই তাকে শান্ত রাখার জন্য মিথ্যে আশ্বাস দিয়েছে। তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। এখন এর মানে স্পষ্ট। তখন মনে হয়েছে, এরা অন্তর্যামী। দু'জনের যে মিলন চায় নীলামোতি, সেটা ওরা ঠিকই বুঝেছে। না, না। ঠিক ঠিক বোঝেনি। বুঝেছে, হৃদয়নাথ আর পুষ্পরানীর মনের আগুন ধরিয়ে দিতে চাইছে সে। আগুন ধরবার মনস্কামনা পূর্ণ হবার প্রলোভনবাণীই শুনিয়েছে।

আশা-আকাঙ্ক্ষার বাইরে যে তার এ পাওয়া। বিস্ময় বিস্ময় বিস্ময়! বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠিতে সময় লেগেছে একটু। তারপর খুব সংক্ষেপেই বলেছে, অমৃতের সন্তান! আশ্রম সন্তান! আমি প্রাণপণে চেষ্টা ক'রে যাবো মুক্তেশ্বরানন্দের মহৎ আদর্শ বজায় রাখতে। জ্ঞানত আমার কোন ত্রুটি থাকবে না কোন—একথা আমি নিশ্চয় ক'রে জোরের সঙ্গেই বলছি। সকলের কল্যাণ হ'ক, জগতের কল্যাণ হ'ক।

এ সমস্ত অনুষ্ঠান বক্তব্য—কিছুই ভালো লাগছে না নীলামোতির। খালি মনে হচ্ছে, রহস্যে বোঝাই মুক্তেশ্বরানন্দের অন্তর্ধান-অধ্যায়। জ্ঞানীর কাজ করে নি আনন্দানন্দ। ত্যাগানন্দকে মোটেই মুক্তেশ্বরানন্দ পছন্দ করতো না। কেন—আনন্দানন্দের জানতে বাকি নেই। বিলক্ষণ জানে। মুক্তেশ্বরানন্দের আসনে বসার যোগ্য কি ও?

প্রধানের অত প্রিয় আনন্দানন্দ। আনন্দানন্দের ওপর কত না ভরসা ছিল ওঁর। আনন্দই রক্ষে করবে সব। ওর জায়গায় দ্বিতীয় কেউ নেই, উপযুক্ত কেউ নেই। সেই আনন্দানন্দ মুক্তেশ্বরানন্দের ইচ্ছেটাও বজায় রাখতে পারল কই! কদিন যেতে না যেতেই, মত-মন পাল্টে গেল একদম। আশ্চর্য! ভাবতেও কষ্ট হয়।

মানুষের মন বড় বিচিত্র। চেনা দায়, জানা দায়। যদি না আনন্দানন্দের সম্বন্ধে আগে থেকে জানা থাকতো, তাহলে আঘাতটা এত বেশী বাজত না ভেতরে। ওই মানুষ একদিন বিষয়-আশয় ত্যাগ করেছে নির্দ্বিধায়। মায়ের হাত ধরে চলে এসেছে হৃষিকেশের আশ্রমে। মুক্তেশ্বরানন্দের কাছে নিয়েছে মানুষের মঙ্গলব্রত। সবার মঙ্গলে নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার ব্রত। সন্ন্যাস।

কাছে বসেছিল তখন নীলামোতি। সে-দৃশ্য—স্বর্গকে আশ্রমে নেমে আসতে দেখেছে স্বচক্ষে। ওর সন্ন্যাস নেয়া, নিজেরই নেয়া মনে হয়েছে। শান্তিনাথের নামকরণ হয়েছে আনন্দানন্দ। আগের শান্তিনাথ ছিল নীলামোতির ছোট দেওর পাতানো বা পড়শী-সম্বন্ধে নয়। আপন, অতি আপন। স্বামীর নিজের মায়ের পেটের ভাই।

কতবার না জিজ্ঞেস করেছে আনন্দানন্দকে নীলামোতি। সবার সামনে নয়, যখন একা পেয়েছে। —তুমি এত নির্বিকার হয়ে রয়েছ কেন মহারাজের অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারে? আমার তো মন মোটেই

মানছে না। তুমি কি ক'রে সত্যি বলে মেনে দিচ্ছ? রক্তমাংসের জলজ্যান্ত মানুষ আবার এমনও হ'তে পারে নাকি!

গম্ভীরমুখে মৃদুস্বরে উত্তর দিয়েছে, পৃথিবীতে কি না সম্ভব। আর প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে সরে গেছে তক্ষুনি সেখান থেকে এক পল দেরী না ক'রে।

নীলামোতির চোখে থাকে থাকে রহস্যে ঘেরা একটা গোপন-জগতের অদ্ভুত ধরনের গোপন রহস্যময় মানুষ হয়ে উঠেছে।

যাকে একসময় শ্রদ্ধার চোখে দেখেছে, এই সেদিন অবধি, তাকে সন্দেহ করতেও ভেতরটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। নিজের ধারণার গণ্ডির বাইরে এক চুলও পা বাড়াতে পারছে না তো।

সত্যিসত্যিই কি নীলামোতি কোনদিন শান্তি পেতে চায় নি? চাইলে, এমন হবার তো কথা নয়! শোনা যায়, যে যেটা অন্তর দিয়ে চায়, ভবিষ্যতে সে নাকি সেটাই পায়। তার বেলায় খাটছে কই! একটা অশান্তির ঢেউ কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই আর একটা এসে আছড়ে পড়েছে তার ওপর। প্রচণ্ড গতিতে। ঘুরপাক খাইয়ে কখনো নিয়ে যাচ্ছে পাতালপুরীর অতল তলে, কখনো আবার সপ্তসমুদ্রের ওপরে—আরো ওপরে। কখনো বা সমস্ত চিন্তাভাবনার রাজ্য ছাড়িয়ে শূন্যের দেশে।

কিন্তু স্থায়ী হচ্ছে না তো কোনটাই। না তলিয়ে যাওয়া, না ভেসে ওঠা, না শূন্যে বিচরণ। আনন্দ—শান্তির চিহ্ন কোন আকাশেই ফুটে উঠছে না। ফুটে ওঠার রঙও ধরছে না। না পাচ্ছে কোন স্থূল বা সূক্ষ্মের মৃদু পরশ, না পাচ্ছে কোন অনুভূতি। এক দুই তিন—তালে পা ফেলে চলতে-চলতে কেবলি ফাঁকের ফাঁদে এসে পড়ছে।

মুক্তেশ্বরানন্দ বহুবারই বলেছে, মন ঠিক কর, মন ঠিক কর। দেখবি, না চাইতেই পেয়ে গেছিস তুই মনের মতন রত্ন। সে রত্ন কি? দুর্লভ শান্তি আর আনন্দ।

কার কাছে পাওয়া যাবে?

সবেতেই আছে যে, অথচ সবই তার ত্যাগ। সব আকর্ষণের বাঁধনে বাঁধা নয় যে—তার কাছে।

এমন লোক কোথায় পাবে? নীলামোতির জিজ্ঞেস করতে হয়

নি আর। মুক্তেশ্বরানন্দের দু'চোখে যে হাসির উজান বইছে। দু' কোণ বেয়ে মুখময় ছড়িয়ে পড়ছে।

চোখের ভাষায় নিজের ভেতরের প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছে। হ্যাঁ, এই মানুষ—একমাত্র এই মানুষই তাকে প্রকৃত শান্তি আনন্দ দিতে পারে।

অতি আশা নীলামোতির জীবনে এক মস্ত বড় অভিশাপ। অজানা বিপদ ঘনিয়ে আসবে তক্ষুনি। সামনে জমা হয়ে উঠবে থরে থরে। পাথুরে পাঁচিল যেন। ভাঙতে-ভাঙতে সময় পেরিয়ে যায়। সহজে অতিক্রম দুঃসাধ্য ব্যাপার। এ বুঝি তার বিধিলিপিতে আলো-ছায়ার রেখায়-রেখায় লেখা। যে লেখা কখনোই মুছবে না, কিছুতেই মুছবে না।

জলজ্যান্ত মানুষটার হদিশ মেলা ভার হয়ে উঠেছে। নিশ্চয় তারই ভাগ্যফল। এ ছাড়া আর কি!

অনেক জ্বালা নিয়ে অনেক ব্যথাবেদনা নিয়ে অনেক আশা নিয়ে এসেছে এখানে। জ্বালা জুড়োবে ব্যথাবেদনার উপশম হবে। আসার সময়, বাঁকুড়া থেকে—নিদারুণ আঘাত পাবার পর, স্বামীর অবিশ্বাসের কথা শুনে—দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে বেরিয়ে পড়ে পথে।

কল্পনা হলেও তাকে টেনে এনেছে সত্যিকারের নিরাপদ জায়গায়। সে সময় শুনছে নীলামোতি অতদূর থেকেও মুক্তেশ্বরানন্দের কণ্ঠস্বর। মনে হয়েছে, সত্যি বুঝি শ্লোক উচ্চারণ করছে, ত্বং স্ত্রী পুমান অসি···। তুমিই স্ত্রী তুমিই পুরুষ। শুনতে শুনতে মুক্তেশ্বরানন্দের সারা চেহারাটা ভেসে উঠেছে দূরে। অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে ক্রমে। এগিয়ে আসছে যেন। আসছে তাকে নিয়ে যাবার জন্য। নিজের আশ্রয়ে রাখবার জন্য।

তারপর বাড়ি ফিরে এসেও একই দৃশ্য দেখেছে কেবল। দু'হাত বাড়িয়ে ডাকছে। ঘরের টানের চেয়ে প্রবল হয়ে পড়েছে এ টান তার কাছে।

হৃষিকেশে আশ্রমে এসে দাঁড়াতেই, মুক্তেশ্বরানন্দ দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কাছে ডেকেছে। বলেছে, তোর জন্য অপেক্ষা করছি রে কদিন ধরে।

নিজেকে সামলে রাখতে পারে নি নীলামোতি। বাঁধভাঙা স্রোতের মতো হু-হু করে জল বয়েছে দু'চোখের। দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নি। আছড়ে পড়েছে মুক্তেশ্বরানন্দের পায়ের ওপর।

মাথায় হাত রেখে একটা কথাই বলেছে মুক্তেশ্বরানন্দ, এটার প্রয়োজন ছিল রে। এটাও প্রয়োজন ছিল।

আশ্রমে সমস্ত ছেলেদেরই বাস। ওখানে স্ত্রীলোকের থাকা নিষেধ। আদেশ মুক্তেশ্বরানন্দের নিজেরই। নীলামোতির থাকার ব্যবস্থা হয়েছে কাছাকাছি অন্য কুঠিয়ায়। তারই দৃষ্টির আওতার মধ্যে।

প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যেয় আসে নীলামোতি। শোনে সমবেত সন্ন্যাসীদের স্তোত্র-ভজন। নিজেও আস্তে আস্তে গলা দেয়। সন্ধ্যেয় আরতি দেখে। মূর্তির নয়। নিরাকারের। জ্যোতির। জ্বলে ওঠে হোমের আগুন। সকলে একসঙ্গে আঠারো প্রদীপের আরতি শুরু করে দেয় হোমের আগুন ঘিরে।

নীলামোতিও আরতি করে ওদের সঙ্গে, আরতির গান গাইতে গাইতে। বিশ্বতেজ শক্তি তব তব জ্যোতিতে মিলিত। তুমি আদি জ্যোতি, তুমি মম জ্যোতি—তুমি আদি অনন্ত···। তুমি যোগজ্যোতি জগজন বন্দিত···।

গানের আরতিতে অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি হয় একটা। মুক্তেশ্বরানন্দের ভরাট গলায় ছন্দে সুরে দুলে দুলে ঘুরে বেড়ায় সুর-কথা আশ্রমের বাতাসে। পুণ্য পবিত্র ঋষি তপস্বী সাধকের আশ্রম হয়ে ওঠে নিমেষে। সকলে মিলে যেন আলোর শুদ্ধ মানুষ। প্রত্যেকের দেহের জ্যোতি প্রদীপ আলোয় মিলে মিশে হোমের আগুনে যেন মিশে যাচ্ছে প্রতিবারের আরতিতে। প্রদীপ দুলছে মানুষ দুলছে, হোমের আগুনও দুলছে। সোজাসুজি একই আলোর রাস্তা ধরে। যে যার নিজের দিক থেকে। গোল হয়ে বসে বসেই আরতি। একটা বাজনাই শত বাজনায় বেজে ওঠে। শেকলে ঝোলানো ঘণ্টার আওয়াজ। থেমে থেমে বাজছে। রেশ শেষ হওয়ার মুখেই ধ্বনির শুরু আবার—ঢং ঢং ঢং। মিলে যাচ্ছে সুন্দরভাবে পাখোয়াজের বোলের খেলায়। মিলে যাচ্ছে তানপুরার সুরের আঙিনায়। স্বর্গ যদি থাকে কোথাও, তবে এখানে এখানে এখানে।

আরতির শেষে চিনির এলাচিদানা বিতরণের পর উপদেশ দেয়

মুক্তেশ্বরানন্দ। মন তৈরির উপদেশ। যার মনের গতি যেমন, সেই বুঝে তাকে চলার পথ বাতলায়। রকমফের উপমা শোনায় প্রতিদিন। কিন্তু নীলামোতির বেলায় স্বতন্ত্র।—তুমি জানলে—শরীরটাই শুধু তুমি নও। শরীরের মধ্যেই আর একটা তুমি আছো। সে তুমি শরীরে থেকেও, শরীরে নও। সেখানে তুমি আত্মা। তুমি পিতা তুমি মাতা। তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ।

মুক্তেশ্বরানন্দ হাসে। একটু থেমে বলে, কি—শক্ত লাগছে? ঠিক বুঝতে পারছিস না? আরে নিজের আর অন্যের অন্যায় ভুল সমান চোখে দেখবি। সেখানে চাই শাসন। শাসনই পিতৃগুণ। আর সৎ-ইচ্ছেকে ভাবকে পালন করবি মাতৃগুণের নিঃস্বার্থ স্নেহ- আদর ঢেলে দিয়ে। তাহলে একদিকে বাবা আর একদিকে মা হ'লি নাকি?

এমন কথা বলার কায়দা, এমন বোঝানোর ভঙ্গি যে সেই মুহূর্তে বসে বসেই নীলামোতির মনে হয়েছে, হ্যাঁ—সত্যিসত্যিই তো সে সকলের। সকলের বাবা।

মনের ভাব অনেক সময় মুখে প্রকাশ হয় খুব কম নীলামোতির। নীরব নিস্পৃহ মুখ দেখে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও বোঝা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। অন্য মানুষ তো ছাড়। এ মন্তব্য মুক্তেশ্বরানন্দেরও। অবিশ্যি মহারাজ কৌতুক করেই বলে। বলে—যখন কেউ নীলামোতিকে নিয়ে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে চেষ্টা করে।—মহারাজজি যা বলে—ওর যদি তেমন বুদ্ধি থাকতো, তাহলে অনেক বড় হয়ে যেতে পারতো। বোকা বোকা চাউনি দেখেই বেশ বোঝা যায় কিছু নেই মগজে। মহারাজজির বাঁশ বনে মুক্তো ছড়ানো।

শেষটা শুনে মুক্তেশ্বরানন্দ চনমনে হয়ে ওঠে। প্রতিবাদের সুরে বলে, নিজের মতন অন্যকে ভাবা বা দেখা উচিত নয় কারো। নীলা-মোতি অন্তঃসলিলা। বয়ে চলেছে ভেতরে ভেতরে। কোন বিষয়ে বড় হতে গেলে, সে লোকের হিতকামনায়ই হোক বা সেবাধর্মেই হোক—এমনটি হওয়া দরকার। সে কি জানবে না অপরে। কাজকর্মে দেখতে পাবে কেবল হতভম্ব হয়ে।

সকলকে উদ্দেশ করে মুক্তেশ্বরানন্দ, প্রয়োজনে নীলামোতির পরামর্শ নেবে তোমরা নির্দ্বিধায়। ওর কথা মতো চলতে চেষ্টা করবে।

একজন ছাড়া 'হ্যাঁ-না' কোন শব্দ মুখ দিয়ে বার করে নি। স্রেফ

নিশ্চল পাথর মূর্তির মতো বসে থেকেছে। মৌনমুখে মাথা নিচু করে।

মুক্তেশ্বরানন্দ আনন্দে কাছে ডেকেছে আনন্দানন্দকে। ওই-ই বলেছে কেবল, মহারাজজির আদেশ শিরোধার্য। আনন্দানন্দকে জড়িয়ে ধরে বলেছেন মুক্তেশ্বরানন্দ। যোগ্য বেটা আমার তুই। যখন আমি থাকবো না, তখন আমার ওই বেটির পরামর্শ ছাড়া চলবি না এক পা! কেমন?

—যথা আজ্ঞা গুরুদেব।

আনন্দানন্দ পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছিল, মুক্তেশ্বরানন্দ বললেন, ওকি রে! ভুলে যাচ্ছিস সব?

আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন মুক্তেশ্বরানন্দ। জোড় হাতে বললেন, নমঃ নারায়ণায়।

আনন্দানন্দও মুক্তেশ্বরানন্দের কথার প্রতিধ্বনি করেছে।—নমঃ নারায়ণায়।

সন্ন্যাসধর্মে নিয়মে গুরু-শিষ্য সমান। ছোটবড় নেই এখানে কেউ। গুরুর ভেতর শিষ্য নিজের আত্মা-নারায়ণকে প্রণাম জানায়। আর শিষ্যের ভেতরও গুরুদেব নিজের আত্মা-নারায়ণকে প্রণাম জানায়।

এমন গুরুর এমন শিষ্য আনন্দানন্দ!

আশ্চর্যের ব্যাপার, মুক্তেশ্বরানন্দের সামনে যে প্রতিজ্ঞা করেছে আনন্দানন্দ, সে প্রতিজ্ঞা রাখল না একদম। নীলামোতির সঙ্গে পরামর্শ, কথা মতো চলা—মানল না। না মানুক, তাতে একটুও দুঃখ নেই নীলামোতির। দুঃখ শুধু অবহেলার জন্য। বড্ড অবহেলা করছে আনন্দানন্দ। মুক্তেশ্বরানন্দের সম্বন্ধে প্রাণের আকুলিবিকুলি জানাতে গেলেই, মুখ ঘুরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে। উত্তর দেয়া তো দূরের কথা।

এমন একটা ভাব দেখায়, যেন নীলামোতিই আপদ। নীলামোতি স্থানত্যাগ করলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে বুঝি। খুবই অসহ্য হয়ে উঠেছে নীলামোতি আনন্দানন্দের কাছে। নিজস্ব ধারণা নয় এটা। বারবার অগ্রাহ্যই তার মস্ত প্রমাণ। আবরণহীন ব্যবহার।

অথচ এই লোকই তার পক্ষ নিয়ে প্রতিবাদের প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে সেদিন।

নীলামোতির নামে মুখে মুখে কি গুঞ্জনই না শুরু হয়েছিল। কান পাতা দায়, টেকা দায়! নীলামোতির ওপর যে রকম স্নেহ যে রকম টান মুক্তেশ্বরানন্দের, নিশ্চয় আশ্রমের প্রধান করে যাবে ওকে। বরদাস্ত করা অসম্ভব। মাথা নোয়াতে, মান্য করতে পারবে না কোন প্রকারে। জীবন থাকতে নয়। কাল কা যোগী মাথার ওপর বসে নাচবে!

মোহ আর কাকে বলে! মুক্তেশ্বরানন্দের মোহমুক্তি হয় নি মোটে। সংসারীজীবদের মতো সম্পূর্ণ বদ্ধ মানুষ। মতিভ্রম হয়েছে ওঁর বিকারে রুগীর মতো। রুগীর মতামতের দাম কি! আদেশ উপদেশের দাম কি! উনি বিবেকবুদ্ধির মাথা কড়মড় করে চিবিয়ে খেয়ে বসে আছেন। ওই গুরুর শিষ্য বলে পরিচয় দিতেও লজ্জা। লজ্জা লজ্জা লজ্জা!

এতদিন সাধনা করে—বছরের পর বছর কি কষ্টই না ভোগ। কি দুর্গতি! খাওয়ায়-দাওয়ায় শোয়ায়। তার ওপর আশ্রমে খাটুনি। এ করো ও করো সে করো। তার ওপর আবার গুরুসেবা। অনুষ্ঠানের ত্রুটি হলেই শাস্তিভোগ। অনশনে প্রায়শ্চিত্ত। নিজেকে সংশোধন করা না পর্যন্ত—অনুতাপের আগুনে, গুরুদেব মুখদর্শন করবেন না। কঠিন কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও সব পণ্ডশ্রম।

মুক্তেশ্বরানন্দের বিচারের বহর বটে! বিচারশূন্য মানুষের কোন সিদ্ধান্তই মেনে নেয়া যেতে পারে না। বাধা বাধা বাধা। বাধা দিয়ে আটকাতে হবেই। তাতে যদি অন্যপন্থা অবলম্বন করতে হয়, তাও করতে হবে নির্ভয়ে। মাভৈঃ!

নীলামোতির যেমন শ্বশুরবাড়ির গুরুদেব মুক্তেশ্বরানন্দ, তেমনি বাপের বাড়িরও। বিয়ের আগেই দীক্ষা দিয়েছে ওকে মুক্তেশ্বরানন্দ। মা-বাবা বলেছে, এ বয়সে ও পারবে কি বাবা?

মুক্তেশ্বরানন্দ হাসিমুখে বলেছে, পারুক না পারুক—সে দায়িত্ব আমার। ভালো আধার, দিয়ে রাখাটা ভালো। শরীরে কি থাকবো চিরদিন!

এরপর কথা চলে না। দীক্ষা হয়ে গেছে নীলামোতির এগারো বছর বয়সে। ব্যস, ওই অবধি। আর কিছুই শেখান নি মুক্তেশ্বরানন্দ কোনদিন। নীলামোতি যে বলে নি, তা নয়। বলেছে। দেখা হলে আশ্রমে বা কলকাতায়। একই উত্তর। —তুই আর কি শিখবি রে! তুই নিজেই তো শিক্ষা-দীক্ষা ধ্যানধারণা।

—সবই যদি নিজে, তবে দীক্ষারও কি দরকার ছিল?

—হ্যাঁ, ভেতরের শক্তিকে জাগিয়ে দেয়ার জন্য।

যখন নীলামোতি নাস্তানাবুদ হৃদয়নাথকে নিয়ে, চিন্তায়-চিন্তায় পাগল বললে চলে, তখনো, মুক্তেশ্বরানন্দের সঙ্গে দেখা করে বলেছে, আমি নিজেই যদি শিক্ষাদীক্ষা, তবে আমার এমন হাল হচ্ছে কেন? মিথ্যে অশান্তির আগুনে জ্বলছি কেন স্বামীকে নিয়ে?

—তোর অভিজ্ঞতা লাভই তোর শিক্ষা। শিক্ষার নিখুঁত বিচারে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা তোর দীক্ষা। আর এই সবে কারো সাহায্য ছাড়াই ভবিষ্যতে আলোর পথে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশই শক্তির জেগে ওঠা। নিজের ভেতর থেকে নিজের নির্দেশ পাবার সূচনা হয়ে গেছে তোর ভেতরে। আর একটু অপেক্ষা। তারপর বুঝতে পারবি যখন, আর কোন প্রশ্নই আসবে না তোর মধ্যে। তোর ধৈর্য আসুক আরো—আরো। এখুনি অস্থির হয়ে পড়লে চলবে না। বাড়ুক সহ্যশক্তি। বাড়ুক আরো। দেখার জানার শেখার অনেক—অনেক কিছু বাকি আছে। পৃথিবীতে বাকি থেকেই যায় বহু। এই নিয়েই চলে যেতে হয় শেষ পর্যন্ত। তোর তো এখনো চরম আসে নি রে। বলে, প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠেছে মুক্তেশ্বরানন্দ।

অবাক বিস্ময়ে শুধু চেয়ে থেকেছে নীলামোতি। 'চরম' যেন কিছু নয় এঁর কাছে। ছেলেবেলার ছেলেখেলা। একটা মস্ত আনন্দের খেলা বুঝি। নীলামোতির এ ব্যাপারে কোন দুঃখকষ্ট আসে নি। এসেছে এক অদ্ভুত ইচ্ছে। এই আশ্চর্য জগতের আশ্চর্য মানুষের মন নিজের কি করে হয়। কখন কতদিনে।

মুক্তেশ্বরানন্দ নিজেই উদ্যোগী হয়ে তার বিয়ে দিয়েছে। মানসিক অশান্তি আর নানা দুর্ভোগের পর যখন তখন ছুটে এসেছে নীলামোতি মুক্তেশ্বরানন্দের কাছে।

মুক্তেশ্বরানন্দ নিঃসংকোচে বলেছে, এটারও তোর প্রয়োজন ছিল

শুনে পা থেকে মাথা অবধি জ্বলে ওঠা উচিত ছিল। জ্বলে নি কিন্তু। তার বদলে মনে হয়েছে, সত্যি কথাই। সবেরই প্রয়োজন আছে তো। এ সমস্তই তো ভবিষ্যতের মূলধন। নিজেকে ঠিক রাখা ঠিক মতো চলার।

সন্ধ্যে আরতির পর কত না অমৃতবাণী শুনেছে নীলামোতি দিনের পর দিন। তার সম্বন্ধেও মুক্তেশ্বরানন্দের কত উচ্চ ধারণা।

কিন্তু এই উচ্চ ধারণাই কাল হয়ে দাঁড়াল ত্যাগানন্দ আর তার দলবলের। যারা ওর মনোমতো আর যাদের ও মনোমতো। ওদের দুনিয়ায় নীলামোতি কালোছায়া, নীলামোতি সর্বনাশ। নীলামোতি কুহকিনী। মুক্তেশ্বরানন্দের সাক্ষাৎ মৃত্যু। মুক্তেশ্বরানন্দের দুর্মতি মোহ।

প্রতিবাদ করেছে আনন্দানন্দ, ছিঃ ছিঃ! ওকে চিনতে পারো নি তোমরা। ওর ত্যাগের তুলনা নেই। ও এখানে এসেছে গুরুদেবের গদি দখল করতে নয়। ও এমন—কারো অসন্তুষ্টির কারণ হ'তে চায় না। তোমরা ধারণার বশবর্তী হয়ে চলেছো। নিজের মনগড়া নিজেই জ্বলেপুড়ে মরছো। এসব হিংসাদ্বেষ না ছাড়লে, এগোতে পারবে না তো। এতদিনে তোমাদের কিচ্ছু হয় নি। এ মনে না পারবে নিজের মঙ্গল করতে, না পারবে অন্যের কোন মঙ্গল করতে কোনদিন! প্রার্থনা করি, তোমাদের চেতনা হোক, শুভবুদ্ধি হোক। তোমরা শান্তি পাও!

বত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? ঘুষি পাকিয়ে তেড়ে এসেছে ত্যাগানন্দ।—মেরেই ফেলব তোকে আজ। বৌদি-দেওর মিলে আশ্রম দখল করিস কি করে দেখবো! জ্ঞান দিতে এসেছে! মহারাজজি বললে না হয় কথা ছিল! কালকের কুত্তা নাই পেয়ে মাথায় উঠে বসেছে!

দু'জনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে মুক্তেশ্বরানন্দ।

ত্যাগানন্দের লোকেরা ত্যাগানন্দের পেছনে এসে জড়ো হয়েছে। লাঠি-সোঁটা হাতে। রণমূর্তি সকলের। মাথায় রক্ত উঠেছে ত্যাগানন্দের। রক্তবর্ণ চক্ষু। দু'চোখ ফেটে ফিনকি দিয়ে তাজা রক্ত বেরিয়ে আসে বুঝি।

মুক্তেশ্বরানন্দের মুখে কোনদিন 'অসুস্থ' কথা শোনা যায়নি। এই প্রথম শুনে নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারেনি।

মুক্তেশ্বরানন্দ খুব নিস্তেজ স্বরে বলল, আমি খুব অসুস্থ বোধ করছি।

অসম্ভব রকমে কাঁপছে মুক্তেশ্বরানন্দের সারা শরীর।

দু'পক্ষই মুক্তেশ্বরানন্দকে ধরাধরি ক'রে চারপাইয়ের ওপর গেরুয়া চাদর পাতা বিছানায় এনে শুইয়ে দিয়েছে।

হিংসে-দ্বেষে পরিপূর্ণ উগ্র বাগবিতণ্ডা আর ত্যাগানন্দের মারমুখী দাপটে মুক্তেশ্বরানন্দের এই অবস্থা। এই সূত্রপাত খাওয়া-দাওয়া ত্যাগের। ধীরে ধীরে উত্থান শক্তি রহিত। মুখে অন্য কোন কথা নেই। কেবল বলেছে, আমাকে তোমরা সকলে একটু একলা থাকতে দাও। এতদিন মানুষজন নিয়ে খেলা করেছি অনেক। এখন যদি নিজেকে একটু বোঝাবুঝি করি, তাতে বাধা দাও কেন? ডাক্তার-কবিরাজের অসুখ নয় আমার। কোন ওষুধেই কোন কাজ করবে না।

মুক্তেশ্বরানন্দের মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুনে চলেছে ত্যাগানন্দ আর তার অনুগতরা। কাছে ঘিরে বসে আছে দিবারাত্র আনন্দা-নন্দেরা। চোখের ঘুম গেছে। মনের ভরসা গেছে। গেছে শান্তি, গেছে আনন্দ। বিমর্ষমুখে বসে আছে মুক্তেশ্বরানন্দের মুখের দিকে চেয়ে। কখন কি প্রয়োজনে লাগে বলতে পারা যায় না তো।

পোড়া বরাত আর কাকে বলে! নীলামোতির হয়েছে তাই। যে ডাল ধরছে, সেই ডালই ভেঙে পড়ছে যে! নীলামোতি চুপচাপ বসে থাকে আর ভাবে, এরপর আরও কি আছে তার। সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখ জুড়ে ঘুম ছড়িয়ে পড়ে। কেন হয় এমন কিছু বুঝতে পারে না, বোঝার ইচ্ছেও করে না মোটে। নীলামোতি কি তাহলে তিমিরের ঘোরে ঝিমিয়ে পড়ে থাকবে চিরদিন।

আবার এক নতুন ধরনের নতুন অভিজ্ঞতার সামনাসামনি পড়তে হয়েছে তাকে। মুক্তেশ্বরানন্দ তাকে দেখলেই জ্বলে উঠছে দপ ক'রে। দুর্মুখের মতো কি সব কথাবার্তা। —সরে যা, সরে যা! চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যা!

আনন্দানন্দকে সম্বোধন ক'রে বলেছে, ওর ছোঁয়া জলের একবিন্দুও যেন আমার জিভের ডগায় না পড়ে !

অঝোরে দু'চোখের জল ঝরেছে নীলামোতির। আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে বারান্দায়। যেটা ভাবতেও পারেনি, সেটাও হ'ল তার। সব আঘাত সয়ে নিয়েছে, কিন্তু মুক্তেশ্বরানন্দের দিকের আঘাত সইবে কেমন ক'রে ! অন্যের কাছ থেকে ফিরে এসে বলেছে মুক্তেশ্বরানন্দের কাছে, পথ বলে দিন— কেমন করে আরো সহ্য করতে পারবো, কেমন করে ধৈর্য ধরতে পারবো ? এখন কাকে গিয়ে বলবে এসব। সব বিষয়ে আদেশ-উপদেশে রক্ষে করে চলেছে যে, সে বিমুখ হলে, অন্য কোন পথ নেই আর।

সব চেয়ে বেশী মনে লেগেছে নীলামোতির ত্যাগানন্দদের সামনে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছে বলে। ওদের মুখে ফুটে উঠেছে বিদ্রূপের কুটিল হাসি। ওরাতো এটাই চায়। নীলামোতি চলে যাক। নীলামোতির ওপর বিরূপ হোক মুক্তেশ্বরানন্দ। সমস্ত জেনেশুনে মুক্তেশ্বরানন্দ ওদের বাসনাই পূর্ণ করল ! এখানেই যত অভিমান। এখানেই যত মনবেদনা।

নীলামোতিকে ভালোরকমই জানে আনন্দানন্দ। সত্যিসত্যিই নীলামোতি চলে যাক এখান থেকে অন্যখানে কোথাও। ও-ও বেরিয়ে এসেছে। কাছে এসে শান্ত গলায় বলেছে, অসুস্থ মানুষের কথা ধরা উচিত নয়। রোগের ঘোরে মুখ দিয়ে কি বেরিয়েছে, এটা মনে করা ঠিক হবে না। অনেক করেছেন উনি আমাদের। বিপথে যেতে দেন নি। কত দৃষ্টি ! অফুরন্ত স্নেহ ঢেলে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবার কি চেষ্টা ! একটু সুস্থ হয়ে উঠে না বসা পর্যন্ত চলে যাওয়া কোন-রকমেই যুক্তিসঙ্গত নয়।

নিজের কথা উদাহরণ দিয়েছে আনন্দানন্দ। পরশু যৎপরোনাস্তি বকেছেন মুক্তেশ্বরানন্দ আনন্দানন্দকে। সে-ও তো ত্যাগানন্দের সামনে।—বেরিয়ে যা ! বেরিয়ে যা ! তোরা ছুঁস্ নি আমায়। সারা শরীর জ্বলে যায়। মুখদর্শন করলে সব পুণ্য চলে যায়। সেবারেও কি হাসে নি ত্যাগানন্দরা, চাপতে গিয়েও চাপতে পারে নি। হেসে খুন যাকে বলে।

হাতের ইশারায় ডেকেছেন কাছে। ত্যাগানন্দকে মাথা নিচু করতে বলেছেন মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বলেছেন, তোর ইচ্ছে পূর্ণ হবে রে। তোর ইচ্ছে পূর্ণ হবেই।

ত্যাগানন্দের প্রকৃত ইচ্ছেটা কি জানে না কি নীলামোতি, জানে না কি আনন্দানন্দ। পরিষ্কার জানে। তাদের সরিয়ে দিয়ে নিজে অধীশ্বর হওয়া। মুক্তেশ্বরানন্দের গদি দখল। মুক্তেশ্বরানন্দের অসন্তোষের কারণ হবে না কখনো নীলামোতি, হবে না আনন্দানন্দ। এ সময় ওদের হাতে ওঁকে তুলে দিয়ে চলে যাওয়া মানেই ওঁর জীবন-সংশয় করে যাওয়া।

নীলামোতি বলেছে, না না! তা কখনো হতে দেয়া হবে না। দেহে প্রাণ থাকতে নয়।

যত দিন যেতে লাগল, ততই টানটা যেন ত্যাগানন্দের ওপর পড়ছে বেশী করে। একবার বলেছে আনন্দানন্দকে, মুক্তেশ্বরানন্দ, ওরা থাকতে চাইছে ঘরে থাকুক না! কোন উত্তর দেয় নি মুক্তেশ্বরানন্দ।

একরাত্রির থাকার পর ওরা থাকতে চায় নি আর। বলেছে আনন্দানন্দকে, সারা রাত ঘুম নেই। মুক্তেশ্বরানন্দের কেবল বিভীষিকা দেখা আর চিৎকার। চোখেপাতায় এক করা তো দূরের কথা, একদণ্ড বসতে দেয় নি পর্যন্ত। হরদম উঠিয়েছে। ওই কে উঁকি মেরে গেল! কি ভয়ানক দেখতে রে বাবা। একসঙ্গে কত জন! মানুষ নয় তো। কঙ্কাল এগিয়ে আসছে হাত বাড়িয়ে! ওরে তোরা ওঠ, ওঠ! শীগগির ওঠ! তাড়িয়ে দে, তাড়িয়ে দে। না, না। যাবো না, যাবো না।

আনন্দানন্দের দুহাত ধরে বলেছে ত্যাগানন্দ, ভাই! মহারাজ আমাদের প্রাণের লোক! ওঁর দশা আমরা সহ্য করতে পারছি না। বুক ফেটে যাচ্ছে। বা দেখছি, ব্যাপার স্যাপার দেখে, মনে হচ্ছে যা —আর বেশি দিন নয়। শোনা যায় মৃত্যুর সময় নাকি এরকম দেখে অনেকে। মৃত-আত্মারা নিতে আসে। দেখে বড় কষ্ট হচ্ছে আমার। রাতভোর এক ফোঁটা জল পর্যন্ত খাওয়ানো যায় নি। তোমরা তো সেবাশুশ্রূষা করছো। টান নেই বলেই, করতে পারছো। রাত জাগতে পারছো। অভ্যেস আছে বলেই। আমাদের দ্বারা থাকা, সেবা করা

অসম্ভব। উনি যাবার আগে আমাদেরই যেতে হবে শেষে। তাতেই ও'রই লাগবে বেশী।

ওরা আর রাতে কখনো আসে নি মুক্তেশ্বরানন্দের ঘরে। এসেছে সকালে। দূরে দাঁড়িয়ে দেখেছে চেয়ে চেয়ে। কত দেরী আর। মুক্তেশ্বরানন্দ কাউকে দেখলে হাসে না। বরং গোমড়ামুখ করে থাকে। কিন্তু ত্যাগানন্দদের কেউ এলে, যেন প্রাণ ফিরে পায়। কি হাসি। চোখে মুখে অঙ্গে অঙ্গে হাসির দোলা দুলে যায়। একবার আধবার নয়। যতক্ষণ ধরে থাকে ওরা, ততক্ষণই। আরপর যে-কে সে-ই। অমাবস্যার অন্ধকার নামে মুখে। সব তাতেই বেজার।

এইভাবেই চলছিল প্রতিদিন।

কারো পড়ুক না পড়ুক, আচমকা বাজ পড়ল মাথায় নীলামোতির।

নিজের কুঠিয়া থেকে বেরিয়ে পড়েছে ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। মনটা বড় অস্থির হয়ে পড়েছে দর্শনের জন্য। কাল যেন কেমন-কেমন দেখে এসেছে মুক্তেশ্বরানন্দকে। সারাদিন চোখে খোলে নি, মুখ খোলে নি। বড্ড নিস্তেজ।

জানে না কি করলে উনি সতেজ হয়ে উঠবেন! তবু রাত জেগে. হোমের আগুন জেলে বসে থেকেছে। আগুনের তেজ-তাপ কি ও'র শরীরে যেতে পারে না এখান থেকে তার ইচ্ছে-শক্তিতে? ইচ্ছে-শক্তিতে যদি অসাধ্যসাধন করা যায়—অবিশ্যি শোনা কথা, তাহলে তার এ চিন্তা সফল হবে না কেন? যাদের সার্থক হয়েছে, তাদের কাজ থেকেই জানা—হয়। তারও হবে নিশ্চয়। কোন দ্বিধা-সংশয় না রাখাই ভালো।

আশ্রমে এসে রাতের চিন্তা শূন্যে মিলিয়েছে নিমেষে। মুক্তেশ্বরানন্দ নেই। নেই বলতে গেলে, দেহটা পর্যন্ত নেই। সবসুদ্ধু অদৃশ্য। স্থাণুর মতো বসে থেকেছে খানিক নীলামোতি। এত লোক থাকতে এ অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে কেমন করে! তাজ্জব ব্যাপার।

বয়স হলেও, দেহের বা মনের বয়স হয়েছিল কই মুক্তেশ্বরানন্দের! সুন্দর সুঠাম অঙ্গ! কি শক্তসমর্থ। পরনে ফিনফিনে আদ্দির ধুতি দুপাট করা। আদুর গা ন্যাড়া মাথা। লম্বাচওড়া পুরুষ। ব্যক্তিত্বে

অসাধারণ। দাঁতের সারি বাঁধানোর মতো সাজানো। লটকান রঙের আলগা লাবণি ছড়িয়ে আছে পা থেকে মাথা অবধি। লাল নয় গোলাপি নয়, অথচ একটা শ্রদ্ধা-ভক্তি জাগানো চোখ ধরে রাখার আভা। এ মানুষকে মনের বাইরে সরিয়ে রাখা দুষ্কর। শুধু চেহারা নয়, মায়ের স্নেহ আর পিতার শাসনও ওঁর চরিত্রের ভূষণ। মানুষকে কাছে বেঁধে রাখে। খানাখন্দে পড়তে দেয় না।

এই পাহাড়ের আড়ালে সবাই। অথচ পাহাড় নেই। চতুর্দিকে ফাঁকা হয়ে গেল সকলের, কিন্তু আশ্চর্য—কোন ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না এদের মধ্যে। এরা বলতে, আনন্দানন্দরা। নির্লিপ্ত নির্বিকার। একটু খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, এদের চোখের তারায় একটা পরম তৃপ্তির পরশ।

এদিকে এদের ঠিক উল্টোটাই নজরে পড়ছে ত্যাগানন্দদের। প্রত্যেকের মুখে চোখে আচারব্যবহারে। কেঁদে সারা। বুক চাপড়ে কান্না যাকে বলে।

মুক্তেশ্বরানন্দের হলুদ কম্বলের বিছানার ওপর কি মাথা খোঁড়াখুঁড়ি। ভাগ্যিস নরমের ওপর তাই, নইলে কেটেকুটে রক্তারক্তি হয়ে যেত। মাঝে মাঝে বিছানার ওপর অছড়ে পড়ে বেঁহুশ হয়ে যাচ্ছে ত্যাগানন্দ। অনুগামীরা চোখ মুছতে মুছতে বলছে, ওই—মহারাজ। অবিকল মহারাজের মতো দেখাচ্ছে। মহারাজের আত্মা ওর মধ্যেই এসে গেছে।

সন্ন্যাসীর নিয়ম বিরুদ্ধ বিচিত্র ধরনের আচার-ব্যবহার প্রকাশ পাচ্ছে আনন্দানন্দের মধ্যে। সন্ন্যাস নেয়া হয়ে গেলে গুরু-শিষ্যের সমান সম্মান। একজন একজনের মধ্যে নিজেকেই দেখে শ্রদ্ধা জানায় জোড়হাতে। নমঃ নারায়ণায়। এক্ষেত্রে বিপরীত। আনন্দানন্দ ফুল বেলপাতা নিয়ে ত্যাগানন্দের পায়ে দিয়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছে। জয় মহারাজ, জয় মহারাজ। জয়গুরু জয়গুরু।···মৎগুরু শ্রীজগদ-গুরু মন্নাথ শ্রীজগন্নাথ···তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ। আমার গুরু জগতের গুরু, আমার নাথ জগতের নাথ। সেই গুরুদেবকে জগতের নাথকে প্রণাম করি। প্রণাম করি। প্রণাম করি।

অদ্ভুত হালচাল মোটেই ভালো লাগছে না নীলামোতির। এক-

পক্ষের কেঁদে ভাসানো আর একপক্ষের ব্যথাবেদনা শোকমুক্ত ভাব কেমন কেমন ঠেকছে। দুপক্ষই কি ষড়যন্ত্র করে—

কি করে যে মন বুঝল, কে জানে! কাছে এসে দাঁড়িয়েছে আনন্দানন্দ। বলেছে আস্তে আস্তে। ওঠো, আমাদের কাজে যোগ দাও। এরকম বসে বসে ভেবো না। উনি মোটে পছন্দ করতেন না এসব। নিষেধ করেছেন। তোমার তো জানতে বাকি নেই। ওনারা কৃপা করে দর্শন দেন বা কাছে থাকেন। বরাবরের জন্য ধরে রাখা যায় না। আশা করাটাই ভুল। ওঁদের ব্যাপারস্যাপারই আলাদা। অবিশ্বাস করার কিছু নেই।

চোখ তুলে তাকাতেই প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছে নীলামোতি। কাকে দেখছে ও! আনন্দানন্দ, না অন্য কেউ। ঠোঁটের ফাঁকে চাপা হাসি। এই মানুষই অতি স্নেহের অতি আদরের পাত্র ছিল না মুক্তেশ্বরানন্দের ছিল না কি আশাভরসা। ভবিষ্যতের অধিকারী তাঁর। কোথায় আছে নীলামোতি। কোথায়—কার সামনে, কার কাছে!

আনন্দানন্দের হল কি! ত্যাগানন্দের পায়ে ফুলবেলপাতা! ত্যাগানন্দকে মুক্তেশ্বরানন্দ ভাবা! মুক্তেশ্বরানন্দের পায়ের নখের কি ও যোগ্য!

যে ত্যাগানন্দ কেবলি ত্রাস সৃষ্টি করেছে রোজ সকালে। মুক্তেশ্বরানন্দকে দেখতে এসেই বলেছে, কি বিচ্ছিরি চেহারা হয়ে গেছে। মুখখানায় মৃত্যুর ছায়া মাখানো একেবারে। দিন দিন কত পরিবর্তন কেউ বুঝতে পারছো না! উনি দেহে থাকবেন না কিছুতেই, চোখ বুজে বুজে সেই চেষ্টাই করছেন। ছাড়বার।

মুক্তেশ্বরানন্দ চোখ খুলে নীরব হাসি হেসেছে ত্যাগানন্দের দিকে চেয়ে। ত্যাগানন্দও বলে উঠেছে, দেখতে পাচ্ছো সবাই? মহারাজ হেসে তার কথাই সমর্থন করছেন।

কে না বোঝে, মুক্তেশ্বরানন্দের থাকাটা চায় নি মোটে ত্যাগানন্দেরা। সেই ত্যাগানন্দদের মায়াকান্নার ফাঁদে পা দিল আনন্দানন্দ।

আনন্দানন্দ আর নীলামোতিকে নিয়ে কম তর্কাতর্কি হয় নি

মুক্তেশ্বরানন্দ আর ত্যাগানন্দতে। ত্যাগানন্দ রেগেমেগে বলেছে,যত সব বাড়াবাড়ি আপনার। লোকে ছ্যা-ছ্যা করছে। বলছে, বুড়ো বয়সে মহারাজের মতিভ্রম। নীলামোতি আর আনন্দানন্দকে বড্ড মাথায় তুলছেন। যে যে-বিষয়ে উপযুক্ত নয়, তাকে উপযুক্ত বলে চালানো। লোকে বলে, মহারাজ মোহগ্রস্ত। ওদের নামে না আশ্রম লিখেপড়ে দেয়, দিলে শ্মশানভূমি হয়ে থাকবে আশ্রম। কেউ আর ত্রিসীমানা মাড়াবে না। আর মহারাজ যত বড়ই সাধক যোগী পুণ্যাত্মা হোন না কেন—নরক গমন অবশ্যম্ভাবী এত বড় অন্যায়ের জন্য। সামান্য একটু মিথ্যের ছোঁয়ায় যুধিষ্ঠিরও বাদ যান নি। অশ্বত্থমা হত ইতি গজ—বলার জন্য।

যে ব্যাপারে যে কথায় অশান্তি সে-ব্যাপার সে-কথা ভুলে থাকাই ভালো। এতে তবু শান্তি আসে। আগেকার সমস্ত কিছু ভুলে থাকুক আনন্দানন্দ দুঃখ নেই তাতে। দুঃখ কেবল—ত্যাগানন্দকে মুক্তেশ্বরানন্দের আসনে বসানো। মন মেনে নিচ্ছে না নীলামোতির।

দু'পক্ষের ওপরই সন্দেহ আসছে নীলামোতির। একটু-আধটু নয়, নিক্তির ওজনে পূর্ণ মাত্রায়—সমান-সমান। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না নীলামোতি মুক্তেশ্বরানন্দের অন্তর্ধানের ব্যাপারটা। কিছুতেই না।

ভেতরে অসহ্য যন্ত্রণা নীলামোতির। ডুকরে ডুকরে কাঁদছে যেন কে!

সকলের অগোচরে চোখের আড়ালে অতি সাবধানে পায়ে পায়ে চলে গেছে নীলামোতি। যেখানে সমাধির মাটি খোঁড়া রয়েছে মুক্তেশ্বরানন্দের।

মুক্তেশ্বরানন্দ নিজে হাতেই খুঁড়ে রেখেছে। ম'লে যেন এখানে সমাধি দেয়া হয়। বড় ইচ্ছে। ফেলা মাটির স্তূপে কান রেখে বার বার শুনতে চেষ্টা করেছে,…প্রাণের সাড়া মেলে কিনা।

একটু সচেতন হতেই নীলামোতির লজ্জা এসেছে নিজের কাছে নিজের। একটা স্রেফ বোকামি আর পাগলামো। মাটির তলায় চাপা থাকলে কি আর বাঁচে কেউ! যোগী-ঋষিরা বেঁচে থাকলেও থাকতে পারে। তবে সে তো নিশ্বাস করে রাখা। অর্থাৎ কুম্ভক করে জীবনরক্ষা। নিশ্বাস যেখানে বন্ধ, সেখানে আওয়াজ শোনার কথাই

ওঠে না। ভেতরের কান্না কিন্তু থামছে না নীলামোতির। কাঁদছে, কেঁদেই চলেছে।

ত্যাগানন্দকে মুক্তেশ্বরানন্দের আসনে বসিয়ে আরতি করার পর, ওর বাণী দেয়ার পর—সকলে আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠেছে আশ্রমে। চলল সারাদিন নতুন গুরুর বন্দনা আর ভজন। বন্দনা-ভজনে যোগদান করেছে আনন্দানন্দ আর তার অনুগামীরা।

অনেকবার আনন্দানন্দ যোগ দিতে অনুরোধ করেছে। কিন্তু উঠতে গিয়েও উঠতে পারেনি। ওদের দলের মধ্যে গিয়ে বসতে পারে নি। ওদের গলায় গলা মেলাতে পারেনি নীলামোতি। মন চায় নি বলেই হয়তো। এককোণে বসে থেকেছে মৌনমুখে। ওদের গানের সুরে মুক্তেশ্বরানন্দের স্বর শুনতে পাচ্ছে। ডাকছে নীলামোতিকে।

পালিশ করা কাঠের ময়ূরপাখা সিংহাসনে কাশ্মীরী গালচের টক-টকে লাল পদ্মের মাঝখানে পা মুড়ে বসে ত্যাগানন্দ। কখনো চোখ বুজে ভাবে বিভোর। কখনো চোখ খুলছে। কোণে ফিকে লাল। ঘুম ভেঙে উঠল বুঝি সবে। চোখের তারা জ্বলজ্বল করছে। ঘুরছে ডাইনে-বাঁয়ে। সামনে।

নীলামোতির আনমনা ভাবটা এখানে সম্পূর্ণ বেমানান। নজরে পড়েছে আনন্দানন্দের। বারে বারে তাকাচ্ছে ওকে সচেতন করে দেবার জন্য। কিন্তু চোখে চোখ পড়ছে কই! মেঝেয় চোখ। মেঝে ফুঁড়ে ওর দৃষ্টি চলে যাচ্ছে বোধ হয় মাটির তলায়। নিচে নিচে—অনেক নিচে।

ত্যাগানন্দের যে লক্ষ্য পড়ছে না, তা নয়। পড়ছে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দু'টো ভুরুর মাঝখানটা বড্ড বেশী কুঁচকে উঠছে। ত্রিনয়ন ফুটে না বেরিয়ে আসে শেষে! মদনভস্মের মতো নীলামোতি ভস্ম হয়ে না যায়।

ভয় আনন্দানন্দের। ত্রিনয়ন বা ভস্ম নয়। ওর রাগের কারণ হচ্ছে শুধুমুধু নীলামোতি। ওই তো এখন প্রধান। মুক্তেশ্বরানন্দ তো নেই এখানে যে, তার সাহসে সাহস করবে। একটু বোঝা উচিত। থাকতে গেলে প্রধানের অসন্তোষের কারণ হওয়াটা ঠিক হবে না।

কে বোঝাবে কাকে!

একভাবেই বসে আছে নীলামোতি।

পরদিন ভোর থেকেই আশ্রম সরগরম। বহু লোক এসেছে। সন্ন্যাসী ভক্ত-শিষ্য বাদেও অনেকে। মুক্তেশ্বরানন্দ যে সব ভজন-স্তোত্র গাইতে ভালোবাসত—গাওয়া হচ্ছে। একটা আলাদা সিংহাসনে—পেতলের, মহারাজের ছবি ফুল দিয়ে সাজানো। ধূপ-ধুনোর গন্ধে ঘরখানা পুজোর ঘর হয়ে উঠেছে। ছবিকে আরতি করল ত্যাগানন্দ নিজে। আরতি করতে করতে ত্যাগানন্দ এপাশ-ওপাশ এত দুলছে যে, দুজন সন্ন্যাসী দুপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু'হাত বাড়িয়ে রয়েছে। পড়ে যাবার উপক্রম হলেই, ধরে ফেলবে দুদিক থেকে।

সব শেষে চামরের। অসম্ভব রকমে দুলছে ত্যাগানন্দ। বাতাসে বুঝি দেহটা ভাসছে থেকে থেকে! দৃষ্টি কারো দিকে নয়, উর্ধ্বে, স্থির। কি যেন কি দেখছে অপলকে। কাকে দেখছে মনপ্রাণ এক করে। ঘরের ভেতর হলেও দৃষ্টি চলে যাচ্ছে বাইরে। শূন্যে—আকাশে।

পড়ে যাচ্ছিল ত্যাগানন্দ। পাশে সন্ন্যাসী দু'জনের সতর্ক দৃষ্টি এড়ায় নি। সময়মতো দু'দিক থেকে জাপটে ধরে ফেলেছে ওরা। অচৈতন্য হয়ে পড়েছে ত্যাগানন্দ।

ধরাধরি করে এনে শুইয়ে দিয়েছে সবাই বিছানায়। প্রণামের ধুম পড়ে গেল এক এক করে সকলের। গুঞ্জন উঠছে ঘরে—সমাধি সমাধি সমাধি।

একটু পরেই চোখ মেলে উঠে বসেছে ত্যাগানন্দ। প্রণামের জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল লোকের আবার। সমাধি ভেঙেছে, সমাধি ভেঙেছে। আশীর্বাদ নাও। এই সময়ের আশীর্বাদে জুড়োবে ত্রিতাপ জ্বালা।

ত্যাগানন্দের নির্দেশে এবার ঘড়ি ঘণ্টা কাঁসর ঢাক শাঁখ বেজে উঠল। বাজছে। বাজতে বাজতে যাবেও সমাধিস্থান অবধি। মুক্তেশ্বরানন্দের ছবি বসানো পেতলের সিংহাসনের দু'ধারের পায়ায় লম্বা ক'রে বাঁশ বাঁধা। সামনে-পেছনে ছাড়া অনেকখানি। হাতে ক'রে উঠিয়ে, কাঁধে চড়িয়েছে এদিক-ওদিকের সন্ন্যাসীরা।

সমস্বরে বলে উঠেছে ওরা—জয় চিদানন্দ সচ্চিদানন্দ আত্মানন্দ আত্মপুরুষের জয়।

আশ্রমঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে সকলে।

শুরু হ'ল যাত্রা মহাসমাধির। প্রথমে চলেছে বাজিয়েরা। তারপর

ধুনুচি হাতে যারা। গনগনে কাঠ-কয়লার আগুনে মুঠো মুঠো ধুনো গুগ্গুল দিতে দিতে। বাতাসে পবিত্র সুবাস ছড়াচ্ছে। তারপর সিংহাসন ঘিরে ত্যাগানন্দ আর অন্য সবাই।

নীলামোতিকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেতে হচ্ছে। আনন্দানন্দের অনেক বোঝানোর পর।—বিশ্বাস কর না কর—মনে রেখে দাও। সঙ্গে না যাওয়াটা বড্ড দৃষ্টিকটু হয়ে দাঁড়াবে। মহারাজের অদৃশ্য হওয়া মানেই যে দেহত্যাগ নয়, এ বিশ্বাস তোমার ভাঙতে চাই না। তোমার বিশ্বাস নিয়ে তুমি থাকো। তোমার মনের কথা তুমি নিজেই শোন না। কে বারণ করছে? যারা শুনতে চায় না, শুনবে না—বলে কি কোন লাভ আছে?

সমাধিস্থানে এসে ছবি নামিয়ে সকলে স্তোত্র শুরু করেছে।—ত্বম ব্রহ্ম পরমজ্যোতি জরামরণ বর্জিতম···। তুমি ব্রহ্ম তুমি পরমজ্যোতি তুমি আত্মা। জরা নেই মরণ নেই তোমার।

স্তোত্র চলছে। সিংহাসন থেকে ছবি তুলে আংটায় দড়ি লাগিয়ে নামিয়ে দেয়া হ'ল মাটির তলায়। প্রথমে ত্যাগানন্দ তিন মুঠো মাটি ফেলল সমাধিতে! তারপর প্রত্যেকে এক এক ক'রে। এরপর মানুষ প্রমাণ গর্ত বুজিয়ে দেয়া হ'ল কোদালে মাটি চেঁচে চেঁচে। বসে বসে অবাক চোখে দেখেছে নীলামোতি। মাটি ফেলেনি সমাধিতে।

সমাধিস্থান মুখর হয়ে উঠল জয়ধ্বনিতে।—মুক্তেশ্বরানন্দের জয়। মুক্ত পুরুষের জয়। মুক্ত প্রাণের জয়। দেহাতীতের জয়। আত্মার জয়।

তেরো দিনের দিন নিয়মমাফিক সমস্তই সুসম্পন্ন হয়েছে। হোম-যাগ কাঙালি-ভক্ত-সন্ন্যাসীদের সেবা! পরম তৃপ্তিতে ভোজনপর্ব সমাধা। নীলামোতি কুঠিয়া থেকে এসেছে ঠিকই। যন্ত্রের পুতুলের মতো। ভাণ্ডারা প্রসাদের কণামাত্র গ্রহণ করে নি।

আশ্চর্য! এসব দেখেও ত্যাগানন্দের কোন বিরক্তি আসেনি নীলামোতির ওপর। আসেনি ক্ষোভ, আসেনি দুঃখ। তার নির্দেশ

অমান্যর জন্য আসেনি অপমানবোধ। তাকে সকলের সামনে বা আড়ালে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম না করার জন্য আসেনি আত্মাভিমান।

যে মানুষের দু'চক্ষের বিষ ছিল নীলামোতি, সে মানুষ কি সত্যিসত্যিই বদলালো। কে জানে! এই বদলে যাওয়াটাই আরো অদ্ভুত ঠেকছে। এখান থেকে তাড়াবার কম চেষ্টা করে নি। মুক্তেশ্বরানন্দের কানে -- গোলকধাঁধাঁয় পড়ে যাচ্ছে এদের রকমসকমে।

মাসখানেক অবধি খুব সদ্ব্যবহার করেছে ত্যাগানন্দ প্রত্যেকের সঙ্গে। সকলের দিকে সদাসর্বদা লক্ষ্য। কার কি অভাব অভিযোগ —সে সন্ন্যাসী হোক আর গৃহীই হোক—মিটিয়েছে সুন্দরভাবে। সবাই মুগ্ধ সন্তুষ্ট। নীলামোতিকে আনন্দকেও প্রচুর যত্নআত্তি! নীলামোতির ধারণা অন্যের চেয়ে মাত্রায় যেন অনেক বেশী তার বেলায়। মুক্তেশ্বরানন্দ যেমন করতেন, প্রায় তেমনি। বরং অতিরিক্ত বই কমতি নয় এতটুকু।

সব জিনিসে নির্লিপ্ত দর্শক হয়ে থাকার মতো সুখশান্তি নেই বুঝি কোন তাতে। কিন্তু নিজেকে যদি কারো নিষ্ঠুর খেলার শিকার হতে হয়, কারই বা ভালো লাগে। ভালো লাগার কথা নয়। অন্যের মনোভাব যার নিজের মনের সঙ্গে একেবারে অমিল। এক প্রকৃতির মনে হলে, শুধু এটা হলে আবার হবে না, একস্তরে থাকা চাই— তাহলে খারাপের সঙ্গে খারাপের আর ভালোর সঙ্গে ভালোর হরিহর আত্মা হয়ে যায়। এখানে বিচ্ছেদের প্রশ্ন আসে না, বিয়োগের প্রশ্ন আসে না। আসা মানেই মৃত্যু।

নীলামোতির মৃত্যু আসছে। পরিষ্কার বুঝতেও পারছে। চোখের সামনে দেখছে। ভেতরেও। অনুভূতির অনুভবে। এ মৃত্যু বিরহ বিচ্ছেদের নয়, নয় বিষাদের, নয় দেহ ছেড়ে প্রাণ বেরিয়ে যাবার।

এ অদ্ভুত মৃত্যু। দুরাত্মার ছলনায়। গোপনে নিরালায়।

তমর সত্য-সাত্ত্বিক মনকে গলা টিপে মেরে ফেলা। তম-রাজ্যের শেষ ধাপে নামিয়ে নিয়ে গিয়ে। সাধুর বেশে আসে প্রতি রাত্তিরে অসাধু মানুষ। নীলামোতির কুঠিয়ার দ্বারে করে করাঘাত। কিছুক্ষণ তারপর ফিরে যায় আঁধারে আড়াল রেখে নিজের শরীর।

নীলামোতির বলার উপায় নেই কাউকে। বললেই দোষী হবে সে। পুরুষ নয়। কেন না ঘুমে অচেতন দেখে ঘুমোয় সবাই।

ঘুমোতে যাবার আগে পুরুষের স্তবস্তুতি পদসেবা নিত্যধর্ম বিধি ওদের। নাকে-কানে খৎ।

কত অভ্যেস সাধনা-সংযমে মানুষ ঘুরে ফিরে এসে পড়ে নিজের স্বভাবে নিজের অজান্তে। একথা নীলামোতির নিজের নয়। মুক্তেশ্বরানন্দের।

মুক্তেশ্বরানন্দ বলেছে, সব জিনিস সবার জন্য নয়। প্রবল ইচ্ছেয় অনেক শক্ত কাজও হালকা হয়ে ওঠে, আবার অনিচ্ছার দাস হলে, হালকাও কঠিন। ভীষণ কঠিন। সমস্তই যদি এক হয়ে গেল, তবে প্রকৃতির রাজ্যে 'বৈচিত্র' কথাটা মুছে যাবে। তা হবার নয়।

কেন তাহলে অবাধ্য দুর্মুখ ত্যাগানন্দকে আশ্রমে আশ্রয় দেয়া। আটকানোয় খানিকটা—কিছু সময়ের জন্যও—সুস্থমনের হতে পারবে তো! নিজের বা অন্য কারো ক্ষতি করা থেকে ক্ষান্ত থাকবে তো!

এখানে উৎপাতের কারণ, সকলের অশান্তির কারণ কি খুব আনন্দের বিষয়?

এখানকার লোকের মনে অত দাগ কাটবে না। এরা জানে, স্বভাবে করায় কর্ম। কি দোষ উহার।

নীলামোতি প্রশ্ন-উত্তরে আর এগোয় নি।

মনে মনে ভেবেছে মুক্তেশ্বরানন্দের আগের উদাহরণ—বিষাক্ত সাপ পদ্মের মৃণাল জড়িয়ে থাকলেও কি মধুর স্বাদ জানতে পারে, না খায়! যে স্বাদ জানে, সেই খায়। খায় দূরের ভ্রমর মৌমাছি। খায় না শুধু সংগ্রহ করেও রাখে। যে যে-জিনিস নেবার অধিকারী, সে জিনিসটুকুই নেবে। নিজের সঞ্চয়ের পাত্রে রাখার যতটুকু ক্ষমতা, ঠিক ততটুকুই। এর বেশী হলে উপচে পড়ে যাবে সে।

এই সব শোনার পর জানার পর, বর্তমান অবস্থা দেখেও—নীলামোতি নিঃসন্দেহ হয় কেমন ক'রে? মন থেকে ত্যাগানন্দের অকস্মাৎ পরিবর্তন মেনে নিতে পারছে না কিছুতেই। আনন্দানন্দ কিন্তু সুন্দর মানিয়ে নিয়েছে। ওকেও নীলামোতি আগের মতো বিশ্বাস করতে পারছে না আর। নীলামোতির চোখে ও-ও এক রহস্যময় পুরুষ হয়ে উঠছে স্বভাববিরুদ্ধ আচার আচরণে। ন্যায়ের পূজারী স্পষ্টবক্তা দৃঢ়চিত্তের এই পরিবর্তন। নীলামোতি পাপ-

মোচনের প্রার্থনা করছে। কথায় মনে শরীরে জেনে না জেনে যে সমস্ত পাপ-অন্যায় করেছে।

যে ভাবে যে পাশে ঘুম পাড়িয়ে রেখে গেছে পুরুষকে ওরা, ভোর না হতেই এসে দেখেছে ঠিক সেই অবস্থায় সেই কাতেই শুয়ে আছে। কি অকাতরে ঘুম। ওদের চোখে দেবপুরুষের যোগনিদ্রা। প্রলয়ের পরে সৃষ্টির আগে বিষ্ণুর অনন্তশয্যায় শয়ান।

ওদের কাছে হতে পারে কি এই দেবপুরুষ গহনরাতের গোপন নিশাচর? না, না, না। শুনলেও পাপ। দুকানে আঙুল দিয়ে বলবে, দেখলেও ভুল দেখা। অবিশ্বাসী বিশ্বাসঘাতক চোখের ঠকানো স্রেফ। মহামায়ার মায়ার খেলা। মিথ্যেকে সত্যি ভাবানো, সত্যিকে মিথ্যে বোঝানো।

মানুষের মন নিয়ে বহু উপদেশ বহু উদাহরণ দিয়েছে মুক্তেশ্বরানন্দ। সৎ মন দেবতার ছদ্মবেশে দুরাত্মাকে চিনিয়ে দেয়। সাবধান করে। দূরে সরে থাকতে বলে। আর অসৎ-মন?

অসৎ-মন দেবতাকে দানব বলে বোঝায় আর দানবকে দেবতা ভাবতে শেখায়। কাছে এগিয়ে যেতে বলে। ওর কাছে জাহান্নামের পথই একমাত্র স্বর্গের সিধে রাস্তা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সহজে পৌঁছুনো যায়।

নীলামোতি কুঠিয়ার ভেতর হোমের আগুন জেবলে, সামনে বসে বসে ধ্যান করে সৎপুরুষের সুন্দর মূর্তি। ধ্যান আর কিছু করুক না করুক তার চিত্ত স্থির হয়ে যায়। সৎ পুরুষ তার কাছে মুক্তেশ্বরানন্দ। মুক্তেশ্বরানন্দের চিন্তায় তার গুণই মনে পড়ে যায় বেশী। নিজেকে নিজে আদেশ করে নীলামোতি বার বার। ওঁর গুণের যেন কিছুও আসে আমার মধ্যে, কিছুও আসে। নিশ্চয় আসবে আসবে নিশ্চয় আসবে।

রাতেই এসব চিন্তা করার সময় তার। সেই রাতেই বাধা পড়ে। পড়ছে রোজ নিয়ম ক'রে। ধ্যানের সময় আর চিন্তার সময়। দরজায় আওয়াজ একনাগাড়ে।

প্রথমদিন বিরক্ত হয়েই খুলেছে নীলামোতি। রাতদুপুরে কোন পাগলের কাণ্ড নিশ্চয়। এতদিনে তো এমন হয় নি। আর তাছাড়া এখানে এরকম হবারও কথা নয়। আশ্চর্যও হয়ে গেছে। মনস্থ

করেছে নীলামোতি যে-ই হোক—ছাড়বে না কিছুতেই। স্বয়ং ভগবান হলেও না। খুব অসভ্যতা-অভদ্রতা! লোকের দরজায় এসে হানা! তা-ও আবার দিনে নয়। একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। করবেই সে।

বাইরে বেরিয়েই মুখে কথা সরেনি আর। যে জন্য মনকে প্রস্তুত করেছিল, কাজে লাগল না কোন। সব বৃথা হয়ে গেল। যে এসেছে, যে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে ওকে মুগ্ধ নয়নে একদৃষ্টে দেখছে—তাকে দেখে। চিন্তার ছবি নয়, স্বপ্নের ছবি নয়। কল্পনার আলপনায় আঁকা মিথ্যে আঁকার ছবিও নয়।

এ সত্যি জলজ্যান্ত মানুষ। হতভম্ব হতবাক নীলামোতি। আগন্তুক আর নীলামোতির মধ্যিখানে একটা নিবিড় নিস্তব্ধ নিঝুম থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। একটু পরে সরেছে আস্তে আস্তে। আগন্তুকই কথা বলেছে প্রথমে।—অত দেখছো কি? তুমি আমায় অত ডাকো কেন? আকুল হয়ে ডাকলে, আমি কেমন ক'রে থাকতে পারি বল! না এসে থাকা যায়? তুমিই বল না! অসময়ে এসে গেছি। এতে আমার কি দোষ! মুক্তেশ্বরানন্দের চিন্তা কি করনি তুমি?

মাঘের রক্ত-জমা ঠাণ্ডায় নীলামোতির সারা শরীরে আগুন ছুটেছে। মিথ্যে ছলনারও একটা নিজস্ব ধর্ম আছে। নিজের নগ্ন-রূপের একটা আবরণের আব্রু থাকে। সেটাও খসিয়ে ফেলেছে এ! নিজের বুদ্ধি-কর্মের ওপর অগাধ অন্ধবিশ্বাস। মনে করে, ওর দুনিয়ায় ওকে ধরে ফেলে কার সাধ্যি।

প্রত্যেকেই রাতে নিরিবিলিতে হোমের আগুনে ধ্যানধারণা করে। এটা কারো অজানা নয়। সকলকেই একসঙ্গে এ উপদেশ দিয়ে গেছে মুক্তেশ্বরানন্দ। মুক্তেশ্বরানন্দের উপদেশ পালনের সময় মুক্তেশ্বরানন্দকে স্মরণ ক'রে নেয়াই বিধি।

ত্যাগানন্দ অন্তর্যামীর ভূমিকা নিয়ে এসেছে। —মুক্তেশ্বরানন্দের কি চিন্তা কর নি তুমি? দেখাচ্ছে, ও-ই মুক্তেশ্বরানন্দ। তা না হলে ছুটে আসবে কেন নীলামোতির কাছে? বেশ তো অন্যেরাও চিন্তা করছে, তাদের কাছে না গিয়ে নীলামোতির কাছে কেন?

ভেতরে প্রবেশ করতে যাচ্ছে ত্যাগানন্দ, হাত বাড়িয়ে দিয়ে আটকেছে নীলামোতি।

ত্যাগানন্দ মৃদুস্বরে বলেছে, নীলামোতি, তোমাকে আমি অনেক

উঁচু আসনে বসাবো। আশ্রমের প্রধান ক'রে দোব। সকলে তোমার গোলাম হয়ে থাকবে। তোমার পায়ের তলায় থাকবে। আমি কথা দিচ্ছি। সমস্ত আমার হাতে। আমি নামাতেও পারি, আমি ওঠাতেও পারি।

নীলামোতি মনে মনে প্রার্থনা করছে মুক্তেশ্বরানন্দের কাছে।—মাথাটা ঠাণ্ডা রাখুন। ধৈর্য-সহ্যের বাঁধ যেন না ভাঙে।

নীলামোতিকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে, ত্যাগানন্দ প্রাণখুলে প্রাণের কথা গড়গড় ক'রে বলে যাচ্ছে। যা বলছে, নীলামোতি সত্যি বলে মেনে নিচ্ছে নিশ্চয়। মেনে নিতেই হবে। তার বুদ্ধির দৌড়ের কাছে সকলেই পরাস্ত। নীলামোতি তো শিশু! ভাবগতিকে নীলামোতি সদয়ই তার ওপর।

এবারে আর খুব আস্তে নয়। মধ্যগ্রামে গলা চড়িয়ে ত্যাগানন্দ। মানুষ যখন আপনাকে বড় ভাবে খুব—ভাবে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তখন কাউকে পরোয়ার কথা তার মনের কোণে ঠাঁই-ই পায় না। বাতাসও যে বিশ্বাস ভঙ্গ করতে পারে, গোপন কথা জরুরি সংবাদ হিসেবে কানে পেঁাছে দিয়ে, সে খেয়ালও থাকে না। ত্যাগানন্দের এক একটা কথা বাতাসে গমগম ক'রে উঠছে। আত্মহারা-পাগলপারা হয়ে বলছে ত্যাগানন্দ, আমি সবার সামনে তোমাকে সাধনচক্রের ধর্মপত্নী হিসেবে গ্রহণ করবো। এত বড় শ্রেষ্ঠসম্মান কেউ কখনো তোমাকে দেবে না আর আমি ছাড়া। চক্রে আমি প্রধান, অতএব আমি শিব। তুমি আমার স্ত্রী, অতএব তুমি পার্বতী! তারপর হরপার্বতীর চিন্তা স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলে গোল হয়ে বসে। আমায় ফুল-বেলপাতায় পুজো করবে সবাই। তোমায় জবা-পদ্মে। মঙ্গল আশীর্বাদ নেবে ওরা আমাদের কাছ থেকে। দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠা করবে কে তোমায়?

বুকে হাত দিয়ে, সপ্তগ্রামে গলা তুলে বলেছে, এই আমি। এই ত্যাগানন্দ—এই মুক্তেশ্বরানন্দ।

ত্যাগানন্দের মুখে মুক্তেশ্বরানন্দের নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ ক'রে উঠেছে নীলামোতি! কানে হাত চাপা দিয়ে ভেতরে চলে গেছে তক্ষুনি। সজোরে দরজা বন্ধ করেছে ত্যাগানন্দের দিকে না তাকিয়েই।

কম্বলের বিছানায় আছড়ে পড়েছে নীলামোতি। এও শুনতে

হল। মুক্তেশ্বরানন্দের'তো এ সমস্ত সাধনা নয়। মহারাজের কাছে অনেক শুনেছে তার ব্রহ্মতন্ত্র সাধনার কথা। মানুষ নিজেই শিব নিজেই পার্বতী। জগতের সব মেয়েই মায়ের অংশ। বয়সের তফাতে কেবল ছোটমা বড়মা মেজমা সেজমা—এই যা। আর চক্র? সৃষ্টি ঘুরে ঘুরে নতুন হয়ে আসছে। ব্রহ্মাণ্ড জীবজগতের স্থিতি হচ্ছে বারে বারে। এই স্থিতির শেষে আসছে ফিরে ফিরে লয়। আবার সৃষ্টি আবার স্থিতি আবার লয়। আবার আবার। এই চক্রেই মানুষও নিজে চক্র হয়ে যাচ্ছে। ঘুরছে ফিরছে, আসছে যাচ্ছে, থাকছে।

ত্যাগানন্দও তো সে-সময় ছিল সেখানে উপস্থিত।

মুক্তেশ্বরানন্দ বলেছে ত্যাগানন্দকে, স্বভাবের দোষটুকু শোধরাতে চেষ্টা কর। ও সহজে যায় না। মনকে সদাসর্বদা সতর্ক রাখতে হবে। হেলাফেলা করলে চলে না রে! চলবে না, চলবে না।

ত্যাগানন্দের অতীত খুব সুখকর নয়। যেচে স্বয়ম্বরা হতে চেয়েছে যে মেয়ে, বরমাল্য নিজে হাতে নিয়ে এগিয়ে গেছে, তাকে সগর্বে ফিরিয়ে দিয়েছে ত্যাগানন্দ। ত্যাগানন্দ তখন ত্যাগানন্দ নয়। আগেকার সুখস্বপন। ভালোবাসার প্রলোভনে ভুলিয়ে, শেষে স্ত্রীর দাবী মেনে নিতে চেয়েছে। বিচ্ছেদে জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছে তাকে।

এটাকে পাগলের পাগলামি বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে সুখস্বপন বন্ধুবান্ধবের কাছে। বিয়ের চিন্তাই ছিল না। কোথাকার এক পাগলী এসে বলে কিনা তুমি আমার স্বামী। আমি তোমায় বিয়ে করবো। কোন বোকা মেনে নেবে! নিজের কোন মতামত নেই বুঝি, স্বাধীনতা নেই বুঝি। যে যা বলবে, তাই মেনে নিতে হবে নাকি!

এরপরের ঘটনায় রীতিমতো অভিনয়ের কারিকুরি। অন্য এক মেয়েকে সুখস্বপন বিয়ে করতে এবার নিজে থেকেই উদ্যোগী। বাড়ির অমত। ওঘরে নাকি খাপ খাবে না। এই নিয়ে বাড়ির সকলের দারুণ অশান্তি। এদিকে গুরুজনদের কিছুতেই রাজী করাতে না পেরে অন্যপন্থা অবলম্বন করেছে সুখস্বপন।

অসুস্থ হয়ে পড়ছে রোজই ভবসন্ধ্যেয়। বেহুঁশ বেহুঁশ ভাব। ডাকলে সাড়া পায় না কেউ। থেকে থেকে বিকৃত স্বরে চিৎকার ক'রে

উঠছে। ওই মেরে ফেলছে রে! ওরে বাবারে! গলা টিপছে, গলা টিপছে, গলা টিপছে।

রোজা এনে দেখানো হ'ল। রোজা দেখে শুনে বলেছে, পেত্নী আসে। মন্ত্র পড়ে সরষেপোড়া ছুঁড়েছে ওর গায়ে। ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার করে উঠছে সুখস্বপন। যাবো না। কিছুতেই যাবো না। একে না নিয়ে যাবো না।

রোজা বলেছে, কি নিয়ে যাবি—শীগগির বল বলছি। শীগগির বল।

খোনা আওয়াজে সুখস্বপন বলেছে, আমি সেই মেয়ে' যাকে ও ফিরিয়ে দিয়েছিল। যে মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছে ও, যদি বিয়ে দেয়া হয় তার সঙ্গে—তবেই ছাড়বো। নচেৎ একে নিয়ে তবে যাবো।

ছেলের প্রাণ ভিক্ষে ক'রে পেত্নীর কথায় রাজী হয়েছে বাবা-মা। পেত্নী ছাড়ুক, ছেলে তো বাঁচুক।

জয় হয়েছে সুখস্বপনের।

বিয়ে হয়ে গেছে মনোমতো মেয়ের সঙ্গে। তারপর সুখস্বপনের সুখের স্বপ্ন ভাঙল বিয়ের মাস ছয়েক পরে।

ওর স্ত্রীকে নাকি পুরুষ-ভূতে ভর করে রোজ রাত্তিরে। স্ত্রী হিসেবে না পেয়ে ওর আগেকার পাত্রটি মনের দুঃখে দেশান্তরী হয়ে যায়। তাকে আর কেউ কোনদিন দেখে নি কোথাও। না পথে ঘাটে না দেশে পরদেশে। স্ত্রীর ধারণা, এ পৃথিবীতে নেই ও। ওকে ছাড়ে নি। ভূত হয়ে আসে তার কাছে।

দশ হস্তীর বল ধরে স্ত্রী রাতে।

প্রহারে প্রহারে জর্জর করে তোলে। বাড়ি থেকে যে পালিয়ে বাঁচবে, সে উপায়ও নেই। পেছু পেছু দৌড়বে পোড়া চেলাকাঠ হাতে নিয়ে। এলোচুল আলুথালু বেশ। সাক্ষাৎ রণচণ্ডী।

পালাবো-পালাবো ক'রে সত্যিই পালিয়েছে একদিন সুখস্বপন। ভূতের রোজা কিছু করতে পারল না দেখে, ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছে বাড়ির লোকেরা। ঘুম পাড়ানো ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াতে হচ্ছে প্রতিদিন। ঘুমন্ত অবস্থার সুযোগ নিয়েই সরে পড়েছে সুখস্বপন।

এক দেশ ছেড়ে অন্য দেশে, অন্য দেশ ছেড়ে আর এক দেশে ঘুরে

ঘুরে বেড়িয়েছে। তবু ত্রাস যায় নি। ওই বুঝি পেছু পেছু আসছে স্ত্রী।

হৃষিকেশে মুক্তেশ্বরানন্দের আশ্বাসে আশ্রয়ে এ ত্রাস গেছে।

সেই সুখস্বপন ত্যাগানন্দ নাম নিয়েই কি সত্যিকারের মনে প্রাণে ত্যাগী হয়ে গেছে? হয় নি, হয় নি। নীলামোতিকে স্ত্রীর আসনে বসাতে চায়। সাধুর বেশে অসাধুর কর্ম করে যাবে, নিজেদের অসৎ ইচ্ছে পূরণের জন্য নিজের স্বপক্ষে নানা ভুল তথ্য যুক্তি খাড়া করে, এক সময়ে—মুক্তেশ্বরানন্দের সঙ্গে যোগাযোগ হবার আগে—তাদের সঙ্গ করেছে ত্যাগানন্দ চলার পথে। ওদেরই ক্রিয়াকলাপে মশগুল আছে ত্যাগানন্দ। তাই মাথায় ঘুরছে চক্রসাধনার অন্ধকার দিকটা। সংস্কারমুক্ত মুক্তেশ্বরানন্দের কাছে থেকেই বা কি পেল সে! নেবার ক্ষমতা যার নেই, সে কেমন করে নেবে! কোকিলের কাছে প্যাঁচা হাজার বছর থাকলেও স্বর পাল্টাবে কি। প্যাঁচার কণ্ঠের মাপজোখ যে কোকিলের কণ্ঠের নয়।

প্রথম দিনেই যা দরজা খুলে ফেলেছিল নীলামোতি না জেনে। দ্বিতীয় দিন থেকে ভুলেও দরজা খোলেনি একবারের জন্য।

তবুও নাছোড়বান্দা ত্যাগানন্দ আসবেই প্রতিরাতে। রোজের নিয়ম ঠিক পালন করে যাচ্ছে। আসবে। দরজায় আওয়াজ করবে। ফিরে যাবে রাত পোহাবার আগে নিজের জায়গায়।

চলছে পনের দিন ধরে একই অবস্থা। এ পরিস্থিতি এ পরিবেশ আর ভালো লাগছে না। যেখানে দু'চোখ যায়, চলে যাবে নীলামোতি।

ওর চলে যাবার ইচ্ছেটাই কি সত্যিসত্যি বেজে উঠেছে ত্যাগানন্দের মনের কানে। শুনে আর আসছে না দিন চারেক ধরে। আশা ত্যাগ করার মানুষ নয় ত্যাগানন্দ। মনের কান আছে বলে তো মনে হয় না। আদৌ মানুষটার মনই আছে কিনা সন্দেহ।

যে কোন কারণেই হোক, অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। আসা বন্ধ অসুস্থ নয়, সেটা জানে নীলামোতি। আশ্রমে যায় না বলে একবার ক'রে আসে আনন্দানন্দ। সমস্ত শুনে বলেছে ও, একটু সবুর কর! সব ঠিক হয়ে যাবে। বারে বারে আশ্রমে যেতে বলেছে, লোকচক্ষে বিচ্ছিরি ঠেকছে।

ঠেকুক। ওর মুখ দর্শন করতে ইচ্ছে করছে না মোটে। তুমি আর বোলো না। বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে তোমার। সময়-সময় তোমার ওপরও প্রবল সন্দেহ আসে। তোমাকে চিনতে অসুবিধে হয়। মনে হয়, তুমিও ওরই দলের!

নীলামোতি আনন্দানন্দের ওপরও আস্থা রাখতে আর পারছে না। মতিক-গতিক সুবিধের নয়। কাউকে না বলেকয়েই পালাবে সে। না হলে মুক্তি পাওয়া মুশকিল।

পালাতে হবে রাতে। এখন আসছে না ত্যাগানন্দ। এই সুযোগ!

ঘরের দরজা খুলে বেরোতে গিয়েই পাথর। সামনে দাঁড়িয়ে ত্যাগানন্দ। রাতে নিঃসাড়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে! মিটিমিটি হাসছে ত্যাগানন্দ। নিশ্বাসে উগ্রগন্ধ। দম বন্ধ হয়ে আসছে নীলা-মোতির। পেছু হটছে আস্তে আস্তে। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেবে।

এগিয়ে আসছে ত্যাগানন্দ।

ঢোকবার মুখে লাফিয়ে এসে হাত চেপে ধরেছে নীলামোতির।

কিন্তু কি যে হল, কিছু বুঝতে পারছে না নীলামোতি। হাত ছেড়ে দিয়েছে ত্যাগানন্দ। সর্বশরীর কাঁপছে ওর! মুখ-চোখে ছেয়ে গেছে যত রাজ্যের ত্রাস। যেন কোন ভয়ংকরের মূর্তি দেখছে সাক্ষাৎ। কাঁপতে-কাঁপতে ধড়াস ক'রে পড়ে গেছে।

পেছু ফিরে তাকাতেই অবাক হয়ে গেছে নীলামোতি! মুক্তেশ্বরানন্দ। হাসিমুখে এগিয়ে আসছে।

অস্ফুটে বলে উঠেছে নীলামোতি, মহারাজ!

হ্যাঁ, নীলামোতি। সত্যিই আমি এসেছি।

নীলামোতি ছুটে গিয়েই পা দুটো জড়িয়ে ধরেছে। দু'চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে।

হাত ধরে তুলেছে মুক্তেশ্বরানন্দ। বলেছে, অনেক হয়েছে। আমি জানি একদিন এমন আসবে। আনন্দানন্দকে সব জানিয়েই গোপনে সরে থেকেছি। আর নয়। এবার চলার ব্যাপার।

আনন্দানন্দ এসে হাজির।

মুক্তেশ্বরানন্দ ডানহাতে ধরেছে নীলামোতিকে। বাঁহাতে আনন্দানন্দকে।

চলছে দু'জনে দু'পাশে। এগিয়ে যাচ্ছে সামনে। আরো আরো আরো···।

চলার বিরাম নেই।

এপথের কোথায় শেষ কে জানে! নিজের চিন্তাভাবনা—সমস্তই সমর্পণ করে দিয়েছে নীলামোতি মুক্তেশ্বরানন্দের ওপর। কত না অজানা-অচেনা বিচিত্র পথের ওপর দিয়ে আসতে হয়েছে, হচ্ছেও তাদের। যে পথ লেগেছে মনোরম, যে গাঁওয়ের মানুষদের সরল-প্রাণ উজাড় করা ভালোবাসার বাঁধনে বাঁধা পড়েছে, আশ্চর্যের ব্যাপার—তক্ষুনি মুক্তেশ্বরানন্দ সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছে। এইভাবে সরিয়ে নিয়ে আসতে আসতে কত মানুষজন কত দেশ-গাঁও পাহাড়-নদী বনগাছ ফলফুল জন্তু-পাখী যে সরে গেছে আস্তে আস্তে চোখের সামনে থেকে,বলে বলেও শেষ করতে পারবে না নীলামোতি।

এখন এমন জায়গা দিয়ে যেতে হচ্ছে, পাহাড়ের পর পাহাড়। বন জঙ্গলের মধ্যে দিয়েও এগোতে হচ্ছে। কোথাও বিরাট খাদ। কোথাও দুরন্ত পাহাড়ী নদী—খদ্দ। কখনো খাড়া পাহাড়ে চড়াই। রুক্ষ পাহাড়। গাছগাছালি শূন্য। এক এক জায়গায় আবার এমন মসৃণ-চকচকে পাথরের ওপর দিয়ে যেতে হচ্ছে যে, প্রাণ হাতে করে চলা যাকে বলে। পা পেছলাবার সম্ভাবনা প্রতি মুহূর্তে।

এত সরু পথ—দু'জনে পাশাপাশি যাবার উপায় নেই। ছোট্ট ঘোড়াটা কত সন্তর্পণে না চলছে। একটু উনিশ-বিশে দেহ ছাড়তে হবে গীতার জীর্ণ বসনের মতো। এক একটা বিপদের জায়গা পেরিয়ে সমান জমিতে এসে পড়ে তবে রুদ্ধ-নিশ্বাসের মুক্তি হচ্ছে। পুনর্জন্ম হচ্ছে যেন।

অন্ধকারে-মৃত্যুগহ্বরে একটা আলোর ঝলকে প্রাণের পরশে আনন্দ পাওয়ার মতো আনন্দ হচ্ছে খুব—সময় সময়। দু সারি দেবদারুর সবুজ বন। জায়গায় জায়গায় গাছে আপেল ঝুলছে। বাদাম খোবানি চুলি বেমি কালো আঙুরেও নিজেকে অগোছাল ভাবে সাজিয়ে কত

সুন্দর করে তুলেছে কত সবুজ। দৃষ্টি কেড়ে নেওয়া মনোহারিণী রূপ মাধুর্যে।

কতক্ষণই বা। পাথরের রোদ্দুর ঠিকরে পড়ছে চোখে। চাইতে পারা যাচ্ছে না মোটে। বিশ্বভুবন অন্ধকার দু'চোখে। ঘোড়া থেকে নেমে চলতে হচ্ছে এবার। ওপরে ওঠা নিচে নামা, আবার ওপরে ওঠা, এই খেলাই তো চলেছে জীবনের এই অধ্যায়ে।

আনন্দানন্দ তাকিয়েছে মুখের দিকে। মৃদু হেসে বলেছে, মনটাকে ওপরে উঠিয়ে মানুষ রাখতে পারে কি বেশী সময়? সবার পক্ষে সম্ভব নয়। পাহাড়ে ওঠা নামার মতো মনও ওঠে নামে। প্রকৃতি তার আকর্ষণের অদৃশ্য রশিতে বেঁধে নামিয়ে নিয়ে আসে। সে জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাতেই হোক। মন ঠিক করার সাধনাই আসল সাধনা। মনের বশে না গিয়ে, নিজের বশে মনকে বশীভূত রাখা। প্রকৃত সংযমী করে তুলতে পারলে, নিজের কাছে নিজে জয়ী —সর্বজয়ী। অন্যের কাছে বিজয়ীর প্রতিমূর্তি। আসে দূর—বহু-দূরের প্রকৃত ছবি। আসে ভেসে বাণীও। বর্তমানের আয়নায় ভবিষ্যতের চাক্ষুষ ফলাফল জ্বলজ্বলে হয়ে ফুটে ওঠে।

না-শোনার ভান করেও শুনেছে নীলামোতি। আনন্দানন্দের কথা হেলাফেলায় উড়িয়ে দেওয়ার নয়। মনে দাগ কেটে বসে গেছে। ঠিকই তো। পেছনের জিনিস পেছনে পড়ে থাকছে কই! নীলা-মোতির একটু আগের ভাবনা তো সম্পূর্ণ ভুলে ভরা। সামনে যতই না এগিয়ে যাওয়া যাক, পেছনে সরে যায় না। সময় বিশেষে এগিয়ে আসে একেবারে সামনেরও সামনে।

এগিয়ে এসেছে নীলামোতির বেলায়।

নীলামোতির নিজের দেখাশোনার অতিবাস্তব ঘটনা। একদিকে যেমন করুণের চেয়েও করুণ, তেমনি আর একদিকে আনন্দের চেয়েও আনন্দ—মহানন্দ।

হ্যাঁ, মন ঠিক করার সাধনাই আসল সাধনা। চন্দ্রপ্রকাশের কথারই আনন্দানন্দের মুখে প্রতিধ্বনি হতে শুনেছে। এই দুর্গম দেশে হিমালয়ের কোলে। পুরাণের কুবের-চিত্ররথের রাজ্যে—কিন্নরদেশে।

ভিনদেশে ভিন্ন পরিবেশে অদেখা-অজানা মানুষজনের মধ্যে এসেও মনের কোণ থেকে চন্দ্রপ্রকাশ সরেছে কোথায়! পুরোমাত্রায় বর্তমান

রয়েছে। তা নাহলে অতীতের ঘটনা এক এক করে এত স্পষ্ট হয়ে উপস্থিত হতে পারত কি ?

খুড়তুতো দাদার দৌলতেই চন্দ্রপ্রকাশের সাক্ষাৎ পেয়েছে নীলামোতি। শুনে, একা যাওয়া তার পক্ষে দুষ্কর ছিল। চতুর্দিকে জঙ্গলে জঙ্গলে। তাছাড়া মরা মানুষের ভাঙাচোরা সমাধির ইটপাথর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এপাশে ওপাশে। বিযাক্ত সাপখোপের আড্ডায় কার না ভয় ধরে কাছে যেতে !

দেখে অবাক নীলামোতি।

চন্দ্রপ্রকাশের ভয়ডর বলে কিছু যেই। হয়তো ঈশ্বর ওকে ঘর-ছাড়া ক'রে পথের পথিক করবে বলে করুণা ক'রে সাহসটুকু দিয়েছে। ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ।

নীলামোতির ধন্যবাদ দেওয়া না দেওয়ায় ঈশ্বরের কিছু এসে যায় না। এসবের ধারও ধারে না ঈশ্বর। সব জেনেশুনেও নীলামোতির মন চেয়েছে বলেই দিয়েছে।

একটা ভাঙা সমাধিস্তম্ভের পাশে বসে চন্দ্রপ্রকাশ। নির্ভীক নির্বাক। দুচোখ বোজা। ধ্যানমগ্ন। সারা গায়ে যজ্ঞভস্মের চিহ্ন ছড়িয়ে। মাথার জটা পিঠ বেয়ে মাটিতে লুটোচ্ছে। পরনে কৌপিন। হাতে রুদ্রাক্ষের তাগা-বালা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা আর শিঙা। কানে কুণ্ডল। চন্দ্রপ্রকাশ নাথপন্থী। গোরক্ষনাথদের ঘরের। কানে কানে পরিচয় শুনিয়েছে খুড়তুতো দাদা।

ছোটবেলা থেকেই দেখে এসেছে নীলামোতি, বলতে গেলে বাড়ির প্রায় লোকেরই একটা সাধু-সাধু বাতিক। কোন জায়গায় কোন সাধু এসেছে শুনলে আর রক্ষে নেই। বাড়ির ছোট-বড় সবাই অমনি ছুটল। নীলামোতিকে অনেকের সঙ্গে সঙ্গী হতে হয়েছে। না যেতে চাইলে, জোর করে ধরে নিয়ে গেছে কাকীমারা। ছোটকাকীমা তো চিনে-জোঁক। একেবারে নাছোড়বান্দা।—দ্যাখ নীল! ধর্মেকর্মে একটু মতি আনতে চেষ্টা কর। ভবিষ্যতে ভালোই হবে। ভালো বর পাবি, ঘর পাবি।

নীলামোতির ঘর-বরের চিন্তা ছিল না তখন মাথায়। আট সেরে নয়ে পা বাড়িয়েছে সবে। যেত না যে তা নয়। তবে যাওয়াটা স্রেফ ওদের পেড়াপীড়ির জন্যই।

এবারেও ছোটমাকীমার জিদেই চন্দ্রপ্রকাশের কাছে আসতে হয়েছে। ছোটকাকীমা-ছোটকাকাবাবু আর দাদা। ছোটকাকীমার জিদ হলেও, দাদার দৌলত বলতেই হবে। গাঁয়ে-গঞ্জে বলে মা রাজী হয় নি। নীলের একে শরীর খারাপ। জ্বরো জ্বরো ভাব। শেষে অসুস্থ হয়ে পড়বে বেশী। অন্যদিন না হয় যাবে'খন।

দাদাই নীলামোতির কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছে বেশী ক'রে।— চ'না! কত কি আশ্চর্য জিনিস দেখবি, আশ্চর্য জিনিস শুনবি। ভাঙা মন্দিরের ভেতর থেকে ভেসে আসে আরতির বাজনা। নেই কোন দেবতা, নেই কোন পুরোহিত।

যাবার জন্য জিদ বেড়ে উঠেছে জেদী মেয়ে নীলামোতির। কাকীমার চতুর্গুণ জিদ। রাজী না হয়ে মায়ের আর উপায় কি! মত দিয়েছে। দাদাকে ভালো ক'রে বুঝিয়ে বলেছে, পাগলীটাকে লক্ষ্য রাখবি রণেন।

নীলামোতি মায়ের একা। না আাছ অন্য বোন, না আছে একটা ভাই। খুড়তুতো দাদাকে মা দিজের পেটের ছেলের মতো ভালোবাসত। নীলামোতিও নিজের দাদার মতোই জ্ঞান করত। আর দাদা? নিজের বোনের চেয়ে বেশী।

দাদার জন্যই আসা নীলামোতির হুগলীর মহানাদ গ্রামে। অজ পাড়াগাঁয়ের অবস্থা মহানাদের। শোনা গেল, এখনকার মতো অবস্থা নাকি আগে ছিল না। কি রমরমা ব্যাপার। নাথযোগীদের মঠ-মন্দির। মেলা পার্বণে ভিড়ে ভিড়। তিলধারণের জায়গা থাকে নি। শিবরাত্তিরে জটেশ্বরে নাথের শিবের মন্দিরে কি ধুমধড়াক্কা।

সেই জটেশ্বরের মন্দির রয়েছে। চত্বরের কোণে একটা বেদীর ওপর লোহার দণ্ড গাঁথা। মহাকাল নাকি। পাশে নিমগাছ। কাছেই বিরাট বটগাছের তলা—কালীতলা। নেই কোন মূর্তি। আছে ঘট আর দুটো লাল সিঁদুর মাখানো নরমুণ্ডু। দেখতে দেখতে চোখ ফেরাতেই নজরে পড়েছে, পাথরের বিরাট গৌরীপট্ট। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। শিবলিঙ্গ নেই। থাকলে বোধহয় একতলা সমান উঁচু হত। মন্দিরের উত্তরে বশিষ্ঠগঙ্গা—বড়পুকুর।

সবই দেখল, সবই শুনল নীলামোতি। কিন্তু নূপুর আর শাঁখ-ঘণ্টার আওয়াজ কানে এলো না একটুও। দাদার সঙ্গে কথা কইতে

ইচ্ছে করে নি নীলামোতির। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে, জীবনে কোথাও যাবে না আর দাদার সঙ্গে। যত সমস্ত ধাপ্পা। মিছিমিছি আসা সার হ'ল।

এদিকে কাকীমা তো চন্দ্রপ্রকাশের সামনে গিয়ে বসেছে একেবারে। ঘাসের ওপর বাবু হয়ে বসে বসে একদৃষ্টে দেখছে চন্দ্রপ্রকাশকে। মুখের দিকে লক্ষ্য বেশী। ওই মুখের কি রহস্য ভেদ করবে, কে জানে! হাঁটুগেড়ে কাকীমার পাশে বসেছে দাদা। খোন্তা-ত্রিশূলটা যে ধারে পোঁতা, অর্থাৎ চন্দ্রপ্রকাশের ডানদিকে। নীলামোতিকে বারবার ডাকছে। ইশারায়।

নীলামোতি যাবে কি, মনই চাইছে না। এদের রকম সকমও ভালো লাগছে না। যত সব পাগলামি। এখান থেকে পালাতে ইচ্ছে করছে।

নীলামোতির ভাবগতিক দেখে বোধ হয় কিছু আঁচ করেছে দাদা। নীলামোতির প্রকৃতি তো জানতে আর বাকি নেই দাদার। রাস্তাঘাট চিনুক, না চিনুক খেয়ালখুশি মতে চলে যাবে। ভীষণ বেপরোয়া। এ পরিচয় পাওয়া গেলে এক আধবার নয়। বেশ ক'বার। তীর্থক্ষেত্রেই এ ব্যামো পেয়ে বসে ওকে যেন। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ মেয়ে আনমনা হয়ে চলেছে অন্যপথে। কেন? একঘেয়েমি ভালো লাগছে না বলে। কোথায় যাওয়া হচ্ছে? জানে না। যেখানে দু'চোখ নিয়ে যায়।

মেয়ের স্বভাব জানে বলেই তো মা অত করে দাদাকে নজর রাখার কথা বলেছে। নীলামোতিকে লক্ষ্য রাখবে। মনের কথা টেনে বার করতে চেষ্টা করেছে দাদা!—তোর যদি এখানে ভালো না লাগে, চ' ফিরে যাই দু'জনে। মা-বাবা থাকুক পড়ে।

—তোমার সঙ্গে আবার? বলার ঝাঁঝে বিদ্রূপ।

—কেন? কি অপরাধ আমার?

—মিথ্যে কইতে বারণ কর। নিজে কি সত্যবাদী যুধিষ্ঠির? তোমার নূপুর ঘণ্টা-আরতি কই?

—মা-ই তো বলেছে। মাকে নাকি চন্দ্রপ্রকাশ সাধু বলেছে। শুধু বলাই নয়, সামনা সামনি বসিয়ে স্বকর্ণে শুনিয়েছেও। মাকে ধরলে, তুইও পাবি।

হাসি ফুটেছে নীলামোতির মুখে। এখান থেকে আর এক পা-ও নড়ছে না। শুনে, তবে যাবে।

নিজেই পায়ে পায়ে এসে বসেছে কাকীমার পাশে, চুপ করে। চন্দ্রপ্রকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেই বোধ হয় শুনতে পাওয়া যায়। তাই তীর্থকাকের মতো কাকীমা চেয়ে আছে একভাবে। চোখের পাতা নড়ছেও না, পড়ছেও না। নীলামোতির চোখে তো জ্বালা ধরছে, জল ভরে উঠছে। এমনভাবে চুপচাপ বসে থাকা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাঁপিয়ে উঠছে নীলামোতি। রুদ্ধনিশ্বাস বেশ সজোরেই আছড়ে পড়েছে ভেতর থেকে বাইরে এসে।

কাকীমা চমকে উঠেছে।

আর চন্দ্রপ্রকাশ?

শুধু চমকানোই নয়, মাটি থেকে লাফিয়ে ওঠার মতো বসে বসেই প্রায় আধ বেগদাটাকে ওপরে উঠেই, ওই অবস্থাতেই নেমে পড়েছে আবার মাটিতে—মুহূর্ত মধ্যে। দু'চোখ খুলে তাকিয়ে রয়েছে ফ্যাল-ফ্যাল করে। মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোচ্ছে না। কেমন যেন হয়ে গেছে। বাঁদিকের বুকটা যে তাড়াতাড়ি লাফাচ্ছে, চামড়ার ওপর থেকেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

কাকীমা বড় বড় চোখ ক'রে নীলামোতির দিকে একবার তাকিয়েই উঠে পড়েছে। চন্দ্রপ্রকাশের বুকে হাত বুলোচ্ছে। মুখে বলছে খুব আস্তে আস্তে, বাবা ক্ষমা করুন, বাবা ক্ষমা করুন। অবোধ মেয়ের অপরাধ ক্ষমা করুন। ও কিছু জানে না বাবা। ও কিছু জানে না। বলতে বলতে কাকীমা তো কেঁদেই ফেলেছে।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে মুখ খুলল এবার চন্দ্রপ্রকাশ।—থাক আর হাত বুলোতে হবে না। তুমি কেমন আছো? এ মেয়েটি কে?

একগাল হেসে কাকীমা বলেছে জোড়হাত করে, আপনাদেরই আশীর্বাদ বাবা। এটি আমার ভাসুরঝি। বড় অস্থির মতি। বড় গোঁ। কারো কথা শুনবে না, নিজের মতেই চলবে। বড় বিপদ হয়েছে আমাদের। পরের ঘরে গেলে কি এসব সাজবে! তারা সহ্য করবে কেন বলুন তো! বারো তো চলছে, এখনো যদি হুঁশিয়্যবুদ্ধি না হয় আর হবে কবে! আর কদিনই বা রাখা যাবে ঘরে! আমাদের ঘরে

আবার বেশী দিন রাখার নিয়ম নেই। জোর আর দু'চার বছর। একটু মাথায় হাত দিন বাবা। যাতে শান্ত হয়, সুবুদ্ধি আসে।

হেসে বলেছে চন্দ্রপ্রকাশ, কই—তোমার কথার সঙ্গে ওকে তো মেলাতে পাচ্ছি না। মেয়ে তো ভালোই দেখছি। এত যদি অবাধ্য ও হয়, নিজের গোঁয়ে নিজেই যদি চলে, তাহলে তোমাদের সঙ্গে এলো কি ক'রে এখানে! কেন এসেছে?

কাকীমা কি বলতে যাচ্ছিল, মুখের কথা বেরোবার আগেই নীলামোতি বলে উঠেছে, নূপুর-ঘণ্টার লোভে।

হো-হো ক'রে প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠেছে চন্দ্রপ্রকাশ। বলেছে, ওঃ। বুঝেছি।

এরপর সহজ-সরল ভাষায় খুব আস্তে আস্তে বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলেছে চন্দ্রপ্রকাশ নূপুর-ঘণ্টা শোনার প্রকৃত গূঢ় রহস্যের কথা। বলেছে শোনার রীতিনীতি অভ্যেস করার কথা। নীলামোতি সব বুঝেও যেন বুঝতে পারে নি। একটু খটমট ঠেকেছে। তবে প্রত্যেক কথাই বর্ণে বর্ণে মনে দাগ কেটে বসে গেছে।

কাকীমা বলেছে, বাবা, ও বাচ্চা! ওর বোঝবার বয়স নয় এখন। বৃথা পণ্ডশ্রম করছেন আপনি। আপনিও ছেলেমানুষ হলেন দেখছি। তার চেয়ে বরং আমায় তৈরী করুন। কাজ হবে। কোনদিন কখন আবার আসবেন এখানে, লোক মারফত হরদম খোঁজ নি। আসার দিনের অপেক্ষায় অস্থির হয়ে বসে থাকি।

—থাক! নিজেকে আর অত ক'রে জাহির করতে হবে না। মনের সাধনাই আসল। স্বার্থপর হলে, মনের সাধনার সিদ্ধিলাভ করা যায় না। স্বার্থটাই তো প্রধান বাধা। ওটাকে ভেতর থেকে বার ক'রে নির্বাসনে দিতে না পারলে, সমস্ত ব্যর্থ হতে বাধ্য। যাই করো না কেন—সব ওপর ওপর! সব দেখানো।

চন্দ্রপ্রকাশের এ ধরনের আদেশ-উপদেশ—বিশেষ করে নীলামোতির সামনে, কাকীমা খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ভেতরের অস্বস্তির ছায়া মুখময় ছেয়ে গেছে।

বাড়িতে ফিরে আসার পর কি হেনস্থা না ভোগ করতে হয়েছে নীলামোতিকে। অপয়াকে নিয়ে গিয়ে কি হালই না হ'ল কাকীমার! পাপ-পাপ। চারদিক থেকে পাপ ঘিরে ধরেছে তাকে। এ বাড়ি

ত্যাগ না করতে পারলে, মুক্তি নেই। কোন সাধন-ভজন হবার উপায় নেই। সবেতে বাগড়া। এখানে থাকলে ছেলেটাও মানুষ হবে না। উচ্ছন্নে গেছে। 'জেঠিমা, জেঠিমা' করে দিনরাত বড়জায়ের ঘরে। বড়জা তো মাথা খাবার একখানি। আদিখ্যেতা দেখিয়ে দেখিয়ে যেমন তৈরী করেছে নিজের মেয়েকে, তেমনি রণেনকেও তৈরী করবার মতলব।

ছোটবৌ কি কিছু বোঝে না নাকি? ঘাসে মুখ দিয়ে যে চলে না, এটা জানা দরকার। ছেলেটাকে একেবারে বে-হাত ক'রে ফেলেছে গা! মায়ের চেয়ে দরদ বেশী জেঠির ওপর! ঘরশত্রু বিভীষণ।

কাকীমার চিৎকারে চারতলার চিলের ছাতেও কাক-চিল বসতে পারে নি।

নীলামোতিকে কাকীমা যাই বলুক না কেন, নীলামোতির মনে কোন দাগ কাটে না। কিন্তু মাকে যা-তা, দাদাকে যা-তা—বড় কষ্ট হয়েছে।

থামাবার জন্য কাকীমার ঘরের দিকে যেতে, মা হাত ধরে টেনে নিয়ে এসেছে।—নীল! ছোটবৌয়ের মাথায় গোলমাল। ওর কথা কানে নেয় কেউ! ওর মুখ যেমন, মন তো তেমন নয়। কারো অসুখ-বিসুখে ওই তো ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘেন্নাপিত্তি জলাঞ্জলি দিয়ে। সেটা কম গুণের কথা!

মা কোলের কাছে আদর ক'রে বসিয়ে, মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলেছে, তুই না এসে কত কথা বললি। মনের সাধনাই আসল। আরো কত কি। তোর মন যদি ওদিকেই যায়—ঝগড়া-ঝাটির দিকে, কি জ্ঞান হ'লরে তোর ওখানে গিয়ে! নীল এটুকু জানবি, মন দিয়ে মন ঠিক রাখার চেষ্টা না করে, শুধু মুখে বললে কিছু হয় নারে। কিছু হয় না। প্রকৃত জ্ঞানী হ'। তোতাপাখী হয়ে লাভ কি? কোন লাভ নেই। বরং পুরোটাই লোকসান।

তখনকার মতো ঘর থেকে বেরোয় নি আর। এককোণে বসে বসে গোমরাচ্ছিল। মা ঠাকুর ঘরে যেতেই—সেই ফাঁকে পালিয়ে গিয়ে একেবারে ছোটকাকীমার ঘরে।

নীলামোতিকে দেখে কাকীমার আপাদমস্তক জ্বলে উঠেছে। মুখ-খানা ঘুরিয়ে নিয়েছে। পান চিবোনার সঙ্গে সঙ্গে চিবিয়ে চিবিয়েই

বলেছে, বেহায়াপনা আর কাকে বলে! একটুও লজ্জাই হ'ল না আসতে।

নীলামোতি পা দু'টো জড়িয়ে ধরে বলেছে, ক্ষমা কর কাকীমা। আর যাবো না তোমাদের সঙ্গে।

—ও মা গো! কি ধড়িবাজ মেয়েরে বারা! কাকীমাকে ঝগড়াটে প্রমাণ করতে এসেছে দেখো ক্ষমা চেয়ে! পেটে-পেটে কি শয়তানি বুদ্ধি! নিশ্চয় মায়েরই শেখানো এসব। উনি তো সবার কাছে ভালো হয়েই রইলেন এইভাবে কলকাঠি নেড়ে নেড়ে। কেউ না চিনুক, ছোট-বৌয়ের চোখ এড়িয়ে যাবার উপায় নেই কোন।

পাছে মায়ের কানে কোন কথা যায়, তাড়াতাড়ি নীলামোতি পালিয়ে এসেছে ঘরে। এলে হবে কি! কাকীমা ছাড়বার পাত্রী নয়। ঠাকুর ঘরের বন্ধ দরজার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারস্বরে চিৎকার।— আপনি রইল্যা ডহর পানিতে, পোলারে পাঠাইছে চর। নিজে ঠাকুরঘরে ঢুকে সাধুমা সাজা হচ্ছে। আহা-হা-হা। গুণে নুন দিতে নেই।

নীলামোতির অনুশোচনার অন্ত নেই। মায়ের আঘাত বন্ধ করতে গিয়ে আরো বেশী আঘাত দিয়ে ফেলল যে। কাকীমার তর্জনগর্জন চলল খানিক সময় ধরে। দরজা খোলা তো দূরের কথা, টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেনি মা একবারের জন্যও। কোনদিন কোন সময় কারো সঙ্গে কোন বাদপ্রতিবাদ করতে দেখেনি নীলামোতি।

নীলামোতির মনে হয়, সব মায়ের চেয়ে নিজের মা যেন একটু আলাদা-আলাদা।

কাকীমা আবার এক বিচিত্র ধরনের। গর্জনের পর বর্ষণ হবেই। এক্ষেত্রেও সেই দৃশ্যের পুনরাবির্ভাব। ঠাকুর ঘরের বন্ধ দরজার সিঁড়ির ধাপে বসে হাউহাউ ক'রে কান্না। বড়দি! আমি মাথাকুটে মরবো এখানে দরজা না খুললে। নীল তোমার মেয়ে বলে, আমারও কি মেয়ে নয়! অন্যায়ে মেয়েকে কি মা বকে না! সেজন্য তুমি রাগ করবে কেন? আমাকে ঘেন্না করবে কেন? কেন আমার মুখ দেখবে না? কেন কেন কেন? মা-মরা মেয়ে এসেছিলুম এ বাড়িতে। তোমার কাছে মাকেই পেয়েছিলুম যে। আজ তোমারও এই ব্যবহার!

একথা শোনার পর মা আর স্থির থাকতে পারে নি। দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে। কাকীমাকে জড়িয়ে ধরে হাপুস নয়নে কেঁদেছে।

বলেছে, ছোটবৌ, আমি সেই আমি আছি রে। আমি সেই আমিই আছি।

মা-কাকীমার চোখের জলে নীলামোতির চোখের জল বাধা মানে নি। পাতা উপচে ঝরেছে ঝরঝর ক'রে। মা-কাকীমার আঁচলেই ওদের চোখ মুছিয়ে দিয়েছে বারে বারে।

তার পরদিন কাকীমা একরকম জোর করে মাকে আর নীলামোতিকে নিয়ে এসেছে মহানাদ গ্রামে—চন্দ্রপ্রকাশ সাধুর কাছে। মা দুদিন দেরী করতে চেয়েছে। কাকীমার তর সয়নি। ওনাকে পাওয়া মুশকিল। এই আছে এখানে, এই আছে সেখানে। কিছু কি ঠিক ঠিকানা আছে নাকি। শুভস্য শীঘ্রম। ওনাকে ধরে করে নীলের মন মেজাজ ঘোরাতেই হবে। ওর সব গুণ আছে। খালি অভিমান আর অতিরিক্ত জিদটা চলে গেলেই—রূপেগুণে লক্ষ্মী-সরস্বতী মেয়ে আমার। চন্দ্রপ্রকাশ সাধু বলেছেন, ও ভালো মেয়ে। নিশ্চয় ওর মধ্যে কিছু দেখেছেন। এই সুযোগ।

প্রথম দিনের মতো দ্বিতীয় দিনেও ওই একই জায়গায় একইভাবে বসে চন্দ্রপ্রকাশ। তবে আগের দিনের চোখবোজা অবস্থা নয়। খোলা। চোখ দেখলে লুটিয়ে পড়ে মাথা দু'পায়ে আপনা থেকেই। স্নেহ-মাখানো টানা টানা চোখ। কি স্নিগ্ধ দৃষ্টি। দেখলে মনে হয় না কখনো চণ্ডাল ক্রোধের উন্মত্ত তাণ্ডবে ওই আঁখির আঙিনা কেঁপে উঠেছে কি থর থর?

কিন্তু কাকীমা তো চন্দ্রপ্রকাশের চোখ সম্বন্ধে খুব করুণ কাহিনী শুনিয়েছে মাকে। কাকীমার বাপের বাড়ির পাড়ায় নাকি কম বয়সে থেকেছে চন্দ্রপ্রকাশ। থেকেছে ওর মাসীমার কাছে। মাসীমা বলতে নিজের নয়, মায়ের বন্ধু কুসুমকামিনী। দেখে, কোন অচেনা লোকের বোঝার সাধ্যি ছিল না—চন্দ্রপ্রকাশ কুসুমকামিনীর পেটের ছেলে নয়। বরং নিজের ছেলেদের চেয়ে ওর আদরটাই বেশী ছিল।

এ আদর সইল না ছেলেদের আর বাড়ির কর্তার বুকে। কর্তা তো কুসুমকামিনীকে তামাশার ছলে বলেছে, আমার ছেলেরা কি তোমার সতীন-ছেলে যে ওদের ওপর তোমার এতটুকু নজর নেই? যত লক্ষ্য চন্দ্রপ্রকাশের ওপর!

কুসুমকামিনী তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসেছে বারান্দায়। এদিক-

ওদিক তাকিয়ে সিঁড়ি অবধি গিয়ে দেখে এসেছে। স্বামীকে মৃদু-স্বরে বলেছে, কি যে কর তুমি! মা হারা ছেলে। যদি শুনতে পায়, এবাড়ির ত্রিসীমানায় থাকবে আর!

—থাকবে, থাকবে। এত সুখ পাবে কোথায়!

কুসুমকামিনীর ভালো লাগে নি। বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে। কথায় কথা বাড়াতে চায় নি আর। অবুঝকে বোধ দিতে যাওয়া বোকামি। অশান্তির সৃষ্টি।

বাপের মনোভাব ছেলেদের মুখেও প্রকাশ পেয়েছে নানাভাবে। দেখেশুনে চন্দ্রপ্রকাশের ওপর কুসুমকামিনীর স্নেহ বেড়ে গেছে দ্বিগুণ। চোখে চোখে রেখেছে ওকে।

শোনা যায় এক দরজা যদি বন্ধ থাকে কারো, ঈশ্বর অন্য দরজা খুলে রাখে তার জন্য। হ্যাঁ, প্রথমেই বিচার আচার না ক'রে একেবারে দোষ দেওয়াটা অন্যায় হবে। চন্দ্রপ্রকাশের এক দরজা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে খুলে দিয়েছে ওর জন্য অন্য দরজা। কুসুমকামিনীর। খুলে দিয়েছে বটে, কিন্তু বন্ধও করেছে কিছু পরে। নির্দয় হাতে যাকে বলে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ির বাইরে বার করে দিয়ে, মুখের ওপর সজোরে দরজা বন্ধ।

কুসুমকামিনী এতখানি অন্যায় বরদাস্ত করেছে কেমন করে।

বরদাস্ত করার মেয়েই নয় কুসুমকামিনী। নিজের দাপটে সকলের দম্ভ চুরমার করে গুঁড়িয়ে দেবার মেয়ে সে। তবে এমন হ'ল কি ক'রে? হ'ল, বরাত ভাঙল বলে। কার বরাত? না, কুসুমকামিনীর নয়। চন্দ্রপ্রকাশের। ভাঙল, না নতুন দুনিয়ায় গড়ে উঠল, বর্তমানে ঠিক বুঝে ওঠা দুষ্কর হয় অনেকের অনেক সময়। উপস্থিত চোখে দেখে ধরে নিতে হবে চন্দ্রপ্রকাশের নসিব মন্দই। তা না হলে, কোথাও কিছু নেই—জ্বরজ্বালা-অন্যব্যামো, আচমকা জলজ্যান্ত মানুষটা বুক কেমন করছে বলে সেই যে বিছানায় শুয়ে পড়ল, মনে হ'ল ঘুমিয়ে পড়ল মুহূর্তে। গভীর ঘুম। ঘুম আর ভাঙে নি।

মানুষের মন চেনা দায়।

পশুদের প্রকৃতি তবু বুঝতে পারা যায়। রাগে দুঃখে শোকে যেটুকু দেখা যায়, প্রায় ক্ষেত্রেই নির্ভেজাল। কিন্তু মানুষের বেলায়?

সকলের না হলেও অনেকের বিশেষ ব্যতিক্রম বিশেষ করে লক্ষ্য পড়ে।

কুসুমকামিনীর স্বামী-পুত্রেরাও সেই বিশেষ ব্যতিক্রমের দলে। আশ্চর্য ! কুসুমকামিনী চলে যেতে যেন ওদের গলার কাঁটা নেমেছে। কুসুমকামিনীর বাপের বাড়ির সম্পত্তি—বাড়িঘর। যদি বেহাত হয়ে যায়। চন্দ্রপ্রকাশের ওপর যেরকম টান, লিখেপড়ে না দেয় শেষে। এ ভয়টা ওদের অহেতুক ছিল না। রেগে গেলে, কুসুমকামিনী বলেছে, ওর পেছনে লাগা! বাচ্চাটাকে তাড়াবার জন্য উঠিপড়ি লেগেছে বাপ আর ছেলেরা মিলে। কেবল অজুহাত খোঁজা। সবেতে দোষ ধরা। আমার বিষয়, আমি ওকেই দিয়ে যাবো। দেখি, কার কত ক্ষমতা, আটকায় কি ক'রে।

মানুষের অন্ধকার দিকটা এত ঘন। দয়া মায়া ক্ষমা স্নেহ বিবেক বুদ্ধি একেবারে নিশ্চিহ্ন সেখানে। এটাই নিখুঁত ভাবে ধরা পড়েছে কুসুমকামিনীর অবর্তমানে। এরা বিষয়টাকেই ভালোবেসেছে। কুসুমকামিনীকে নয়।

পাড়ার ছেলেয়-ছেলেয় খেলা নিয়ে ভুল ঠিকের তর্কাতর্কি, তারপর হাতাহাতি। ধারেকাছে ছিল না চন্দ্রপ্রকাশ। দোকান করতে পাঠিয়েছে বাড়ির কর্তাই। ফিরে আসতেই হলুস্থুল।—চন্দ্রপ্রকাশই পালের গোদা, এই মারদাঙ্গার ব্যাপার বাধিয়ে দিয়ে সটকে পড়া। বাড়ির মানইজ্জত যেতে বসেছে এই পাজীটার জন্য। টেকা দায় পাড়ায়! লোক এসে বলেছে, তোমাদের বাড়ির ছেলে, তোমাদের বাড়ির ছেলে! কেন সহ্য করবো আমরা!

বাপ আর দুই ছেলে মিলে চন্দ্রপ্রকাশকে মারধোর করতে কসুর করেনি। চড়-চাপড় কিল-লাথি, কিছু আর বাকি রাখেনি। মাথাটা ধরে জোরে দেয়ালে ঠুকে দিতে আর্তনাদ করে উঠেছে চন্দ্রপ্রকাশ।

কুসুমকামিনীর অন্তরঙ্গ প্রতিবেশী পাশের বাড়ির সেবিকারানী আর থাকতে পারে নি। ওদের ভেতরের বারান্দা থেকে এবাড়ির উঠোন পরিষ্কার দেখা যায়। নির্যাতন দেখে, সহ্য করতে পারে নি আর। ওরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই এসেছে!

চন্দ্রপ্রকাশকে টেনে নিয়ে গেছে।

বাড়ি থেকে বেরোবার মুখে চন্দ্রপ্রকাশের শেষ খোয়ারটুকুও করতে ছাড়ে নি ওরা। পাড়া মাতিয়ে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে চিৎকার

করে বলেছে, বেইমান ! বেইমান বলেই চলে যাচ্ছে অপরের হাত ধরে। অজ্ঞাত কুলশীলকে অশ্রয় দিয়ে খুব হ'ল। একটা আস্তাকুঁড়। ছোঁয় কে ? ফুটপাতে যার আস্তানা, তার এখানে সইবে কেন !

চন্দ্রপ্রকাশ জানে, সে আস্তাকুঁড়। মা মরে যাবার পর কোথাও যেতে চায় নি তো সে। পথের ছেলে পথেই নেমে পড়তে গেছে। কামিনীমাসী বুকে জড়িয়ে ধরেছে।—তুইও আমার একটা ছেলে রে চন্দ্র ! আমি তো বেঁচে আছি। ছাড়ছে কে, ছাড়বে কে তোকে !

কামিনীমাসী মায়ের সুখেদুঃখে অনেক এসেছে। অনেক করেছে। মায়ের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একই ওস্তাদের কাছে দু'জনেরই গানের তালিম নেওয়া আবার। জানাশোনা বাড়ি বাড়ি গিয়ে গানের অনেক ছাত্রীও করে দিয়েছে মায়ের কামিনীমাসী।

গান শিখিয়েই মা মানুষ করেছে চন্দ্রপ্রকাশকে। ভয়ানক আত্মাভিমান ছিল মায়ের। অবস্থাপন্ন বাপের বাড়ি, যায়নি কোনদিন হাত পাততে।

জন্মে অবধি বাবাকে কখনো দেখে নি চন্দ্রপ্রকাশ। বাবার কথা জানতে চাইলে মা মৌন থেকেছে। একদিনের ঘটনায় সমস্তই প্রকাশ হয়ে পড়েছে চন্দ্রপ্রকাশের কাছে। কারণ ছিল অতি তুচ্ছ। স্কুলের বন্ধুদের মুখে শুনে শুনে চন্দ্রপ্রকাশের খুব রাগ হয়েছিল মায়ের ওপর। বন্ধুদের মায়েরা কত ভালো ভালো জিনিস খাওয়ায় রোজ। এক একদিন এক রকমের মাছ। আবার মাংস। কত ভালোবাসে তাদের ছেলেদের। মা তাকে একদমই ভালোবাসে না। শুধু ডাল আর আলু সেদ্ধ। তা আবার রোজই।

মনে মনে মতলব ভেঁজেছে চন্দ্রপ্রকাশ। মাকে জব্দ করতে হবে। খাবে না কিছুতেই ও খাবার আর। মায়ের জিদ ওই ডাল সেদ্ধ আর আলুভাতে ভাত খেতেই হবে। ভাতের থালা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে চন্দ্রপ্রকাশ। থালার কানায় মায়ের পায়ের কড়ে আঙুল কেটে রক্ত বেরিয়েছে।

মায়ের মুখে কোন কথা সরে নি।

কেবল একদৃষ্টে দেখেছে চেয়ে চেয়ে। কিছুক্ষণ। তারপর একটা চাপা নিশ্বাস বুক খালি করে বেরিয়ে এসেছে। অস্ফুটে বলেছে মা, সেই মুখ সেই চোখ সেই প্রকৃতি। একেবারে রাগলে যেমন হ'ত।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে মা। দু'চোখে হাতচাপা দিয়ে নিঃসাড়ে বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে।

দশ বছরের হলে কি হবে, বিশ বছরের প্রখর বুদ্ধি চন্দ্রপ্রকাশের। মায়ের কান্না মায়ের কথাবার্তা সব কিছু বড্ড নতুন ঠেকেছে। তার ব্যবহারে মা এত কষ্ট পাবে, বুঝতে পারেনি। ভেতরে রীতিমতো অস্বস্তি। একটা অজানা ব্যথা বিঁধেছে থেকে থেকে।

কদিন লজ্জায় অনুশোচনায় মায়ের সামনে মুখ তুলে তাঝায় নি। থালা ছোঁড়ার পর থেকে কোনদিন আর কাছে থাকে নি মা খাবার সময়। দিয়েই চলে গেছে। ডাল-আলুর বদলে মাছ-ভাতই দিয়েছে। কোন কথা বলার সাহস হয়ে ওঠেনি চন্দ্রপ্রকাশের।

এমনিতেই মা একটু গম্ভীর গম্ভীর! এবারে ভীষণ গম্ভীর। দুর্বল থাকলেও, আরও একটু বেশী দুর্বল। সদাসর্বদা মুখখানা বিষণ্ণ। লুকিয়ে আড়চোখে দেখলে নজরে পড়ে চোখের কোণায় জল জমে রয়েছে।

ছুটে গেছে চন্দ্রপ্রকাশ কামিনীমাসীর বাড়ি। নিজের দোষের কথা, মায়ের অবস্থার কথা খোলাখুলি বলেছে। কামিনীমাসী পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছে।—ভাবিস না। আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে।

কামিনীমাসী বলতে গিয়েও খানিক চুপ ক'রে থেকে আবার মুখ খুলেছে।—মায়ের কোন দোষ নেই। না জানার চেয়ে, জেনে রাখা ভালো। মা কোনদিন বলবে না তার দুঃখের কথা। মরে গেলেও না।

ওর সুখের জীবন শিল্পীর জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে বিয়ে হবার পর থেকে। বাবাদের বংশটাই একটু অস্বাভাবিক প্রকৃতির। দৌলতের মহিমায় দানব বেরিয়ে আসে সময় সময়। ও-বংশের মানুষের ভেতর থেকে। বাবা বিয়ে করতে চায় নি। সংশোধন করতে চেয়েছে নিজের রক্তের ধারা। সাধুসন্ন্যাসীদের ধরে করে সংযমের অভ্যেস করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। অসুস্থ মনের ছেলে অসুস্থ মনেরই হবে। যেমন তারা হয়েছে নিজে। কিন্তু শেষ অবধি পালনে অসুবিধে দেখে সকলের অজ্ঞাতেই বেরিয়ে গেছে ঘর ছেড়ে সংসার ছেড়ে দেশ ছেড়ে।

মায়ের বড় আশা চন্দ্রপ্রকাশ যেন বংশের ধারা না পায়। ওদের

আওতা থেকে সরিয়ে রেখে মানুষ করছে মা। একবেলা খেয়ে এক-বেলা না খেয়ে। জীবনপাত করে।

চন্দ্রপ্রকাশ বংশের ধারা পেয়েছে, এ ধারণা মায়ের মাথায় বসে গেলে ওকে আর রক্ষে করা যাবে না। দুঃখে কষ্টে নতুন আঘাত সইবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে ও। তিলতিল ক'রে নিজেকে নিঃশেষ করে আনছে ও।

খেদ করে বলেছে—কামিনীমাসী, আমার কথাও কানে নেয় না এখন। কেমন যেন হয়ে গেছে। ভগবান ওকে রক্ষে করুন।

দৌড়ে চলে গেছে বাড়িতে চন্দ্রপ্রকাশ। মায়ের পা জড়িয়ে ধরে কেঁদেছে। ক্ষমা চেয়ে বলেছে, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আমি ও-বংশের মানুষ হব না। তোমাকে ছুঁয়ে বলছি, বড় হয়ে বিয়ে-থা করবো না আমি।

মা হাসেও নি, কাঁদেও নি। নির্বিকার। কথা কানে গেছে কি না, চন্দ্রপ্রকাশ জানতে পারে নি।

যত দিন যায়, মা ততই দুর্বল থেকে আরো দুর্বল হয়ে পড়ে। মাথা ঘুরে পড়ে গেছে ঘরে, তারপর থেকে শয্যা নিয়েছে। উত্থানশক্তি রহিত। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছে মৃত্যুর দ্বারে।

মায়ের মৃত্যুর পর কামিনীমাসীর আশ্রয়। কামিনীমাসীর পর সৌবিকামাসীর। এখানে থাকতে চায় নি চন্দ্রপ্রকাশ। দূরে—অন্য কোথাও রেখে আসতে বলেছে বার বার। এমন জায়গায়—যেখানে বাইরের কোন কথা প্রবেশ করবে না কানে। বাইরের কোন জিনিসই চোখে পড়বে না। বাইরের কোন ব্যাপারই মনে—ভাবনাচিন্তায় আসবে না।

এতটুকু ছেলের এমন কথাবার্তায় বিব্রত বোধ করেছে সৌবিকা। এ ছেলেকে নিয়ে মহা সমস্যা। হাসে না কাঁদে না। দিনরাত মন মরা। খায় না ভালো ক'রে! যা এসেছিল, তার আধখানা হয়ে গেছে। ওর মনোমতো জায়গা কোথায় পাবে সৌবিকা! কার কাছে রাখবে! কিছুই ঠিক করতে পারছে না। পাগলের বংশের ধারা পাল্টাতে সৌবিকা কি নিজেই পাগল হয়ে যাবে নাকি!

দায়িত্বকে দায় ভাবলে চলে না। মন থেকে যখন চন্দ্রপ্রকাশের দায়িত্বভার নিয়ে নিয়েছে সৌবিকা, তখন একটা কিছু বিহিত ক'রে

তবে নিশ্চিন্ত হতে হবে। পথ খুঁজে বার করতেই হবে। খুঁজে না পাওয়ার কোন যুক্তিই নেই। পাওয়া যাবে নিশ্চয় একটা না একটা। দৃঢ়সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

চন্দ্রপ্রকাশের মনোমত জায়গা আর মানুষের সন্ধানে এগিয়ে চলেছে সেবিকা। এগিয়েই চলেছে চন্দ্রপ্রকাশকে নিয়ে।

এদেশ-ওদেশ এ তীর্থ-ও তীর্থ এ সন্ন্যাসী-ও সন্ন্যাসী। কোথাও কারো কাছে মন ভরে নি চন্দ্রপ্রকাশের। আশ্রমে থেকে যেতে মন সায় দেয় নি, সন্ন্যাসীকে মেনে নিতেও না। হতাশ হয়ে পড়লেও হাল ছাড়ে নি সেবিকা।

হরিদ্বারের মাটিতে পা রাখতেই, একটা আশ্চর্য রকমের অনুভূতি এসে নাড়া দিয়েছে ভেতরে। 'মিলিলে মিলিতে পারে অমূল্য রতন।' অনেক সময় আচমকা মন যা বোঝে, ঠিকও হয়ে যায় দেখা যায়। ব্রহ্মকুণ্ড থেকে পশ্চিম দিকে রেল লাইন পেরিয়ে পাহাড়ের তলায় বিল্বকেশ্বরের মন্দির।

শিবদর্শন করে একটু দূরে যেতেই পাহাড়ের গুহা থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে একজন সৌম্যকান্তি সন্ন্যাসীকে। সন্ন্যাসীর মুখে সুন্দর হাসি। হাসতে-হাসতেই এগিয়ে আসছে এই দিকে। হাসি চাউনি এমন, কতদিনের কত জানাচেনা মানুষ যেন। সামনে এসে চন্দ্রপ্রকাশকে একবার, সেবিকাকে একবার আলাদা-আলাদা ক'রে জিজ্ঞেস করেছে, কেমন আছো? শরীর মন ভালো তো?

সেবিকা চন্দ্রপ্রকাশের—দুজনেরই মনে হয়েছে, এ লোক তাদের অতি আপনার। চন্দ্রপ্রকাশের উদ্ভট অভিরুচির কথা জানিয়েছে সেবিকা। শুনে, আনন্দ জোরে হেসে উঠেছে সন্ন্যাসী। চন্দ্রপ্রকাশের চিবুক ধরে বলেছে, ঘাবড়ে যাবার কি আছে? যা বলেছো, ঠিক বলেছো। থাকবে আমার কাছে?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়েছে চন্দ্রপ্রকাশ।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে সেবিকারানী।

শাঁখঘণ্টার আওয়াজ এসে মিলিয়ে যাচ্ছে নির্জন পাহাড়ের গায়ে। সন্ধ্যের আরতি হচ্ছে ব্রহ্মকুণ্ডের ধারে। পূজারীর হাতে প্রদীপের ঝাড় দুলছে। প্রদীপশিখার ঢেউ খেলে যাচ্ছে হিমালয়ের পবিত্র বাতাসে।

সন্ন্যাসীর হাতে চন্দ্রপ্রকাশের হাত রেখে—দু'টি হাত এক ক'রে বলেছে সেবিকা।—আপনার জিনিস আপনার কাছেই রেখে গেলুম বাবা। বলার আমার কিছু নেই। বড় দুঃখী ছেলেটা।

রাতের অন্ধকার শেষে দিনের আলো ফুটে ওঠে। দুঃখীর মুখেও সুখের হাসি ফুটে ওঠে। সন্ন্যাসী সতীসুন্দরের আশ্রয়ে সর্বহারা চন্দ্রপ্রকাশের বিষণ্নমুখে প্রসন্নহাসির ঢল নেমেছে। দিনে দিনে চন্দ্রকলার মতো একটু একটু ক'রে ইচ্ছে পূরণের সাধনায় পূর্ণচন্দ্র—পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মন তার ধরাছোঁয়ার বাইরে। বাইরের কোন জিনিসই আর স্পর্শ করে না তাকে।

দুনিয়ার কোন কোলাহল আর প্রবেশ করে না কানে। কোন অশান্তির দৃশ্য পড়ে না নজরে। কোন বিষয়ের দুশ্চিন্তা ঠাঁই পায় না মনের কোণে। কোন ব্যাপারে কোন কিছুতেই ডুবে নেই, ভেসে রয়েছে ওপরে। দর্শকের ভূমিকায়।

এ সাধনা পৃথিবীর আদি শব্দ নিয়ে। শব্দ ব্রহ্মের সাধনা। নাদ সাধনা। নাদই শক্তি নাদই জগৎ নাদই শিবব্রহ্ম। শূন্য। এ নাদ ভেতরেও একই যোগসূত্রে বাঁধা। নিঃশ্বাসে ওঁ মন্ত্রের উচ্চারণে মন আর প্রাণবায়ু যখন এক হয়ে যায়, অর্থাৎ মনের অন্য চিন্তার লয় হয়ে যায় যখন, মন যখন কেবল ওঁকার ধ্বনি শুনতে থাকে বুকের স্পন্দনে—ধুক-ধুক আওয়াজে—অনাহতে, তখনই মন আর প্রাণ এক হয়ে যাওয়া। মন বধুগা পবন সু্য, পবন বাধুগা মন সু্য। এতে ভেতরের কুণ্ডলিনী—আত্মশক্তি জেগে ওঠে। এই আত্মশক্তিকেই নাদসাধক নাথপন্থীরা শক্তি সাধনা বলেছে। শক্তি সাধনা না করলে শিবকে পাওয়া মুশকিল। শক্তির আধারেই—গৌরীপট্টে শিবের প্রকাশ। প্রকৃতির আধারে অদৃশ্য ব্রহ্ম শূন্যশক্তির নেপথ্য-খেলা।

নাদসাধনা শৈব আর শাক্ত তন্ত্রের মিলন সাধনা। শিব-শক্তির আরাধনা। শিবলিঙ্গের উপাসনা! শিব-শক্তি অভিন্ন। এই চিন্তাধারায় রুপো ঝকঝকে 'ওঁ'য়ের সেতু বেয়ে বেয়ে মন যখন ওপরে আরো ওপরে আরো ওপরে—একেবারে ব্রহ্মতালুতে এসে হাজির হয় তখন ঘণ্টা কাঁসর শাঁখের আওয়াজ ভেসে আসতে থাকে গভীর নিস্তব্ধ রাতে মনেরই কানে। মন যখন ওখানে ধীরে ধীরে স্থির হতে থাকে,

তখন বাঁশী নূপুর ভ্রমরগুঞ্জনের মৃদু আওয়াজ। যখন একদম স্থির তখন মনেরও অনুভূতি নেই। আর শব্দও নিঃশব্দ।

এ সাধনায় মানুষ সর্বজয়ী ইন্দ্রিয়জয়ী আত্মজয়ী। ত্রিতাপ জ্বালা স্পর্শ করে না। অভাব অভিযোগ অপমান-অবহেলা-শোকদুঃখ—কোন কিছুই রেখাপাত করে না। সবের মধ্যে থেকেও সবের ওপরে বসে ভাসে সাধক আনন্দসাগরে। নিজে ভাসে অন্যকেও ভাসিয়ে রাখে। এই ধরনের সাধনায় সিদ্ধ সাধক চন্দ্রপ্রকাশ।

তাই চন্দ্রপ্রকাশ সাধু কোথায় এসেছে জানতে পারলে, যারা ওর সাধন সম্বন্ধে সচেতন, তারা দৌড়ে আসে। মনের জ্বালা জুড়োবার জন্য। মনকে ঠিক ক'রে রাখার আশীর্বাদ নিতে এসেছে মা-কাকীমা ছোট নীলামোতিকে নিয়ে। বড় আশায় বুক বেঁধে এসেছে ওরা—নীলামোতির দুরন্ত-দুষ্টু মন শান্তশিষ্ট হয়ে উঠবে চন্দ্রপ্রকাশের আশীর্বাদে উপদেশে।

মন ঠিক করার রীতিনীতি চন্দ্রপ্রকাশ সহজ সরল করে বলেছে নীলামোতিকে। নীলামোতির খুব স্বচ্ছ ঠেকেনি। কেমন কুয়াশা-কুয়াশা। সে যাক, তবে চন্দ্রপ্রকাশের মাতৃস্নেহে ভরপুর চোখ দুটো দারুণ ভালো লেগেছে। ওই চোখে যেন নিজের মায়ের প্রাণঢালা ভালোবাসার চোখ বসানো।

বাড়িতে ফিরে এসেও নিজের চোখের সামনে থেকে ওই চোখ জোড়াকে সরাতে পারে নি মোটে। একচুলও না। আর তাছাড়া বেশ ভালো লাগছিল। সরে যাক—এটাও চাইছিল না ভেতর থেকে।

ওই চোখ দেখে দেখে দিনের মধ্যে কত সময় না কেটে গেছে কতদিন।

বাড়ির সকলে স্বস্তির নিশবাস ফেলে বলেছে, চন্দ্রপ্রকাশের কৃপায় নীলামোতি আজ কত শান্ত, কত সুন্দর।

নীলামোতির চমক ভেঙেছে আনন্দানন্দের ডাকে। এত দেরী করলে সন্ধ্যে হয়ে যাবে যে! তোমার কি আসতে কষ্ট হচ্ছে? নিশ্বেস নিতে?

হেসে উত্তর দিয়েছে নীলামোতি, না না। কোন ভয় নেই। এগিয়ে চলো। আমি ঠিক ধরে নোবো!

নীলামোতি জোর ক'রে মনকে ফিরিয়ে এনেছে কিন্নরে। হুগলীর

মহানন্দ গ্রামে পড়ে থাকলে চলবে না আর। চন্দ্রপ্রকাশের চোখে আটকে পড়ে থাকলেও না। এখানে দৃষ্টিবিভ্রমে সমূহ বিপদ। পাহাড়ী রাস্তায় চলেছে। সেখানকার মতো নরম মাটি নয়। জায়গায় জায়গায় আলগা পাথরে পা পড়ছে। পাথর নড়ে ওঠার সঙ্গে দেহটাও টলে পড়ছে। টাল সামলাতে হাতের লাঠিটা চেপে ধরছে। হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে হচ্ছে বারে বারে।

তাড়াতাড়ি চলতে গিয়ে ঘাম জমছে কপালে। তেষ্টায় গলা শুকনো। আকাশে বাতাসে ধুলো নেই কালি নেই। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে উঁচুতে দাঁড়িয়ে অনেক দূরের জিনিস। মুক্তেশ্বরানন্দ আনন্দানন্দ দু'জনে বসেছে দেবদারুর ছায়ায়। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসেছে নীলামোতি।

ওদের কাছ বরাবর আসতেই উঠে দাঁড়িয়েছে ওরা। শুরু হ'ল তিন জনের পথযাত্রা আবার। খানিক দূরে দেখা যাচ্ছে সবুজে-সবুজে ছেয়ে গেছে। সবুজের কিনারায় একটা ছোট্ট ঝিরঝিরে নদী বয়ে চলেছে। কাঁচ-জলে আগের ছায়া। খোলামাঠ। মাঠে একটা বড়-সড় বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংস স্মৃতি। তারও আগে শতদ্রু নদীর ধারা। নদী মাঠ বিহার ছোট নদী পেরিয়ে লিপ্পাগ্রাম। মনটা আনন্দে ভরে উঠেছে নীলামোতির। লিপ্পাখদ্দের ওপর দিক থেকে চারদিনের রাস্তায় তিব্বতের সীমানা।···

লিপ্পায় এসে বেশ ভালোই লাগছে। পাহাড়ের ওপর কাঠের ঘরখানা রীতিমতো মজবুত। নীলামোতির খুব পছন্দ। মনের ভাব বুঝতে পেরেই মুক্তেশ্বরানন্দ বলেছে, কোন কিছুর ওপর ঝপ ক'রে মায়ায় পড়া উচিত নয়। সদাসর্বদা জেনে রাখতে হবে, দু'দিন বাদে ছাড়তে হবেই। নানা রঙবেরঙের ভেতর দিয়ে পৌঁছতে হবে। আসল রঙে—সাদায়। চোখে দেখায় সাদা কিছু নয়। রঙ নেই কোন। কিন্তু সাদা থেকেই সব রঙ। উদ্দেশ্যে যেন এতটুকু ভাঙচুর না হয়। কোনরকমে লক্ষ্যভ্রষ্ট যেন না হয়। বসে পড়লে উদ্দেশ্য বসে পড়বে। দাঁড়িয়ে থাকলে দাঁড়িয়ে পড়বে। চলবে চলবে—উদ্দেশ্য সফল হবে।

এখানে বসা-দাঁড়ানো মানে সংকল্পে ভাটাপড়া। চলা—সংকল্প পূরণের মনেপ্রাণে প্রয়াস।

লজ্জায় মুখ নীচু করেছে নীলামোতি।

চাপাগলায় বলেছে, মনে রেখে এগোনোর শক্তি দিন গুরুদেব।

—আমি কি শক্তি দোব তোমাকে! তোমার ভেতরেই শক্তি জোগাবে। নিজের কাছে নিজে প্রার্থনা কর শক্তির। দেখবে অফুরন্ত শক্তির মালিক হয়ে উঠেছো তুমি। শক্তি মহাশক্তি—প্রাণশক্তি। দেহ থেকে প্রাণশক্তি বেরিয়ে গেলে. সজীব সক্রিয় থাকে কি আর দেহ? না, থাকে না। প্রাণশক্তির জন্যই সতেজ সচল। দেহের আকর্ষণে আবদ্ধ না হয়ে নিজের আর অন্যের প্রাণশক্তিকে জাগিয়ে তোলার সাধনাই তন্ত্র সাধনা। সকলের মধ্যে মহাশক্তি! মহাশক্তির মধ্যে সকলে। মহাশক্তি আর তুমি তফাৎ নও। আমি আর অন্যেরাও ভিন্ন নই। এই সত্যি ব্যাপারটা মনে গেঁথে বসে গেলে, বাইরের কোন মোহ আকর্ষণ করে রাখতে পারে না। কোন আঘাত যন্ত্রণাই ছুঁয়ে যেতে পারে না মনকে. ছুঁয়ে থাকে এক অজ্ঞাত আনন্দ। আপাদ-মস্তক ভরে ওঠে আনন্দে আনন্দে। ধারেকাছে কেউ অশান্ত হৃদয়ের লোক এসে পড়লে, তার অনুভূতির রাজ্যে অজানা আলোড়ন ওঠে। নেচে ওঠে আনন্দের শিহরন। বিদ্যাদানের বেলায় যেমন বলা হয়েছে, 'এধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে। যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।' আনন্দসিদ্ধ মানুষের বেলায়ও একথা খুব খাটে।

চারপাটের লাল কম্বলে বসে বসে বলছে মুক্তেশ্বরানন্দ। শুনছে দু'জনে মুখের দিকে তাকিয়ে। অপলকে। ডানপাশে বসে নীলামোতি। বাঁ পাশে আনন্দানন্দ।

ঘরের মাঝখানে ধুনি জ্বলছে। ঠাণ্ডা আমেজে ঘরটা একটু গরম থাকবে তবু। আগুনের লাল আভা মুক্তেশ্বরানন্দের মুখে। বড় চোখ আরো বড় হয়ে উঠেছে। জ্বল জ্বল করছে। হেসে বলল মুক্তেশ্বরান্দ, সন্ন্যাসীদের নামের সঙ্গে আনন্দ যুক্ত থাকে। সন্ন্যাসী নিজে আনন্দময় হয়ে সকলকে আনন্দের পথ দেখিয়ে দেবে। সকলকে আনন্দ দান করবে। আনন্দের ভাগীদার তার কাছে প্রত্যেকে। ছোট-বড় গরীব-দুঃখী আতুর-অনাথ সবাই। সব দেশের মানুষ সে। সব জাতের সব মানুষের আপন সে। অন্যের সুখ-দুঃখ ব্যথাবেদনা বুঝে

আপন হয়ে যেতে পারলে, সেও আপন হয়ে যাবে। সন্ন্যাস। সৎ + ন্যাস—সৎ ভাবে ন্যাস। নিজেকে সবার মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া তাদের হিতের জন্য। অপরের সঙ্গে এক হ'য়ে যাওয়া।

দু'জনের মুখ ভালো করে দেখে নিয়ে চোখ বুজে রইল খানিক মুক্তেশ্বরানন্দ। চোখ খুলেই বলেছে, দেশে দেশে ঘোরা—অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। বিভিন্ন রকমের মানুষজনের প্রকৃতি-মন জানা। ওদের জানার মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে জানা। নিজের দোষত্রুটি দেখে নিজেকে সংশোধন করা। নানান দুর্ভোগ-দুর্যোগ অসহ্য ঠাণ্ডা তাপের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে মানুষ কষ্টসহিষ্ণু হয়ে ওঠে যেমন, তেমনি প্রকৃতির বিচিত্র দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখে দেখে মাথা নত হয়ে আসে আপনা থেকেই। সীমার কাঝে অসীমের প্রমাণচিহ্ন চতুর্দিকে। সকল দম্ভ অহঙ্কার চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। মিলিয়ে যায় গৌরবের প্রাসাদ। ভেঙে যায় অধিকারবোধের স্বপ্ন। সরে যায় রূপ-যৌবন-সামর্থ্যের ঠুনকো 'আমি'।

ভালো কথা বলার লোক খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। ভাগ্যগুণে যদিও পাওয়া যায়, তো শতেক বাধা। শুনতে শুনতে শেষ আর হয় কই! বাকি কথা বাকি থেকে যায়।

মুক্তেশ্বরানন্দ এরপর আরো কি অমূল্য কথা বলতো, কে জানে! শোনা আর হল না, নিচের বাজনাবাদ্যির আওয়াজ। কান ঝালা-পালা করা আওয়াজ নয় অবিশ্যি। মধুর সুরে মধুর কণ্ঠে গান। ঢোলক বাজছে। একবার মেয়েরা গাইছে। একবার ছেলেরা। আবার ছেলে-মেয়েরা সমবেত কণ্ঠে।

সূর্য লুকিয়েছে আকাশে, কোন কিছুর আড়ালে। ঠিক মেঘ-পাহাড়ের নয়। দিনের আলো কুড়িয়ে নিয়ে পালিয়েছে সন্ধ্যের মুখে কোথাও।

কাঠের ঘরছাড়া করেছে নীলামোতিদের ওই গান। ছেলে-মেয়েদের গলায় গলা মিলনো সুর। ওরা বাইরে বেরিয়ে মন দিয়ে শুনেছে, গান বলতে যা বোঝায় এ তা নয়। এ যে সুরে ছন্দে পরিষ্কার মন্ত্র উচ্চারণ। ওঁ মণিপদ্মে হুঁ, ওঁ স্ত্রীরং তারায়ৈ তারে তত্ত্বারে···।

ওদের দলটা অনেক বড়। সাজানো পটের ছবির মতো পর পর ওপরে উঠে আসছে। প্রত্যেকের হাতে একটা ক'রে মশাল জ্বলছে।

মেয়েদের হাতে যেমন, ছেলেদের হাতেও তেমনি। নীলামোতিদের কাঠের ঘরের পাশ দিয়ে দিয়ে আরো ওপরে উঠে চলেছে ওরা। দেখতে সুন্দর দেখাচ্ছে। মেয়েরা আগে আগে। পেছনে ছেলেরা। সকলের মাথায় সাদা ভেড়ার লোমের টুপি। কানচাপা। সাদা লোমের পাতলা কম্বলের পোশাকে সারা শরীর চাপা। পায়ে ভেড়ার চামড়ার জুতো, হাঁটু অবধি।

এই বেশবাস নীলামোতিদেরও। লামা নরেনসই আনিয়ে দিয়েছে এদের এ দেশের পোশাক। ঠাণ্ডা লেগে যাবার ভয় থাকবে না। এখানে আসার পরের দিনই নরেনসের সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

পাহাড়ের কাণ্ডায়—অনেক উঁচু জায়গায় লামা নরেনসের কুঠি। ওখান থেকেই নেমে আসছে নীচের দিকে কি দরকারে। নীলামোতি-দের কাঠের ঘরের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। খালি ঘরে নতুন লোক এসেছে নাকি! মুক্তেশ্বরানন্দের চোখে চোখ পড়তে ফিক করে হেসে ফেলেছে। মুক্তশ্বরানন্দের দুচোখেও স্নিগ্ধ-হাসি উপচে পড়েছে। ধুনীর সামনে থেকে উঠে এসে, নরেনসকে সাদর অভ্যর্থনা করে ঘরের ভেতরে এনে বসিয়েছে।

আলোচনায় জানতে পারা গেছে নরেনস মহামুদ্রা সাধনার সাধক। তন্ত্রতপস্যাই তার জীবনের সারধর্ম।

নরেনস কিন্তু মোটেই কিন্নরদেশের আদি বাসিন্দা নয়। সৌরাষ্ট্রের। গুজরাতি নরেনসের পূর্বপুরুষ নাকি সাধক নরসিংহ মেহতাদের ঘরের। দেশের নাম নরেনস নয়। দেবসিংহ মেহতা।

দেবসিংহের ছোটবেলা থেকে কেমন আনমনা আনমনা ভাব। মুদির দোকানে বসিয়েছে বাবা। ব্যবসাটা শিখে নিজের জীবনটাও চালাতে পারবে তবু। একটু বড় হতেই বাবা ব্যাপারীর কাজকর্ম নিজে হাতে ধরে শেখানো যাকে বলে, শিখিয়েছে। দেশে-দেশে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে গস্ত করেছে। পাঁচজন অচেনার সঙ্গে পরিচয় হৃদ্যতা করিয়ে দিয়ে মনের জড়তা কাটিয়েছে। ছেলে মানুষ হোক, সাহসী হোক। ভীতু ঘরকুনো দু'চক্ষের বিষ বাবার।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে নরসিংহ মেহতার প্রার্থনা-ভজনের সারমর্ম বুঝিয়েছে ছেলেকে। ভালো কথা শুনতে শুনতে মনে খোদাই হয়ে যাবে। অন্যায় কিছু করতে গেলে অন্তত বুক কেঁপে উঠবে। পারবে

না। বাবা ছেলেকে সংসারী করতে চেয়েছে ঠিক, তবে আদর্শ সংসারী। ভোরের প্রার্থনায় মন্ত্র শোনানোর মতো কানে ঢুকিয়েছে, পরস্ত্রী জেনে মাত রে···সকল তীরথ তেনা তন্ মা রে···কামক্রোধ নিরবাইয়া রে···ভনে নরে স‍ঁইয়ো তেনে দর্শন করতা, কুল একোতর তারাইয়া রে। নরসিংহ মেহতার ভজনের বাছাই করা উপদেশ-কথা গেয়ে গেয়ে শুনিয়েছে ছেলেকে বাবা। প্রকৃত বৈষ্ণব রাম নামের ভক্ত পরস্ত্রীকে মা জ্ঞান করে। রাম নামে যার মন, সকল তীর্থ তার ভেতর, কামক্রোধের নিবৃত্তিতেই প্রভুর দর্শন। তাঁর দর্শনে বংশের মুক্তি বংশের মর্যাদা। এক পুরুষ আধ পুরুষ নয়। একাত্তর পুরুষের অবধি উদ্ধার। অর্থাৎ এমন একজন গুণী ছেলে যদি সত্যি সত্যি কোন বংশে জন্মায়, সেই ছেলের গুণের সম্মানে সেই বংশকে পর পর সম্মান করে যত যুগ যুগের মানুষজন।

শেষের কথা বলার শেষে বাবার চোখের তারা দুটো অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বল হয়ে উঠত। অপলকে চেয়ে থেকেছে ছেলের চোখের দিকে। হয়তো ছেলের আঁখিতারায় কিছু একটা দেখতে চেয়েছে, দেখা যাচ্ছে কিনা। কিছু দেখতে পেল কি না পেল, বোঝা গেল না। কিন্তু হেসে ফেলেছে বাবা ছেলের ঠোঁটে হাসির আভাস দেখে। বলেছে মিষ্টি কথায়, জলখাবার খেয়ে চটপট গিয়ে দোকানে বোসো! সময় হয়ে গেছে।

পাঁচ বছরে মাকে হারিয়েও অভাব কোনদিন অনুভব করে নি দেবসিংহ। সে অভাব পূরণ করে দিয়েছে বাবা নিজেই একা। দেবসিংহ বাবার হৃদয়ের ধন, চোখের মণি ছেলের জন্যই বাবা সংসারী হতে চায় নি আর। হয়ও নি জ্ঞাতিস্বজনের পেড়াপীড়িতে। হৃদয়ের যত স্নেহ উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে ছেলেকে।

প‍ঁচিশ বছরের জওয়ানকে পাঁচ বছরেরই ভেবে রেখেছে।

বাবার মন অজানা নয় ছেলের। জানুক না জানুক সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা সবাই কি সক্ষম প্রকৃতির আকর্ষণ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে? হাতের কড়ে আঙুলে গোনা যায়। গোনাগুনতি কজনই বা।

বাবার কানে নানা রকমের কথা উঠতে লাগল দেবসিংহের সম্বন্ধে। বাবা বিশ্বাস করেনি। এক কথায় লোকের মুখ বন্ধ করে

দিয়েছে বারে বারে।—ওর বিষয় কোন কথা শুনতে চাই না আমি, চাঁদেও কলঙ্ক আছে, কিন্তু আমার দেবসিংহের চরিত্রে এতটুকু দাগ নেই।

প্রতিবেশী আর বন্ধুবান্ধব—দেবসিংহের ব্যাপারটা যাদের নজরে পড়েছে, প্রত্যেকে ভৎর্সনা করেছে বাবাকে।—ছেলেটির মাথা খাচ্ছো তুমি। মা বেঁচে থাকলে, এমন নির্বিকার সদাশিব হয়ে থাকতে পারতে? বাপের কর্তব্যে অবহেলা করছো তুমি। এর ফল তোমাকেই ভোগ করতে হবে। যখন বংশের মুখ পুড়বে, তখন বুঝবে। ফেরাবার কোন পথ আর খুঁজে পাবে না তখন।

এসব কি দুষ্টুলোকের গুজব, না মানুষের ভুল ধারণা, না দেবসিংহের শত্রুপক্ষের কাণ্ডকারখানা! না, না। সত্যিই দেবসিংহের শত্রু বলে কেউ নেই। ওর মধুর ব্যবহারে পাড়াঘর সকলেই অল্প নয়, খুবই সন্তুষ্ট। ওকে দেবমানুষ বলেই মনে করে সবাই। ওর পতনে মর্মাহত হয়ে পড়বে। ওর কিসে নেশাটা কাটে, সেই চেষ্টাই হিতাকাঙ্ক্ষীদের।

যত গোলমাল সুধন্যাকে নিয়ে।

ও কোথা থেকে আসে, কোথা যায় কেউ জানে না। জানবার ইচ্ছেও করে না কারো। দেবসিংহের জীবনে যেন ও একটা অশুভ নক্ষত্র। অমন ছেলেকে যখন এমন বশ করেছে যে, কারো কথা কানে নেয় না। বাপের মান-ইজ্জত যাবে, কি বাপের নাম ডুববে—কোন খেয়াল নেই। দেবসিংহের যখন এই হাল, অন্যের কি কথা! মেয়ের ওপর লক্ষ্য রাখার চেয়ে বরং ছেলের মন ঘোরানো দরকার।

সুধন্যা এসে হাজির হ'লে, যে যেদিকে পারে সরে পড়ে যেন প্রাণে বাঁচে। ওর সামনে পড়লে যদি বশ হয়ে ভেড়া হয়ে যায়।

দেবসিংহের দোকানের রোজকার খদ্দের সুধন্যা।

আসে সওদা করতে। কেনাকাটা হয়ে গেলে দাঁড়ায় না একদণ্ড। দেখলে, অতি ভদ্রই দেখায়। চলনে-বলনে কোন বেচাল দেখতে পায় নি কেউ। তবু লোকে বলবে, ওটা ওর মুখোশ। ইশারায় হাসিতে সমস্ত কথাই হয় দুজনে। আসতে একটু দেরী হলে ছেলেটা পাগল একেবারে। অন্য খদ্দেররা কে কি জিনিস চাইছে, কোন নজর নেই। যদিও বা নজর পড়ল, তা নুন দিতে তেল দেয়, তেল দিতে নুন

দেয়। গালে হাত দিয়ে বেহায়ার মতো মেয়েটার আসার পথে চেয়ে থাকে হাঁ করে। অবাক কাণ্ড।

মা-ঠাকুরমার বয়সী মেয়েরা দুঃখ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, বড় মায়া হয় ছেলেটার জন্যে। শয়তানীর পাল্লায় পড়েছে। ওকে ছাড়বে না। কি হবে উপায়! হে অম্বা ভবানী! শয়তানীর মৃত্যু দাও! নবরাত্রিতে তোমাকে অনেক কিছু দিয়ে পুজো দোব। হে মা ভবানী, রক্ষে কর তুমি। তুমি ছাড়া গতি নেই।

দেবতা কি মানতের লোভে, পুজো পাবার লোভে অন্যের অনিষ্ট করে? অন্যের মৃত্যু এনে দেয়?

কে জানে!

তবে চাক্ষুষ দেখা যাচ্ছে প্রার্থনার পরের দিন থেকে মেয়েটা আর আসছে না। প্রায় দু'তিন দিন হয়ে গেল। এরকম হয় নি আগে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল বুঝি ওরা! মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ভবানীর উদ্দেশ্যে প্রণাম। আকাশে তাকিয়ে কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে প্রণাম। ঘরে ব্যাঘ্রবাহিনী অম্বা-ভবানীর ছবিতে গোড়ের মালা পড়েছে নতুন। ধূপদানি ভর্তি ধূপ জ্বলে উঠেছে! আনন্দে হেসে গড়াগড়ি গেছে ওরা। কেউ কেউ আবার ছবি দেখে দেখে হাসতে হাসতে চিৎকার ক'রে বলে উঠেছে সবাইকে, অম্বা ভবানী হাসছে হাসছে হাসছে! দ্যাখো, দ্যাখো সকলে তোমরা। ওগো তোমরা সকলে দ্যাখো।

একটা দিন, স্রেফ একটা দিনই হাসাহাসি করেছে ওরা। পর দিন থেকেই সব চুপচাপ আবার। গম্ভীর মলিন মুখে বিপদের ছায়া। সুধন্যা এসেছে। মরে নি। অম্বা-মা ওদের মনস্কামনা পূর্ণ করে নি। ঠাকুর দেবতারাও আজকাল যেন কেমন হয়েছে। মানুষকে গোলক-ধাঁধায় ফেলে কি ধোঁকাই না দেয়। আশা দিয়ে আশা ভাঙে। গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া যাকে বলে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! অম্বার আক্কেল-বিবেচনা কি!

কেউ রাগের চোটে বলে ফেলেই জিভ কেটে ক্ষমা চেয়েছে, হে মা, অবোধ সন্তানে ক্ষমা কর মা! আমি আর কি বলেছি? তোমার শোনবার ইচ্ছে হয়েছে, তাই তুমিই আমার মুখ দিয়ে যা-তা বার করিয়েছো।

দেবীর কান থাকলে নিশ্চই শুনে হেসে খুন হতেন। কত না

ভিরকুটি এই দুনিয়ার মানুষের। নিজের দোষ স্বীকার করতে পারে কজন! দেবতার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিশ্চিন্ত। দেবতা যে মৌন! মুখ খুলে বলবে না কোন কথা। না করবে বাদপ্রতিবাদ না করবে ঝগড়াঝাঁটি।

দু'তিন দিন সুধন্যাকে না দেখে কি মন মরাই না হয়ে পড়েছিল দেবসিংহ। মুখের হাসি মিলিয়েছে। খাওয়ায় মন নেই। শোওয়ার ধ্যান নেই, ব্যবসা-বাণিজ্যের চিন্তা ভাবনা নেই। সর্বক্ষণ বিষণ্ণ। যেন সর্বস্ব খুইয়েছে। পায়ের তলায় মাটি নেই, মাথার ওপর নেই আকাশ। চতুর্দিক অন্ধকার আর শূন্য। এমন অবস্থা যে, উন্মাদ হয়ে দেশত্যাগী হওয়াটাই বাকি আছে শুধু। প্রিয়জনের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। কি করা যায়, কি করা যায়!

সুধন্যা আসতে মরুর বুকে মেঘবৃষ্টি নেমেছে বুঝি। দেবসিংহের মুখে হাসির ঢল নেমেছে। সারা শরীরে হাসির জোয়ার। আবেগ চাপতে না পেরে দোকান থেকে এক লাফে নেমে পড়েছে নিচে। খপ করে হাত দুটো ধরে ফেলেছে সুধন্যার। গদগদ স্বরে বলেছে, তুমি আসোনি কেন? কি, মন খারাপ!

চমকে উঠেছে সুধন্যা। খুব আস্তে আস্তে বলেছে, হাত ছাড়ুন। লোকে দেখবে।

—দেখুক! কি এসে যায়। মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি, তোমাকেই ঘরে নিয়ে যাবো আমি।

মাথা নিচু করেছে সুধন্যা। দেবসিংহের হাতের আলতো বাঁধন থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিয়ে, গায়ের চাদরটা একটু একটু ক'রে সরিয়ে ফেলেছে।

দেবসিংহের দৃষ্টিতে ছেয়ে ফেলেছে বিশ্বের বিস্ময়। পায়ের তলার মাটি কাঁপছে কি? ধসে না চলে যায় পাতালে! কানে শুনেও অনেক কথা বিশ্বাস করা যায় না, চোখে দেখেও না। কিন্তু, ভুল নয়। ঝাপসা দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। সুধন্যার গলায় কালো পুঁতির মালায় ফোটোর লকেট। পাশাপাশি দু'জনের। সুধন্যা আর একটি পুরুষের।

সুধন্যা বলেছে, আমার স্বামীর।

দু'চোখের জল গড়িয়ে পড়েছে সুধন্যার।—মরণাপন্ন অসুখ

স্বামীর। অন্তরের ইচ্ছে স্ত্রীর কাজকর্ম না করার। তার ইজ্জতমান রক্ষের জন্যই সুধন্যার আত্মগোপন ক'রে চলাফেরা।

না জেনে ভুল করার জন্য ক্ষমা চেয়ে চলে গেছে দেবীসিংহ। ওখান থেকে শুধু নয়। একেবারে দেশ থেকেও। এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত কি? খুঁজে বার করতে হবে। অনুতাপ-অনুশোচনায় দগ্ধবিদগ্ধ হয়ে গেছে। দেশে দেশে ঘুরে সাধু-সন্তদের দ্বারস্থ হয়েও, শান্তি আসে নি মনে। শান্তির ঠিক নির্দেশ কারো মুখ থেকেও তো শুনতে পেল না, শুনতে পাচ্ছে না।

পথ চলতে চলতে খালি কানে বেজেছে বাবার গাওয়া গান। সাধক নরসিংহ মেহতার ভজন গান।···কাম ক্রোধ নিবাইয়াছে···। কাম-ক্রোধের নিবৃত্তিতেই শান্তি! নিজের মুক্তি সমস্ত আসক্তি থেকে। বাবার মুখে শোনা আর একটা শিবভজনও মনে দোলা দিয়েছে থেকে থেকে। 'সারা জগ মাঁ ছে তু, বসু তারা মাঁ হুঁ—শক্তি আপো।' সমস্ত জগৎ জুড়ে তুমি। তোমার মধ্যেই আমার বাস। তোমারই শক্তি আমি!

ঘুরে-ফিরে এ গানের কলি এসেছে মনে। মনে করতে ভালোও লেগেছে কিন্তু তবু যেন আত্মসংশোধনের সূত্র পাচ্ছে না দেবীসিংহ। ধারণা ছিল, নিচু জমির মানুষের মনের চেয়ে উঁচু জমির পাহাড়ী মানুষদের মন অনেক উঁচু। ওদের মনের কোন দুষ্টুমির ছায়া পড়ে না বোধ হয়। কোন রিপু ওদের নিজের বশে আনতে পারে না বোধ হয়।

সে-ধারণা ভেঙেছে দেবীসিংহের কিন্নরে এসে পেঁছুতে। বিশেষ ক'রে কিলবায়। মেয়েরা ক্ষেতখামার করতে করতে গাইছে জংমোপোতি আর চুনী ডাক্তারের প্রেমকাহিনীর গান। এ গান কিন্তু কল্পনার নয়। একদম বাস্তব ঘটনার।

গান শুনতে ভালো লেগেছে। তখন এক বর্ণেরও মানে বোঝেনি। ওখানকার একটি ছেলে হাসি মুখে কাছে এসে দঁাড়িয়ে বুঝতে পারছে কি না—প্রশ্ন করেছে দেবীসিংহকে। ঘাড় নেড়ে জানিয়েছে দেবীসিংহ, না। ওই ছেলেই ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বুঝিয়ে দিয়েছে সারমর্ম।

কোন্ সালটা তার ঠিক মনে পড়ছে না। তবে যতদূর স্মরণে আসে, ১৯৪০ থেকে ৪৪-এর মধ্যে হবেই হবে। চুনীলাল ডাক্তারকে

পাঞ্জাবের বনবিভাগ থেকে পাঠিয়ে দেয় কিলবার হাসপাতালে। জাহর সিং কম্পাউন্ডারের সঙ্গে খুব হৃদ্যতা গড়ে ওঠে ডাক্তারের। খণ্ডগরের সুন্দরী মেয়ে জংমোপোতি। সখির সঙ্গে কিলবার পাহাড়ে রোজ এসেছে অভিসারে! ডাক্তারের প্রেম একেবারে সাচ্চা, কেউ বলতে পারবে না ঝুটা। তা না হলে জংমোপোতির মাথার ব্যামোয় কি সেবাই না করেছে। করেছে প্রাণঢালা। হাসপাতালে নিজের সেবা-শুশ্রূষা আর ওষুধবিষুধের মধ্যে রেখে।

জংমোপোতি খুব খুশি হয়েই পাঞ্জাবী ডাক্তারকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমি জন্ম-জন্মান্তরের তোমারই। তোমারই থাকবো জেনো চিরকাল। হাত ধরে অনুনয় করে বলেছে, বলো, তুমি আমায় ত্যাগ করবে না কখনো? কোনদিন?

চোখে জল এসেছে ডাক্তারের। এতো ভালোবাসে জংমোপোতি তাকে? তার জীবন ধন্য। কি সুকৃতি পূর্বজন্মের।

জংমোপোতির জন্য নতুন নতুন গয়না গড়িয়ে উপহার দিয়েছে। খোঁপায় রুপোর চিরুনি, গলায় সোনার মালা। আঙুলে হীরের আংটি। সুন্দরকে আরো সুন্দর ক'রে সাজাতে চেয়েছে চুনীলাল। 'সাজাবো তোমায় অতীব যতনে, মনোমতো করে!' কথা শুনে জংমোপোতি হেসে কুটিকুটি। বলে, এসবে আমার কি হবে বলো তো? তুমিই তো আমার হার আংটি চিরুনি।

আনন্দে হাতের সোনার ঘড়িটা খুলে পরিয়ে দেয় চুনীলাল জংমোপোতির বাঁ হাতের কব্জিতে।

খুশির জোয়ারে ডুবুডুবু জংমোপোতি।

বেরিয়ে গিয়ে, একটু পরেই ফিরে এসেছে আবার। কিন্নরদেশের কিন্নরীর সাজ সেজে! পাহাড়ী শাড়ী—দোড়ু পরেছে! পেছনে কোঁচা। লাল ফিতেয় বাঁধা বিনুনি ঝুলছে পিঠে। মাথায় কানঢাকা টুপি—লাল রেশমি ফিতে বসানো। সাদা সাদা ফুল গোঁজা টুপির কানে। ঘরে ঢুকেছে হাসতে হাসতে। রুপসী অপরূপা হয়ে উঠেছে।

মুগ্ধ নয়নে চেয়ে থেকেছে শুধু চুনীলাল।

জংমোপোতি বলেছে, অমন ক'রে চেয়ো না ডাক্তার। ওই পাগল করা চোখ কি জাদু জানে। তুমি নিজেও জানো না। ঘরবাসী করতে

দেয় না মোটে। টেনে নিয়ে আসে কেবল তোমার কাছে। বোঝালেও বোঝে না মন।

যে চোখের এত স্তুতি, সেই চোখেরই নিন্দায় একদিন পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে জংমোপোতি। রাম রাম। ওই লোককে আবার বিয়ে-শাদি করে নাকি কেউ! কার এমন মরণদশা! রাক্ষুসে চোখের সামনে দাঁড়ানো যায় না। কখন না কখন গিলে খাবে। তার তাছাড়া দেশের লোক কোঠিদার ছাড়া পরদেশী আদমি। ভাবাও যায় না।

ভুলের সংশোধন করা যায়। কঠিন হলেও, একদিন না একদিন সহজ হয়ে ওঠে। কিন্তু কেউ যদি ঠকে? বিশেষ ক'রে হৃদয় দেওয়া নেওয়া নিয়ে? সেখানে সংশোধন-অসংশোধন নেই। আছে মর্মান্তিক আঘাত। এ আঘাত সামলে ওঠা কষ্টকর। যে সত্যিসত্যিই হৃদয় দিয়ে ফেলেছে অন্যকে। তার পক্ষে।

চুনীলালের চোখের ওপর দিয়ে বিয়ের পর কোটিদারের সঙ্গে তার ঘরে চলে গেছে জংমোপোতি। ফিরে তাকায়ও নি চুনীলালের দিকে একবার। খেদেদুঃখে চুনীলাল বলে উঠেছে. নারী বিশ্বাসঘাতিনী! বিশ্বাসঘাতিনী!

কথাটা খট ক'রে লেগেছে কানে দেবসিংহের। সত্যিই কি তাই? নারী মাত্রই? না, না। কই, সুধন্যা তো এমন নয়। অসুস্থ স্বামীর সঙ্গে বেইমানি করলে তো করতেই পারতো অনায়াসে। করে নি। কত সংযত! দেবসিংহের শ্রদ্ধার আসনে সুধন্যা!

সুধন্যার নাম স্মরণে এলেও নিশ্চিন্ত হতে পারেনি দেবসিংহ। চুনীলালের বিচ্ছেদব্যথা লেগেছে খুব প্রাণে। তবে কি জংমোপোতির মন কি এখানকার সব নারীরই মন? ছোটবেলা থেকে এইভাবেই কি এদের মন তৈরী হয়েছে একছাঁচে।

একবার ভুলের জন্য সংশোধনের ঠিক পথ খুঁজে পায় নি এখনো দেবসিংহ। এর ওপর নতুন ক'রে ভুল যেন আর না হয়। আশপাশে কোন স্ত্রীলোক দেখলেই শত হাত দূরে সরে গেছে, কাউকে বুঝতে না দিয়ে জানতে না দিয়ে।

হলে হবে কি! বিধাতার ঠোঁটের ফাঁকে বুঝি বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠেছে সে-সময়।—অতীতেরই বা কতটুকু জেনেছো তুমি!

ভবিষ্যতের তো কথাই ওঠে না। আসে নি এখনো। আসতে দাও আগে—তখন।

ভবিষ্যৎ এসেছে দেবসিংহের তিব্বত থেকে ফিরে আসার পর। অনেক কিছু দেখেছে লামাদের ক্রিয়াকলাপে। অনেক কিছু শিখেছে মন তৈরী করার রীতিনীতি। তবে ফলাফলের মুখটুকুও দেখে নি আজো। নিত্য অভ্যেসের গুণে একটু আধটু হয় যদি—হলে হতেও পারে, দেখা যাক।

কিন্নরের পথে পথে চলেছে। স্পু পেরিয়ে শবাসোর সেতুর দিকে এগিয়ে আসছে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তুষার ঝঞ্ঝায় কি অবস্থা। বড় বড় দেবদারু দুমড়েমুচড়ে ছড়িয়ে-ছিটকে পড়ে রয়েছে এ ধারে ও ধারে। কোথাও বরফের স্তূপ। কোথাও জমাট বরফে রাস্তা ভরাট। নদী খানাখন্দ—সমস্ত একাকার। কোথা দিয়ে যাবে, কোথায় রাস্তা, বোঝা যাচ্ছে না যেখানে-সেখানে পা পড়লে, যে কোন মুহূর্তে অঘটন ঘটা সম্ভব। বরফে পা হড়কে পাতালে, নয়তো মচমচ ক'রে বরফ গুঁড়িয়ে নদীর হিমঠাণ্ডা মরণজলে।

এদিকে একভাবে বেশীক্ষণ দাঁড়ানো যাবে না। যাচ্ছে না। রক্ত-জমা ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। বাতাসে ভেসে আসছে গুঁড়ো বরফ। পায়ের কাছে খরফে জমা ভেড়া-ছাগল। প্রাণহীন। বরফের হয়ে গেছে। কে জানে বিরাট বিরাট চাঁইয়ের তলায় মানুষের কত দেহ চাপা পড়ে আছে হয়তো। দেবসিংহেরও কি জীবনের শেষ যাম এটা! বরফের কবরে জমে থাকবে কিন্নরের পাহাড়-মাটিতে।

পুরাণের দেশ কিন্নর। কুবের চিত্ররথের রাজ্য ছিল নাকি! অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে চিত্ররথ। অর্জুনের আগ্নেয় অস্ত্রে চিত্ররথের চিত্রবিচিত্র রথ ভস্ম হলে, অচেতন হয়ে পড়ে চিত্ররথ।

অর্জুনের হাতে বন্দী হয়। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরসভায়—পাঞ্চালে যাবার পথে যুদ্ধ বাধে অর্জুনের সঙ্গে। চিত্ররথের স্ত্রী কুম্ভীনসী স্বামীর মুক্তির জন্য যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্ন হলে, অর্জুন চিত্ররথকে মুক্তি দেয়। অর্জুনের সঙ্গে মিত্রবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, চিত্ররথ চাক্ষুষী-বিদ্যা দান করে অর্জুনকে। ত্রিভুবনের-ত্রিকালের অন্ধিসন্ধি পর্যন্ত দেখতে পাবে ইচ্ছে করলেই।

এবিদ্যা জানা থাকলে দেবসিংহ প্রাণে বাঁচতে পারত আজ।

কোথায় কি আছে, এক লহমায় দেখে নিয়ে সেই পথে পা বাড়িয়ে পালাতে পারতো। তা বুঝি হবার নয়।

ঝড়ের বেগ বেড়েছে। দাঁড়িয়ে থাকতে হয় নি আর দেবসিংহকে। ভাবতেও সময় পায় নি আর একপলক। ছিটকে ফেলে দিয়েছে কোথায় দুরন্ত বাতাস।

দেবসিংহ কোথায় পড়েছিল তার নিজেরই অজ্ঞাত। কেমন ক'রে বেঁচে গেছে তাও অজানা। জ্ঞান যখন হয়েছে, তখন দেখে একটি নারীমূর্তির কোলে তার মাথা। কাঠের ঘর। সামনে দেবদারু কাঠের আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। কাপড়ের তাপ দিচ্ছে দু'জন জওয়ান সারা দেহে। পায়ের তলা থেকে বুক। নারীমূর্তির চোখে চোখ পড়তে ফিক করে হেসে ফেলেছে। বলেছে মুখে নয় ইশারায়। কোন ভয় নেই। সব বিপদ কেটে গেছে।

এই নারীমূর্তিই চোমোলিম্পা।

অর্থাৎ ভিক্ষুনী লিম্পা। চোমোলিম্পা লিম্পা গাঁয়েরই মেয়ে। চোমোলিম্পা বাবার সঙ্গেই ফিরছিল সে সময় দেশে। তিব্বতে বৌদ্ধ তান্ত্রিক লামা সাধনায় সিদ্ধ হয়ে ফিরছে ওরা। দেশের লোককে নতুন আলোয় এগিয়ে নিয়ে যাবে। এগিয়ে নিয়ে যাবে মঙ্গলের পথে। যেখানে দেবসিংহ মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে, সেখান দিয়েই আসছিল ওরা।

ওদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের বাড়ি স্পুতে। চোমোলিম্পার মামার দেশ। মামার ওখানেই রেখেছে চোমোলিম্পা। যতক্ষণ না দেবসিংহ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে, শরীরে সামর্থ্য ফিরে পেয়েছে। এ-ও তো মেয়ে। এ যেন আলাদা জগতের স্বতন্ত্র মানুষ। কত তফাৎ, কত তফাৎ। বিস্ময়বিমূঢ় দেবসিংহ। দেখেছে সুধন্যাকে শ্রদ্ধার প্রতিমূর্তি। আর জংমোপোতী? সাক্ষাত তুষারঝঞ্ঝা। চোমোলিম্পা? মঙ্গলময়ী দেবীপ্রতিমা।

লিম্পাগ্রামে পেঁছুবার পর দেবসিংহ চলে যেতে চেয়েছে, ছাড়ে নি চোমোলিম্পা আর ছাড়ে নি তার বাবা। বাবা মনে মনে সংকল্প করে রেখেছে দেবসিংহের সঙ্গেই মেয়ের শুভ পরিণয় সম্পন্ন করবে। কোন-রকমে এর অন্যথা হতে পারে না, হবে না। ওপরঅলার নির্দেশেই যোগাযোগ। তা নাহলে ওরকম সময় ওখানে এমনভাবে দেখতে পেল

দেবসিংহকে। দুপক্ষেরই একটু দেরী হয়ে গেল, দেখাদেখি হওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না আর কোনকালে। দুর্যোগও অনেক সময় ওপরের কৃপা-আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়ায়। এটা দৈবঘটনা। দুটি জীবন একখাতে বইবার আদেশ বুঝে নিতে হবে। পরিবেশ-পরিস্থিতি আর ঘটনার মধ্যে দিয়েই বুঝ নিতে হয় সব কিছু।

লামাদের ভিক্ষু-ভিক্ষুনীদের বিয়ের প্রথা রয়েছে। নিষিদ্ধ নয়, সিদ্ধ। লামাপ্রধান রিগজিনমা পরিষ্কার ফতোয়া জারী ক'রে দিয়েছে, 'কছগপ্যাছেগ মো'—মহামুদ্রা অর্থাৎ স্ত্রীসাধনা বৌদ্ধতান্ত্রিকদের সাধনার বিশেষ অঙ্গ। হিন্দুতন্ত্রের ভৈরবীতন্ত্রেও সাধনার মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়েছে সহস্রমুখে। মীনপা-শরহপার মতো চুরাশি সিদ্ধপুরুষ এ সাধনা করে গেছে স্ত্রীরত্নকে স্থায়ী হিসেবে গ্রহণ ক'রে বা অস্থায়ী ভাবে।

চোমোলিম্পার বাবা সোরনলামার ইচ্ছে পূর্ণ করতে হয়েছে দেবসিংহকে। দেবসিংহকে প্রাণে বাঁচিয়েছে ওরাই। নিশ্চয় ওদের দাবি থাকবেই। কৃতজ্ঞতার খাতিরে দাবী প্রত্যাখ্যান অসম্ভব হয়ে পড়েছিল দেবসিংহের।

চোমোলিম্পার সঙ্গে শুভপরিণয় সমাধা করার পর সোরনলামা দেবসিংহকে সাধনার এক এক স্তরে নিয়ে গেছে নানা শিক্ষাদীক্ষা আর ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। দেবসিংহের সাধনায় কোন খাদ-ভেজাল ছিল না। নিষ্ঠা বিশ্বাস চেষ্টা প্রবল ইচ্ছেই সাধনার সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে ওপরে উঠতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। পরীক্ষানিরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে সম্মানের সঙ্গে—লামা দরবারে। লামা আখ্যা পেয়েছে প্রধান লামার কাছ থেকে। নতুন নামও পেয়েছে তার সাধক জগতের সাধকজন্মের। লামা নরেনস।

সুধন্যার ব্যাপার নিয়ে নিজেকে সংশোধন করার তাগিদে এক দিন পথে বেরিয়ে পড়েছে দেবসিংহ। দেশে দেশে ঘোরাঘুরি ক'রে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে, জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণ পেরিয়ে সাধনার রাজ্যে সাধক মহলে এখন লামা নরেনস। কিন্তু লামা নরেনসের কি বাস্তবিকই আত্মসংশোধন হয়েছে ঠিক?

হ্যাঁ, হয়েছে ঠিক।

মন চোমোলিম্পার কথায় পুরোপুরি সায় দিয়েছে। চোমোলিম্পা বলেছে, পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানোর মনোভাব ত্যাগ করতে হবে

একদম। নিজের ঘরে চোর পুষে রেখে, অন্যের নামে বদনাম রটনা উচিত নয়। তোমার ভেতরকে ভালোভাবে চিনে নিতে হবে। কামে মত্ত ক্রোধে উন্মাদ লোভে দিশেহারা মোহে অন্ধ অহংকারে আত্মভ্রম পরের সুখে যন্ত্রণাকাতর—এব সব দুর্দান্ত অবাধ্য এক একটা দস্যুকে মন থেকে বাইরে বার ক'রে দিলেই,নিজেকে জানা চেনার রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তখনই আপনা থেকেই সংশোধন হয়ে যেতে থাকে নিজের অতীত বর্তমান কার্যকলাপের।

চোমোলিম্পা বলেছে, বাইরের লোকে ব্যবহারে দেখতে হবে দস্যুদের। ওদের বাইরেই রেখে দিতে হবে। ভেতরে থাকলে দুর্ভোগের অন্ত নেই। বাইরে থাকলে কোন কষ্ট স্পর্শ করবে না। মন যেন মনে করে, লোকেদের ব্যবহার—প্রবৃত্তিরই ব্যবহার। আমারই প্রবৃত্তি ভেতরে থাকতে না পেরে, ঢুকতে না পেরে জ্বালাবার চেষ্টা তো করবেই! করুক, এতে কিছু যায় আসে না। এ চিন্তায় নিজের মন সবল-সুস্থ-শুদ্ধ হয়ে ওঠে। অপরের দোষও চোখে পড়ে না। চোখে না পড়লে, রাগ-দ্বেষ আসবে কেমন করে! কারণই তো থাকছে না আর। মনে শান্তি-আনন্দ আসতে বাধ্য।

ঘরের ভেতর কঙ্কালের সামনে বসিয়ে চোমোলিম্পা বলছে, কঙ্কাল এখন কঙ্কাল। স্ত্রীরই হোক আর পুরুষেরই হোক। যতক্ষণ মাংস-চামড়ার আবরণ ছিল, ততক্ষণ স্ত্রী-পুরুষ। স্ত্রী-পুরুষের ভেদ ঘুচে যায় মাংস-চামড়ার সমস্ত কিছু এক এক করে খসে গেলে, ছেড়ে গেলে। কঙ্কালের খাঁচাটা তখন ফাঁকা—শূন্য। শূন্য অদৃশ্য আত্ম-শক্তির নিবাস। আত্মশক্তি আসলে স্ত্রীও নয়, পুরুষও নয়। যখন যে আধারে, তখন সেই নাম এই যা! আত্মজ্ঞান লাভের জন্যই কঙ্কাল-সাধনা। বৌদ্ধতন্ত্রে তারাসাধনা প্রকৃত সাধনা। তারা স্ত্রী, স্ত্রী নয়। পুরুষ, পুরুষ নয়। আত্মা। মানুষের জীবের—সব কিছুর আত্মা।

মহামুদ্রা সাধনা—স্ত্রীসাধনাও আসলে আত্মসাধনা। স্ত্রীলোকের মধ্যে আমার আত্মা। আমার মধ্যে স্ত্রীলোকের আত্মা। ধ্যানে মননে দু'টো শরীরই ধীরে ধীরে নজরে পড়ে না আর। অনুভব হতে থাকে এক অদৃশ্যশক্তির। মহাশক্তির। মহাআত্মার। সকলের ভেতরেই এক আত্মার খেলা। সংযমী হবার শ্রেষ্ঠ সাধনা আত্মসাধনা।

এ সাধনার মানুষ অসীম শক্তির অধিকারী হয়ে ওঠে। হয়ে ওঠে

সর্বজ্ঞ। সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় তার দৃষ্টি। কান শুনে বেড়ায় ব্রহ্মাণ্ডের কোলাহল! ইচ্ছেয় জেগে ওঠে অন্যের ভেতরের সৎ-ইচ্ছে শুভবুদ্ধি চিরস্থায়ী চৈতন্য। অনুভবে ভেসে বেড়ায় বিশুদ্ধ আনন্দের স্রোত অমলিন শান্তির স্রোত।

এতক্ষণ ধরে একমনে বসে বসে শুনেছে নীলামোতি লামা নরেনসের আত্মপরিচয়। শুনতে শুনতে কেবলি মনে হয়েছে, একজনের মুখ দিয়ে অন্য জনের কথা শুনছে বুঝি।

নরেনসের জীবন একটা সাধনার অধ্যায়। গুরুদেব তার আর আনন্দানন্দের শিক্ষার জন্য ওর মুখ দিয়েই বলাচ্ছে সব।

মুক্তেশ্বরানন্দের দিকে তাকাতে চোখে চোখ পড়ল। মহারাজ হাসছে। জোরে নয়। নিস্তব্ধ নিঝঝুম হাসি। মুখ ফেরাতেই আনন্দানন্দের মুখ। ওর চোখ এদিকে। মুখে খুশির হাসি।

উৎসবের দিন ওপরে ওর কুঠিতে বিশেষ ক'রে যেতে বলেছে নরেনস। ওদিন ওর মহামুদ্রাসাধনার দীক্ষার দিন।

সেই দিন আজ।

মেয়ে ছেলেরা মশাল হাতে নিয়ে এক এক ক'রে ওপরে উঠে যাচ্ছে। মুখে সুরেলা কণ্ঠের সুর—ওঁ মণিপদ্মে হুং তারায়ে তারে তত্ত্বারে···।

মুক্তেশ্বরানন্দ আনন্দানন্দ আর নীলামোতিকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। দলের শেষ মানুষের পেছু থেকে শুরু করেছে যাত্রা। মহামুদ্রাসাধনের মহামুদ্রা সাধনা দেখবে বলে।

আস্তে আস্তে উঠে আসছে ওরা ওপরে। ওদের হাতে মশাল নেই। আগের লোকের মশাল আলোয় পথ দেখে নিচ্ছে। সাঙ্গ হল পথভাঙা। এসে গেছে কুঠির দরজায়। এটাও বেশ বড়সড় কাঠের ঘর। মাঝখানে হোমের আগুন জ্বলছে। এপাশে কম্বলের আসনে বসে নরেনস—ধ্যানমগ্ন। ওপাশে চোমোলিম্পা। ওরও দু'চোখ বোজা। পদ্মাসনে বসে। যেন ধ্যানী বুদ্ধ বসে রয়েছে। কদিনে চোমোলিম্পাকে লক্ষ্য পড়ে নি একবারের জন্য। এই প্রথম দেখা।

দেখে, নীলামোতির খুব ভালো লেগেছে। কখনো মনে হয়েছে মা, কখনো বোন, কখনো মেয়ে! আশ্চর্য! একদম মনে হয় নি

কারো স্ত্রী বলে। হবেই বা কেন! দেহ স্ত্রী-পুরুষ হলেও, মনের দিক দিয়ে এরা স্ত্রী-পুরুষ নয়। অভিন্ন এবং আত্মা। এদের বিয়ে অন্য। সাধনার সঙ্গে শুদ্ধ মনের বিয়ে। অবিশ্যি মুক্তেশ্বরানন্দের কাছ থেকেই শোনা, একথা জানা।

ভক্তরা যারা এসেছে, প্রত্যেকে লামা নরেনসকে প্রণাম ক'রে ক'রে চলে যাচ্ছে প্রসাদ নিয়ে বেরিয়ে। দরজার কাছে একজন দাঁড়িয়ে। হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করছে। একটা আধপো ওজনের ছাতুর নাড়ু!

আগুনের লাল আভা লামার মুখে। সেখানেও সূর্য-উদয়ের আমেজ। এই জন্যই বোধ হয় আগুনকে রাতের সূর্য বলে। আগুনের শিখা এত জোরে উঁচু হয়ে উঠছে যে, মাঝে মাঝে চোমোলিম্পা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে যেন। হারিয়ে যাচ্ছে বুঝি দু'চোখ থেকে।

এখন ঘর একদম ফাঁকা।

ফাঁকা বলতে গেলে ভিড় সরে গেছে। আছে শুধু নরেনস চোমোলিম্পা আর নীলামোতিরা তিনজন। দ্বারীও চলে গেল বাইরে থেকে সন্তর্পণে দরজা টেনে দিয়ে। নীলামোতির চিন্তা—থাকবে, না যাবে। নরেনস কিন্তু মুক্তেশ্বরানন্দের প্রশ্নের—সাধনা দেখতে পেলে যেতে পারা যায়, বাধা থাকলে নয়—জবাবে বলেছে, সমভাবের ভাবী সাধকদের পূর্ণ অধিকার। আসবেন, দেখবেন এদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে।

খুব সাবধানে, একরকম নিশ্বাস বন্ধ ক'রে বসেছে তিনজনে আস্তে আস্তে। সাধক-সাধিকার ধ্যানধারণা আর পুজো-উপাসনায় কোনপ্রকার বিঘ্ন না ঘটে। ওরা চুপচাপ বসে আছে। খানিক পরে ধীরে ধীরে চোখ খুলছে নরেনস। কেবল সামনে ছাড়া কোনদিকেই ওর কোনো লক্ষ্য নেই। আশপাশে কেউ বসে আছে কিনা—তাও না।

আগুনের ওপারে চোমোলিম্পা, সুমুখে তারাদেবীর মূর্তি। একজটা তারা। গলায় কঙ্কালের মাথার মালা। কপালে কঙ্কালের পাঁচমাথার মুকুট আকাশের নীলে গায়ের রঙ। পদতলে শুভ্র-শিব—শব। শবের জীবনদেবী। দেবীই কঙ্কাল সাধনায় আত্মশক্তি—আত্মা। তারাসাধনা নিজেকে চেনার নিজেকে জানার সাধনা—আত্মসাধনা!

আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে নীলামোতি। যে মন্ত্র উচ্চারণ করে পুষ্পরানী আর হৃদয়নাথের বিয়ে দিয়েছে মুক্তেশ্বরানন্দ, এ যে হুবহু সেই মন্ত্র—ত্বং স্ত্রী, ত্বং পুমান্ অসিই—তুমি স্ত্রী তুমি পুরুষ। তুমি আত্মা পরমাত্মা নিরাকার ব্রহ্ম।

যজ্ঞের আগুনে আহুতি দিচ্ছে কাঠের কুণ্ডু থেকে কাঠের বড় হাতায় ঘি তুলে নরেনস। ওঁ মণিপদ্মে হুং ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমান্ অসি ···স্ত্রীং তারায়ৈ···স্বাহা। যজ্ঞের আগুন দ্বিগুণ। ঊর্ধ্বমুখী দু'হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে নরেনস। উঁচু থেকে নিচু অবধি নামিয়ে নিয়ে আসছে। আগুনও নেমে আসছে যেন ওর ইঙ্গিতে। হাত সরিয়ে নিলেই, আবার যে কে সেই। ঊর্ধ্বগতি।

আগুনের পেছন থেকে বেরিয়ে এলো পায়ে পায়ে চোমোলিম্পা। নরেনসের ডানপাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ধীরস্থির—অচঞ্চল। পাথর মূর্তি একখানা। ডানদিক ফিরে চোমোলিম্পার পায়ে ফুলের পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছে নরেনস। মাতৃকায়ৈ নমঃ জগজ্জনন্যৈ নমঃ···।

পুষ্পাঞ্জলির শেষে পাথর মূর্তি নড়েছে। ফিরে আসছে আগের জায়গায়। এসেছে তারা প্রতিমার সামনে আবার। দু'হাতে দুটো থালা তুলে ধরেছে। থালা দুটোর ঠিক মধ্যিখানে কর্পূর জ্বলছে। হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আরতি করছে চোমোলিম্পা। নিচে থেকে ওপর, ওপর থেকে নিচে। দেবীকে করে নিজেকেও আরতি করছে। নিজের দিকে থালা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। দেবী আরও এক হয়ে যাচ্ছে বুঝি। আরতির ওঠাবসা দাঁড়ানোয় যজ্ঞের আগুনও উঠছে বসছে দাঁড়াচ্ছে যেন। ভারী সুন্দর লাগছে নীলামোতির। এ পুজো এ আরতি দেখেনি আগে। আরতির সঙ্গে সঙ্গে উদারা মুদারা তারায়—সুরে ছন্দে স্তোত্রগান খাদে মধ্যমায় চড়ায় নরেনসের গলা সাবলীল গতিতে খেলা করে যাচ্ছে।—'নির্গুণ গুণময় চ গুণবতী খণ্ড অখণ্ড চ পুরুষ প্রকৃতি। সর্বশক্তি ত্বম বিশ্বপ্রসবিনী, বিশ্বজননী ত্বম মম জননী···।

আরতি করতে করতে চোমোলিম্পা গাইছে। শুভমতিং দেহি কুমতিনাশিনী, শান্তিং আনন্দং দেহি মম জননী···।

এদের পুজো-পদ্ধতি এদের ভাবধারা এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যে, স্থান কাল পাত্র—সমস্ত কিছু ভুলিয়ে দিয়েছে। এ পুজো মানুষের পুজো। নিজেদের পূর্ণভাবে জাগিয়ে তোলার পুজো।

নারীতেই জননী-বিশ্বজননীর পুজো। শুভমতির আহ্বান আর কুমতি নাশের। শান্তির আনন্দের।

এক একটা কথা এক একটা মন্ত্র। ভেতরে দাগ কেটে বসাতে পারলে, মনে মনে মন্ত্রজপের মতো জপের অভ্যাস করতে পারলে, সেই মানুষ তখন নিজেই কথার মানুষ হয়ে উঠবে। সে হয়ে উঠবে শুভমতি, হয়ে উঠবে শান্তি, হয়ে উঠবে আনন্দ। হয়ে উঠবে কুমতি নাশ আর মানুষের চিরকল্যাণ।

পুজোপাঠের সাধনার উদ্দেশ্য বোঝাতে গিয়ে মুক্তেশ্বরানন্দ কতবার তো নীলামোতিদের পাখী পড়ানোর মতো ক'রে মাথায় ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। বলেছে, পুজোর আসল ব্যাপার এই। সাধনার আসল ব্যাপার এই।

আজ বহুদূরে পাহাড়ের ওপর এসে এদের ক্রিয়াকলাপে ফুটে উঠেছে মুক্তেশ্বরানন্দের শিক্ষাদীক্ষা।

দেবতা প্রণামের শেষে কাছে এসে দাঁড়াতেই নরেনসকে সস্নেহে বুকে টেনে নিয়েছে মুক্তেশ্বরানন্দ। বলেছে, সাবাস্। তুমি বীরাচারী বীরউপাসক। চোমোলিম্পা জড়িয়ে ধরেছে নীলামোতিকে। নিস্তব্ধ রাতে কান-মন এক ক'রে শুয়ে থাকলে, শোনবার চেষ্টা করলে, নিজের বুকের ধুকপুকুনি নিজের কানে শোনা যায় স্পষ্ট। তালে তালে চলেছে কেমন আওয়াজ। বাঁ কান চেপে কাত হয়ে থাকলে বেশ জোর। কিন্তু আশ্চর্য লাগছে নীলামোতির, সেই শব্দ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে এখানে। কার বুকের শব্দ কানে বাজছে নীলামোতির? নীলামোতির নিজের; না চোমোলিম্পার? না দু'জনের একই সঙ্গে মিলেমিশে একই আওয়াজ উঠছে। কোনটা ঠিক? না, সবার বুকের আওয়াজ এক সঙ্গে তার আওয়াজে আছড়ে পড়ছে—শতনদী সমুদ্রে এসে মেশার মতো!

হাসল মুক্তেশ্বরানন্দ। বলল, তোমার সব বিশ্লেষণই ঠিক। শেষেরটা আরো ঠিক।

লজ্জায় মুখ নিচু করেছে নীলামোতি।—এসব বিশ্লেষণ—আত্ম-বিশ্লেষণের এক এক ধাপের অনুভূতি বিশ্বাস আর বাস্তব সম্বন্ধে গুরুদেবই তো জানিয়ে দিয়েছে আগে। আজ নীলামোতি ভেবেছে, এসব আলোড়নের সৃষ্টি তার ভেতর মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে নতুন। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। একেই বলে স্মৃতিভ্রম।

নরেনস চোমোলিম্পা—দু'জনে মশাল হাতে আলোর মানুষ হিসেবে নেমে এসেছে অন্ধকার পথে। পোঁছে দিয়েছে নীলামোতিদের কুঠি পর্যন্ত।

সুন্দর মজবুত কাঠের ঘরটাও ছাড়তে হ'ল শেষে। পছন্দসই জিনিস নাকি অনেকের সয় না আবার। ভোগে আসে না। বলেছে নীলামোতিকে আনন্দানন্দ। ঘর ছাড়ার সময় হাসতে হাসতে তামাশা করেছে।

বড় বড় চোখ করে নীলামোতি তাকিয়েছে স্রেফ। ঠোঁটের ফাঁকে মৃদুহাসি। আগের মতো এখন আর কোন ব্যাপারে কারো কথায় ওর মিথ্যে মান-অভিমান আসে না। মান-অভিমান আর রাগদ্বেষের জব্বর বাসা কবে না ভেঙে খান খান ক'রে দিয়েছে মুক্তেশ্বরানন্দ। ওসব ঠুনকো, কোন মূল্য নেই। উল্টে মানুষের মনকে বড্ড সংকীর্ণ করে দেয়। ওসবের বাঁধনে পড়ে থাকলে, মানুষ কোনদিনই উঠতে পারে না। খোলামেলা চোখ নিয়ে জগৎটাকে দেখতে পায় না। নানা মনের মানুষের দরজায় না পারে কখনো পোঁছতে। না পারে অন্য মনকে নিজের মনে মিলিয়ে নিতে, নিজের মনকে অন্যের মনে মিলিয়ে দিতে। এ যেন ছিন্নমূল অবস্থা। না নিজের না পরের—এর মতো বড় সাজা বোধ হয় নেই কোন। এই শান্তি, পরমুহূর্তে অশান্তির আগুন। এই লাভ, পরেই মহাক্ষতি। এই সুখ-আনন্দ, পরেই দুঃখ-শোক ব্যথাবেদনা।

ঋতু পরিবর্তনের মতো মানুষের জীবনে আসে শীত-গ্রীষ্ম। আসে বর্ষা-বসন্ত, আসে হেমন্ত-শরৎ। আসে পূর্ণিমা-অমাবস্যা। এরা আসে, এরা আসবেই। আবার চলে যাবেও। অমাবস্যার পর পূর্ণিমা—দুঃখের পর সুখ। আবার পূর্ণিমার পর অমাবস্যা—সুখের পর দুঃখ। এসব জ্ঞান যাদের তারা উল্লাসে যেমন মেতে ওঠে না, তেমনি কষ্টেও কাতর হয়ে পড়ে না। এদের কোন কিছুই স্পর্শ করে না বলে, সদাসর্বদা আনন্দ ভেতরে ভেতরে। প্রকৃত আত্মজ্ঞানী এরাই। জ্ঞানী নিজেই নিজের মুক্তি, অপরের মুক্তি। ত্রিতাপ জ্বালার মুক্তি।

তিনজনে চলেছে ধীরে ধীরে। পথ দেখে দেখে। পাহাড় মাটি বরফ মাড়িয়ে মাড়িয়ে। চড়াইয়ে উঠে উতরাইয়ে নেমে। দেবদারু বনের ভেতর দিয়ে। নদীর সেতু পেরিয়ে। মাথার ওপর দিয়ে চলেছে হিম শীত রোদ্দুর তুষার বৃষ্টি। মরুভূমির বালির মতো পাথর গুঁড়োর ধুলো।

ওরা চলেছে। মুক্তেশ্বরানন্দ আনন্দানন্দ আর নীলামোতি।

...শ্বাসো পেরিয়ে স্পুতে পেঁাছেছে ওরা। পাহাড়ী জায়গা হলেও মন্দ নয়। মন্দির আছে নারায়ণের—লোকে বলে নরেনসের বৌদ্ধ বিহারেও রয়েছে। আছে তারাদেবীর মন্দির। কিন্তু বৌদ্ধরা বলে এটা তাদের অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি। বুকের বাঁদিকে হরিণের মুখ আঁকা। অবলোকিতেশ্বরকেই এখানকার অনেকে তারা বলে পুজো করে। করুক গে। একজনকে যে-যেভাবে সাজিয়ে আনন্দ পায় পাক না। এতে অন্যের লোভ না হোক, ক্ষতি নেই কোন।

নীলামোতির মুক্তেশ্বরানন্দের সঙ্গলাভে ভেদাভেদের আর অশান্তির কচকচি ঘুরছে। সে বৌদ্ধদের অবলোকিতেশ্বর জ্ঞানে যেমন সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়েছে, তেমনি আবার তারাদেবী হিসেবেও ভক্তিতে মাথা নুইয়েছে। একসময় মাথা নোয়াতে, অবিশ্যি যেখানে সেখানে, নিজেকে কেমন হীন মনে হ'ত নীলামোতির। মুক্তেশ্বরানন্দ বলেছে, মাটি কাঠ পাথর পেতল অষ্টধাতু বা যে কোন ধাতুরই মূর্তি হোক না কেন, শিল্পী তার নিজের মন-প্রাণ বুদ্ধি-দৃষ্টি ধ্যান-ভাব—সব কটির মিল ঘটিয়ে গড়ে তোলে মূর্তি। তার বাইরের হাতের সঙ্গে অন্তরের এত জিনিসের ছোঁয়া এসে জড়ো হয় মূর্তির অঙ্গে-অঙ্গে। হয়ে ওঠে মূর্তি যেন শিল্পীর দ্বিতীয় সত্তা। দেবদেবী না ভেবেও, শিল্পীর প্রাণের স্পর্শ হিসেবে শ্রদ্ধাপ্রণামে হীন হয়ে যায় না কেউ। বরং মন উদার বিশাল হয়ে ওঠে। জড়ের মধ্যে নিষ্প্রাণের মধ্যেও প্রাণের চেতনার সাড়া মেলে যেন।

মুক্তেশ্বরানন্দ একটা জ্যামিতিক নক্সা এঁকেছে মাটির ওপর। ছোট কাঠের টুকরোয় আঁক কেটে কেটে। প্রথমে রেখায়-রেখায় চৌকোণা একটা। তার ভেতর গোলাকার বৃত্ত। বৃত্তের মধ্যে ওপর-মুখো ত্রিকোণ একটা। তার মাঝখান দিয়ে নিচু-মুখো আর একটা ত্রিকোণ। দুটো ত্রিকোণে মিলে ছটা কোণের ষট্‌কোণ। ষট্‌কোণের ঠিক মধ্যিখানের জমির মধ্যে একটা কেন্দ্রবিন্দু।

গুরুদেব বলেছে, এটাকে পুজোর যন্ত্র—গুরুপুজোর যন্ত্র বলে! গুরু বলতে, কোন ব্যক্তিবিশেষ নয়। বিশ্বব্যাপী মহাশক্তি। এ শক্তি পৃথিবীতে। তাই চতুষ্কোণ প্রতীক। এ শক্তি জলে তাই বৃত্ত। জল থেকেই জীবের প্রাণের প্রকাশ। বৃত্তাকারে ঘুরে চলেছে প্রাণের ছন্দ গতি। আর চতুষ্কোণের এক একটি কোণে এক একটি গুণ-প্রকৃতি। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। জীবজন্তু মানুষ আর কীটপতঙ্গ বৃক্ষের প্রকৃতিগত গুণকর্মই তার ধর্ম। সেই গুণকর্মের—ধর্মের ফলাফলই অর্থ। ফলাফলের আনন্দ-শান্তির কামনাই মোক্ষ—যন্ত্রণা লাঘবের—মুক্তি। আবার এর অন্য মানেও আছে। সেটা স্থূল থেকে সূক্ষ্ম। ধর্মের অর্থ বুঝে মোক্ষের কামনা। ষট্‌কোণ। আত্মদর্শন। ছটি রিপু—কামক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য থেকে নির্লিপ্ত। আসক্তি শূন্য হতে পারলেই স্ত্রী পুরুষ ভেদের পাঁচিল ধসে পড়ে। তখন সমস্ত আলো এক বিন্দু জ্যোতি হয়ে যায় ধ্যানে। ধীরে ধীরে তারপর সেটাও মিলিয়ে যায় আদি-অন্তহীন অসীমের রাজ্যে। যেখানে বিন্দু হারিয়ে আর কিছুই থাকে না। আমিও না। এই সাধনাই ব্রহ্ম-সাধনা। এখানে নেই কোন বাইরের অস্তিত্ব আর অনুভব। আছে কেবল ধরাছোঁয়া আর দেখা জানার বাইরে অদৃশ্য নিরাকার-নিষ্ক্রিয় এক মহাশক্তি। এই শক্তিই ব্রহ্ম, এই শক্তিই গুরু। মানুষ—প্রত্যেক মানুষ নিজের গুরু পুজোর ব্রহ্মভাবনার—গুরুযন্ত্র। তেজ জল বাতাস পৃথিবীর গুণ শব্দ—সবই তো রয়েছে তার মধ্যে। মানুষকে মানুষের গুণকে শ্রদ্ধা করাই মহাশক্তিকে শ্রদ্ধা। তার সেবা মহাশক্তির সেবা। তার ভেতরের ভাবধারা জাগিয়ে তোলাই, মহাশক্তির ঘুম ভাঙানো।

গুরুযন্ত্র ভেতরে ভেতরে এঁকে নিয়েছে নীলামোতি।

মুক্তেশ্বরানন্দের কথামতো মানুষের ভেতরেও দেখতে চেষ্টা করে। করছেও। করেও সর্বক্ষেত্রে ঠিক পাচ্ছে কই! সেদিন কি কাণ্ডই না ঘটে গেল এই স্পুতে। একটা কোলীকে নিয়ে যত হুলুস্থুল। মহাভারত অশুদ্ধ যাকে বলে। বৌদ্ধ তন্ত্র শৈব বৈষ্ণব—সকল ধর্মের দেবতা আর তার সাধনা আর তার ভক্তরা তো রয়েছে কিন্নরদেশের এ-গ্রামে ও-গ্রামে। নীচু-উঁচু আর ছুঁই-ছুঁই ভাবটা না থাকাই তো উচিত ছিল। তবুও রয়ে গেছে। বেশ রয়ে গেছে। কনৈতরা বলে, ওরা কুলীন-রাজপুত। কোলীরা সকলের চেয়ে নিচুজাত। ওদের

ছায়া মাড়ালে ধর্মকর্ম জলাঞ্জলি। পাহাড়ের বড় ফাটলে বরফগলা জমা জল ওদের আলাদা করে পাথর দিয়ে দিয়ে ঘিরে রাখা। সে জল কনৈতেরা ছাড়া কেউ ছোঁবে না। বঢ়ঈরাও না। ওদের আলাদা। ওরা নাপিত ছুতোর স্যাকরার কাজ করে। পাথরের খোদাইও। ওদের জল না চললেও ছায়া মাড়ালে নরক গমনের ভয় নেই। কোলীদের অপরাধ ওরা নোংরা কাজ করে। মেথর ধাঙড় চামার আর কুলি-মজুরের। জিনিসপত্তর বয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে ওরা ছাড়া এক পা চলে না। এটা কিন্তু নীলামোতির গোড়া থেকেই একদম ভালো লাগে নি। এ নিয়ে এখানকার অনেকের সঙ্গে অনেক আলোচনা করেছে। সকলেই মানুষ সকলেই ঈশ্বরের সন্তান। ওদের কাজ ভাগ করে দিয়ে ছোট ক'রে রাখা হয়েছে নিজেদের সুখের জন্য। ওদের কাজে ওরাও অনেক বড়। কেউ তো ওদের কাজ করতে পারবে না যখন, তখন ঘেন্না করবার কি অধিকার আছে? ওদের জন্যই অপরের এত আরাম। নোংরা ঘাঁটতে হয় না। শুদ্ধ-অশুদ্ধ বলে মোটেই ওদের মনোবল ভেঙে দেরা ঠিক নয়।

যে দল শুনেছে, নীলামোতির সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে। কেউ কেউ আবার হাউ হাউ করে কেঁদে বলেছে, কত অন্যায় না করেছে তারা ওদের ওপর। না জেনে না বুঝে! আহা-আ-হা-হা!

নীলামোতির সঙ্গলাভ হয়েছে যাদের, তাদের মনের পরিবর্তন হলেও, দেশসুদ্ধু একসঙ্গে হওয়া তো আর সম্ভব নয়। যাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয় নি, তাদের নিয়েই হুজ্জত বেধেছে। একটা আট-ন বছরের কোলীছেলে আপনমনে নাচতে নাচতে গাইতে-গাইতে পথ চলেছে। পথের ধারে কনৈত-রাজপুতের বাড়ি। বাড়ির দেয়ালে হেলান দিয়ে গলা ছেড়ে গান ধরেছে ছেলেটা। দূর থেকে ওর মা পড়ি কি মরি করে ছুটে এসেই, ওখান থেকে ওকে টেনে নিয়েছে।

নিলে কি হবে, বাড়ির মালিকের শ্যেনদৃষ্টি থেকে সরাতে পারেনি ছেলেকে। ধরা পড়ে গেছে। একেবারে সামনা সামনি। দোকান সেরে বাড়ি ফিরছিল কর্তা। চিৎকারে দূর কাছের সকলে এসে হাজির। এত বড় স্পর্দ্ধা! বাড়ি ছোঁয়! প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে ওদের। এত বড় অপরাধ—জেনেশুনে করতে বুক কাঁপেনি এতটুকু। অবাক করল। ওখানকার কনৈতরা একবাক্যে স্বীকার করল কর্তার কথাই ন্যায় কথা। সত্যিই তো নরকে যাবার ভয়ডরও কি ওরা

খুইয়েছে! এখুনি, এখুনি প্রায়শ্চিত্ত। আর একদণ্ড দেরী নয়। প্যান প্যান করে কান্না আর জোড়হাত করে ক্ষমা চাইলে হবেটা কি?

নীলামোতি দেখেশুনে তাজ্জব। মরতে এ রাস্তা দিয়ে আজ আবার আসতে ইচ্ছে হল কেন, কে জানে! এদের প্রাণে দয়ামায়া ভালোবাসা কি নেই! বাচ্চা ছেলেকে ক্ষমা করতে জানে না! সব বাচ্চাই তো সমান। এরা কত হতভাগা। ভেতরে স্নেহরস শুকিয়ে গেছে। মরুভূমি, মরুভূমি! ভালোবাসবে কেমন করে লোককে! এদের জন্যও বড় দুঃখ নীলামোতির। আহা, কত না অবুঝ কত না অজ্ঞান এরা। হে মহাশক্তি! ওদের ওপর একটু করুণা কর। ভালোবাসার কিছুটা অন্তত ঢেলে দাও এদের ভেতর। দোহাই তোমার, দোহাই তোমার।

আর্জি শুনে মহাশক্তির অদ্ভুত মর্জি দেখেছে নীলামোতি।

দেবীমন্দিরে ওদের—মা-ছেলেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দেবীর বিচারে কি হয়, দেখা যাক। ওদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয় নি। যেতে বলতে, ওরা নিজেরাই গেছে। ওরা পালাবার লোক নয়। 'অপরাধী অপরাধী' শুনে ওদের ভেতর অপরাধবোধটা রক্তমাংসের সঙ্গে মিশে রয়েছে যে। পালাবে কেমন করে! ওদের ছুঁলে ধর্ম যাবে, এটা মনে গাঁথা না থাকলে, ওদের রক্ষে ছিল না। মার খেয়ে প্রাণ বেরিয়ে যেত। এটাও ওদের বরাতই বলতে হবে।

নীলামোতি পেছু পেছু গেছে দেবীমন্দিরের ব্যাপারস্যাপার দেখতে। বিচার কীভাবে হয়। গিয়ে দেখে, পুরোহিতের মুখ দিয়ে নাকি দেবী কথা বলছে। এখানকার লোকের ধারণা তাই। মাথা দোলাচ্ছে পুরোহিত। কখনো সামনে কখনো পেছনে। কখনো জোরে জোরে ঘোরাচ্ছে। পুরোহিত বলছে, প্রায়শ্চিত্ত না করলে, এ পাপ মোচন হবে না। মোচন হবে না মোচন হবে না।

এখানে তো একদফা বিচার হয়ে গেল কোলী মা ছেলের। তাতেও মনঃপুত হল না অনেকের। এবার বৌদ্ধমন্দিরে। কাঠের পিরা-মিডের মাথায় তিনটে রুপোর মাথা বসানো। ভিক্ষুদেবতা। দু'জন দু'পাশ থেকে পিরামিড তুলে দাঁড়িয়ে রইল। একজন জিজ্ঞেস করল, প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে কি? পিরামিডের ভারে দুজনের হাত

থরথর করে কাঁপছে। মাথা তিনটেও কাঁপছে। একজন বলল, ভিক্ষুদেবতা বলছে, হ্যাঁ, প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে।

বিচার হয়ে যাবার পর নীলামোতির বোঝানো কিন্তু ওরা শুনেছে। —এরাও মানুষ। নোংরা? নোংরা থাকবে না আর। সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে পরিষ্কার হওয়া শিখিয়ে দেবে বলে! ওদের—মা-ছেলের চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছে নিজের আঁচলে যত্ন করে। আদর পেয়ে আহ্লাদে ফেটে পড়েছে ছেলেটা। জড়িয়ে ধরেছে নীলা-মোতিকে।

মুক্তেশ্বরানন্দের কাছে এসে নিজের মনঃকষ্টের কারণ জানিয়ে বলেছে নীলামোতি, ভুল ধারণার ঘুণধরা ব্যামো কি করে দূর করা যায় এদের ভেতর থেকে গুরুদেব? ভেতরের দেবতাকে না জেনে, পশুদের এত নড়াচড়া থেকে এরা রেহাই পায় কি করে, মুক্তি পায় কি করে? যেখানেই শান্তির জায়গা ভেবে উপস্থিত হয়েছে, সেখানেই একটা না একটা বিপত্তি দেখা গেছে। যে ধরনেরই বিপত্তি হোক না কেন, মূল কারণটা কিন্তু ভুল বুঝে ভুল ধারণা।

মুক্তেশ্বরানন্দ বলেছে, নিজের ভেতরটাকে ভালো গুণে পুরো-মাত্রায় সাজিয়ে নিয়ে অন্যের ভেতরটাকেও সেই সাজে সাজিয়ে তুলতে পারলে, মানুষে-মানুষে এক হয়ে যাবে। কোন ভেদাভেদই থাকবে না আর। কেউ কারো অশান্তির কারণ হবে না, অন্যায়ের কারণ হবে না। দুঃখ-কষ্টের কারণ হবে না। এর জন্য নিজেকেই তৈরী করতে হবে। তৈরী হলে মঙ্গলব্রতে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে, সর্বান্তঃ-করণে। তবেই মঙ্গল-ব্রতের—সন্ন্যাস-ব্রতের সাধনকর্মের উদ্দেশ্য সফল হবে।

কথার পর গান গেয়েও উপদেশ দেয় গুরুদেব অনেক সময়। গাইছে।

একমনে শুনছে নীলামোতি মুক্তেশ্বরানন্দের গান। মহারাজের গান—দান নয় তো, প্রার্থনা ধ্যান উপদেশ সান্ত্বনা ভরসা অভয়। মুক্তেশ্বরানন্দ গাইছে গম্ভীর মধুর স্বরে মিষ্টি কথার গান। সমস্ত মানুষের জীবনের গান। নীলামোতির মনে হচ্ছে ওই কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে জগতের ছেলেবুড়ো নারী পুরুষ একসঙ্গে এক সুরে গাইছে বুঝি।

আলোয়-আলোয় বেয়ে
নেমে আসুক আশিস তোমার
কেটে যাক মোহকুয়াশা,
ঘুচে যাক যত আঁধার।
মঙ্গল কাজে কর শুভ মঙ্গল,
হৃদয়ে ফুটুক জ্ঞান শতদল,
চলার পথে ধোরো গো হাতে
তুমি আজ সবাকার।
হোক অশুভ বুদ্ধির লয়,
বিবেকের হোক জয়,
তোমারি স্মরণে মননে ধ্যানে
জ্ঞানে আমার।

পথ চলা শুরু হলে, এক জায়গায় না এক জায়গায় গিয়ে থামবেই থামবে। নীলামোতির পথ চলার শেষ কোথায় কে জানে না। মুক্তেশ্বরানন্দকে জিজ্ঞেস করলে একই উত্তর।—সমস্ত কিছুর প্রয়োজন আছে জানবে। পথ চলা মানুষদের সঙ্গে মেলামেশাই বহু অভিজ্ঞতা যোগায় জীবনে। শক্তির বিচিত্র লীলাখেলা চতুর্দিকে। মুক্তেশ্বরানন্দের প্রত্যেক কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

নতুন নতুন অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে নীলামোতি। কিন্তু অভিজ্ঞতাকে লোকের মঙ্গলকাজে লাগাতে না পারলে, সে অভিজ্ঞতার দাম কি? মুক্তেশ্বরানন্দের জবাব—দাম আছে। সময়ে দাম মেলে। সময়ে কাজে লাগে। অভিজ্ঞতা ফুরিয়ে যায় না। অভিজ্ঞতা মানুষের জীবন্ত অভিধান।

স্পু থেকে এগিয়ে যাচ্ছে তিনজনে। মুক্তেশ্বরানন্দ আনন্দানন্দ নীলামোতি।···কনম···হঙরঙ···নমগ্যা। হ্যাঁ, দিনের পর দিন কঠিন কঠিন রাস্তা পেরিয়ে এসেছে ওরা। পথের ক্লান্তি ওদের দু-পাকে আটকে ধরে রাখতে পারে নি! পঙ্গু করে রাখতে পারে নি। সারাক্ষণ ওদের মনের জোর পুরোমাত্রায় বজায় ছিল। মুক্তেশ্বরানন্দ সঙ্গে বলে, সাহস কমে নি, ভয় ধরে নি। আনন্দের জোয়ারে ভাটার

টান পড়ে নি। ধৈর্য-সহ্যের বাঁধে ফাটল দেখা দেয় নি। স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছে যে ধারা, তাকে বুকে আঁকড়ে ধরে রাখতেও পরম সুখ পরম শান্তি।

নমগ্যায় উপস্থিত হয়ে চক্ষুস্থির নীলামোতির।

চাষের জমি থেকে কঙ্কাল বেরোচ্ছে। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখেছে কঙ্কালের আদল। তিব্বতীদের মতো নয়। লম্বাটে ধরনের মুখ। পা থেকে মাথা অবধি লক্ষ্য করলে, দীর্ঘদেহীরই ছিল বললে, ভুল বলা হবে না। পুরো দেহের কঙ্কাল কটা মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বেরিয়েছে। পরপর পাশাপাশি শোয়ানো ছিল। আরো বেরোচ্ছে। সঙ্গে বাসনকোসনও। গয়নাপত্তর রুপোর। কঙ্কালেই পরানো। হাড়গোড় বেশ মোটা মোটা চওড়া-চওড়া।

এতদূরেও স্পুর কোলীরা নীলামোতিদের সঙ্গ ছাড়ে নি। গ্রাম-সুদ্ধু উজাড় ক'রে এসেছে ওরা। সীমান্তে দাঁড়িয়ে বিদায় দেবে ওরা ওদের প্রাণের জনদের। কদিনে কত আপনার হয়ে উঠেছে এরা ওদের। নীলামোতিরা ভালোবেসেছে ওদের! ওরাও নিজেদের নির্ভেজাল ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছে এদের। ভালোবাসায় ভালো-বাসায় এই যোগকে বিয়োগ হতে দিতে চায় না ওরা। ওদের বুকের মধ্যে হু-হু করছে। শূন্য হয়ে যাচ্ছে ভেতর-বার চতুর্দিক। সর্বস্বান্ত হতে বসেছে বুঝি এবার! থেকে থেকে আপনা হতেই চোখের পাতা ভিজে উঠছে। ছেলে বুড়ো জওয়ান স্ত্রী-পুরুষ—প্রত্যেকের চোখ নীলামোতির দিকে।

নীলামোতি কঙ্কাল দেখছে আর ভাবছে।—চিরকালই কি দানব-শক্তির প্রভাবটা বেশী! নিরীহ মানুষরা সৎলোকেরা যুগ যুগ ধরে শিকার হয়ে আসছে অসুরদের। তিব্বতের প্রথম সম্রাটও তো দানব-শ্রেষ্ঠের দলে পড়ে। সম্রাটের আমলে একা সম্রাটই হিমালয়ের ত্রাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হত্যা আগুন ঘর জ্বালানো—যত জঘন্য কাজ, কিছু আর বাকি রাখে নি স্রোংচনগম্বো।

সীমান্ত পেরিয়ে এই নমগ্যায় প্রবেশ করেই নির্মম-নিষ্ঠুর প্রাণ-ঘাতী কাজে মেতে উঠেছে সম্রাট। হয়তো সেই সময়ের সেই সপ্তম শতকের মাঝামাঝিতে এইসব কঙ্কালের মানুষের সম্রাটের কোপ-দৃষ্টিতে পড়ে নৃশংসভাবে মরতে হয়েছে। হবে বা তারই নমুনা এখন মাটি থেকে।

মনটা বড্ড ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছে নীলামোতির।

মুক্তেশ্বরানন্দ পেছন থেকে এসে মাথায় হাত রাখতে চমক ভেঙেছে নীলামোতির। বলেছে মুক্তেশ্বরানন্দ, হিংসা-দ্বেষ আর অসুর প্রবৃত্তি বরাবরই ছিল, আছে এখনো, থাকবেও। স্রোংচনগম্বোর পরের দিকটাও ভাবো এই সঙ্গে। শান্তির বাণী ছড়িয়ে গেছে বৌদ্ধ লামারা। বারে বারে বলেছি, নিজের ভেতর বড় দানব রয়েছে। তাকে জয় করে অন্যের ভেতরের দানবকে জয় করতে হবে। দানব তখন দেবতা। যেখানেই যাও না তুমি, সর্বত্র প্রায় একই ব্যাপার। মানুষকে নিজের ভেতর নিয়েই চলতে ফিরতে হয়। তাই ভেতরটাকে পুণ্য মন্দির করে তুলতে হবে পবিত্র ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়ে।

আবার এগোচ্ছে ওরা। সীমান্তের শেষ গাঁও নমগ্যা থেকে এবারে বেরিয়ে যেতে হবে কিছুক্ষণের মধ্যে। তারপর চলতে হবে তিব্বতের পথে। কোলীদের ফিরে যেতে নির্দেশ দেবার জন্য ফিরে দাঁড়াতেই একটু থমকে গেছে নীলামোতি। অজস্র ধারে ঝরে পড়ছে ওদের চোখের জল

কেন মনে হচ্ছে নীলামোতির! দু'চোখে মেঘ নামছে। বড্ড ঝাপসা হয়ে আসছে দৃষ্টি। দু'হাতে রগড়ে নিয়েও চোখের কুয়াশা কাটছে না। নীলামোতি অন্ধ হয়ে যাবে কি! তারই কি পূর্ব লক্ষণ! মুক্তেশ্বরানন্দের জন্য মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। ঘাড় ফেরাতেই স্বচ্ছ হয়েছে দৃষ্টি। গুরুদেব অনেকটা এগিয়ে গেছে। পেছন ফিরে তাকিয়ে হাসল একটু। হাতের ইশারায় কাছে যেতে মানা করেছে। কোলীদের দিকেই ফিরে যেতে বলেছে।

আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে নীলামোতি।

গুরুদেবের দিকের আকাশ মেঘে-মেঘে ভরে গেছে। নেমে আসছে মাটির বুকে। সূর্য মাঝে-মাঝে ঘন মেঘ থেকে পাতলা মেঘের তলায় এলে, দিনেও পূর্ণজোছনা ঝরে পড়ছে যেন। সূর্য বুঝি পূর্ণিমার স্নিগ্ধকিরণে মাখামাখি। পূর্ণিমার চাঁদ দেখছে সূর্যে নীলামোতি। নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেছে চাঁদ। আকাশ মাটি ঢাকা পড়ে গেছে মেঘে-মেঘে। দেখা যাচ্ছে না আনন্দানন্দকে, দেখা যাচ্ছে মুক্তেশ্বরানন্দকেও।

নীলামোতির ভেতরে গুরুদেবের কথার প্রতিধ্বনি উঠছে বেশ

জোরে জোরে। নিশ্বাসে বুকের আওয়াজে।···লোকের মঙ্গলের জন্য মঙ্গলব্রতে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে সর্বান্তকরণে।···মঙ্গলব্রতের— সন্ন্যাসব্রতের, সাধনকর্মের উদ্দেশ্য সফল হবে।···উদ্দেশ্য সফলই জীবনে শ্রেষ্ঠ তপস্যা, শ্রেষ্ঠ তপস্যা!

আবার ফিরেছে এদিকে নীলামোতি। কোলীদের দিকে। বিস্ময় বিস্ময় বিস্ময়! প্রত্যেক কোলীর মুখের কি অপূর্ব পরিবর্তন। ওদের মুখে মুখে মুক্তেশ্বরানন্দের মুখ। ওদের হাসিতে মুক্তেশ্বরানন্দের হাসি। দু'হাত বাড়িয়ে ফিরে আসার ডাকে মুক্তেশ্বরানন্দের ডাক, মুক্তেশ্বরানন্দের হাত বাড়ানো।

নীলামোতির ভেতরে একটা অজানা আনন্দের উজান বইছে। এ আনন্দের স্বাদ এর আগে কখনো পায় নি কোনদিন। পাচ্ছে এই প্রথম।

নিজের অজান্তে ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে নীলামোতি পায়ে পায়ে। আসছে আসছে আসছে··· ।

———